আবু মহম্মদ ফেরদাউস

স্মারকগ্রন্থ

ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ – ডিসেম্বর ২০০৬

আবু মহম্মদ ফেরদাউস

জন্ম : ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ মৃত্যু : ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬

সম্পাদনা পর্ষদ

ড. শেখ গাউস মিয়া
অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম
মুজিবর রহমান
আনোয়ারুল কাদির
হাফিজুর রহমান
গৌরাঙ্গ নন্দী
মহিউদ্দিন আহমেদ মাহিন

প্র কা শ
১৩ ডিসেম্বর ২০০৯

প্র কা শ ক
মহিউদ্দিন আহমেদ মাহিন
২ পশ্চিম বানিয়াখামার, আমতলা
খুলনা-৯১০০

প রি বে শ ক
আবু মহম্মদ ফেরদাউস স্মৃতি পরিষদ
২ পশ্চিম বানিয়াখামার, আমতলা
খুলনা-৯১০০

প্র চ্ছ দ
শেখ ইয়াহিয়া

মু দ্র ণ
রবি প্রিন্টিং প্রেস
শান্তিধাম মোড়, খুলনা-৯১০০

প্রসঙ্গ কথা

আবু মহম্মদ ফেরদাউস ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬ ভোরে খুলনা শহরের পশ্চিম বানিয়াখামার মেইন রোডের নিজের বাড়িতে ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মাত্র ৩২ বছর বয়সে ডায়াবেটিসে এবং ৭০ বছর বয়সে ক্রনিক ব্রংকাইটিসে আক্রান্ত হয়ে রোগ নিয়ন্ত্রণে রেখে আমৃত্যু মানবমুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত থেকেছেন। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের স্বার্থে স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তানের জন্য, পঞ্চাশ-ষাটের দশকে কৃষক-শ্রমিকের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ষাট-সত্তরের দশকে বাঙালির বাঁচার লড়াইয়ে জীবনপণ সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর স্বপ্ন ভেঙে গেলে রাজনৈতিক রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং ল্যাটিন আমেরিকা-ভিয়েতনাম-নেপালের বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধের উন্মাদনায় মগ্ন হয়ে যান। ক্ষুদ্র একটি রাজনৈতিক দলের নেতা হয়ে নিজেকে তার আদর্শ ও চেতনার গণ্ডিতে সীমিত করতে চাননি, আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণের পথ-মত খুঁজে ফিরেছেন, নিজের মধ্যে বিপ্লবের ভুবন নির্মাণ করে তার মধ্যে বসবাস করতে চেয়েছেন।

জাতীয় ক্ষেত্রে নিজ এলাকা–বৃহত্তর খুলনার অবহেলা ও অনুন্নয়ন তাঁকে ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং সমমনাদের নিয়ে তাই গড়ে তোলেন 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। জীবনের শেষ দেড় যুগ খুলনার উন্নয়নের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করে গেছেন। এসব কারণে পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হলেও তাঁর অনুসারীরা তাঁকে সব সময়ই স্মরণ করে থাকেন। মৃত্যুর পরপর ১৫ ডিসেম্বর প্রথম শোকসভায় অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব করেন, ২৭ ডিসেম্বর দ্বিতীয় শোকসভায় ড. শেখ গাউস মিয়া একই প্রস্তাব করেন। এই প্রেক্ষিতে পরিবারের পক্ষ থেকে খুলনা উন্নয়ন কমিটির কয়েকজন সদস্যকে এবং বাইরের দু'তিন আপনজনকে ৩ জানুয়ারি ২০০৭ তাঁদের পশ্চিম বানিয়াখামারের বাড়িতে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেখানে 'আবু মহম্মদ ফেরদাউস স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয় এবং ড. শেখ গাউস মিয়াকে আহ্বায়ক এবং অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ আব্দুল হালিম, অধ্যক্ষ মুজিবর রহমান, অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির, অধ্যাপক হাফিজুর রহমান, সাংবাদিক গৌরাঙ্গ নন্দী ও মহিউদ্দিন আহমেদ মাহিনকে

সদস্য করে একটি সম্পাদনা পর্ষদ গঠন করা হয়। ড. গাউস তৎপরতার সঙ্গে শেখ আশরাফ-উজ-জামান ও মোঃ মনিরুজ্জামান রহিমের সহযোগিতায় প্রায় একশ দশ জন সম্ভাব্য লেখকের তালিকা প্রস্তুত করেন। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিন মাসের মধ্যে ১৫-১৬ জনের লেখা পাওয়া যায়, তারপর আর এগোয় না। হতাশার মধ্যে এক বছর পার হয়ে যায়। এর মধ্যে প্রবীণতম সদস্য অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ আব্দুল হালিম ২৩ জানুয়ারি ২০০৮ চিরতরে আমাদের ছেড়ে যান। ২০০৯ সালে প্রেসে পাণ্ডুলিপি দেয়া শুরু হয়।

একক ও পারিবারিক আলোকচিত্র কয়েকটি বাছাই করে রাখা ছিল অনেক আগে। শুদ্ধভাবে হরফ বিন্যাসের কাজ শেষ হয় নভেম্বরে। এ সময় শেখ আশরাফ-উজ-জামান বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির আন্দোলনের অনেকগুলো ছবিসহ ২৫-২৬টি ছবি ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমাদের হাতে তুলে দেন। এ ছবিগুলো না পেলে স্মারকগ্রন্থটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

খুলনা
ডিসেম্বর ২০০৯

সম্পাদনা পর্ষদ

সূচি

অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ ▪ ১৩
প্রকৌশলী শেখ মু. শহীদুল্লাহ ▪ ১৪
এম নূরুল ইসলাম ▪ ১৬
কে এম হাসান ▪ ২৩
ওয়াহিদুর রহমান ▪ ২৭
হারুনুর রশীদ ▪ ৩০
সমীর আহমেদ ▪ ৩২
শেখ তৈয়েবুর রহমান ▪ ৩৬
মোঃ বজলুল করিম ▪ ৩৮
বীরেন্দ্রনাথ রায় ▪ ৪২
অসিতবরণ ঘোষ ▪ ৪৪
মোঃ এনায়েত আলি ▪ ৫১
মোঃ দেলোয়ার হোসেন ▪ ৫৫
এহসান চৌধুরী ▪ ৫৮
মাজেদা হক ▪ ৬০
মনোয়ার আলী ▪ ৬২
কাজী ওয়াহিদুজ্জামান ▪ ৬৭
পঞ্চানন বিশ্বাস ▪ ৭০
সুশান্ত সরকার ▪ ৭৪
মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান ▪ ৭৮
ড. শেখ গাউস মিয়া ▪ ৮২
দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় ▪ ৮৬

আনোয়ারুল কাদির ▪ ৯০
মাখন লাল দে ▪ ৯৫
সরদার আব্দুস সাত্তার ▪ ৯৮
শেখ আব্দুল কাইয়ুম ▪ ১০২
রোজী রহমান ▪ ১০৪
আব্দুল্লাহ হোসেন (বাচ্চু) ▪ ১০৮
রুহুল আমিন সিদ্দিকি ▪ ১১১
আশরাফ-উল-আলম টুটু ▪ ১১৩
ফিরোজ আহমেদ ▪ ১১৬
কুদরত-ই-খুদা ▪ ১১৮
সৈয়দ আলী হাকিম ▪ ১২৩
এস এম সোহরাব হোসেন ▪ ১২৬
ইসমাইল হোসেন ▪ ১২৯
গৌরাঙ্গ নন্দী ▪ ১৩২
ফজল মোবারক ▪ ১৩৭
বিষ্ণুপদ সিংহ ▪ ১৩৮
এস এম রফিকুল আলম ▪ ১৪০
ড. নাজমুল আহসান ▪ ১৪৩
আশরাফুন্নেছা দুলু ▪ ১৪৬
সওয়া উন নাহার ▪ ১৫০
মুজিবর রহমান ▪ ১৫৩
আলোকচিত্র ▪ ১৬১

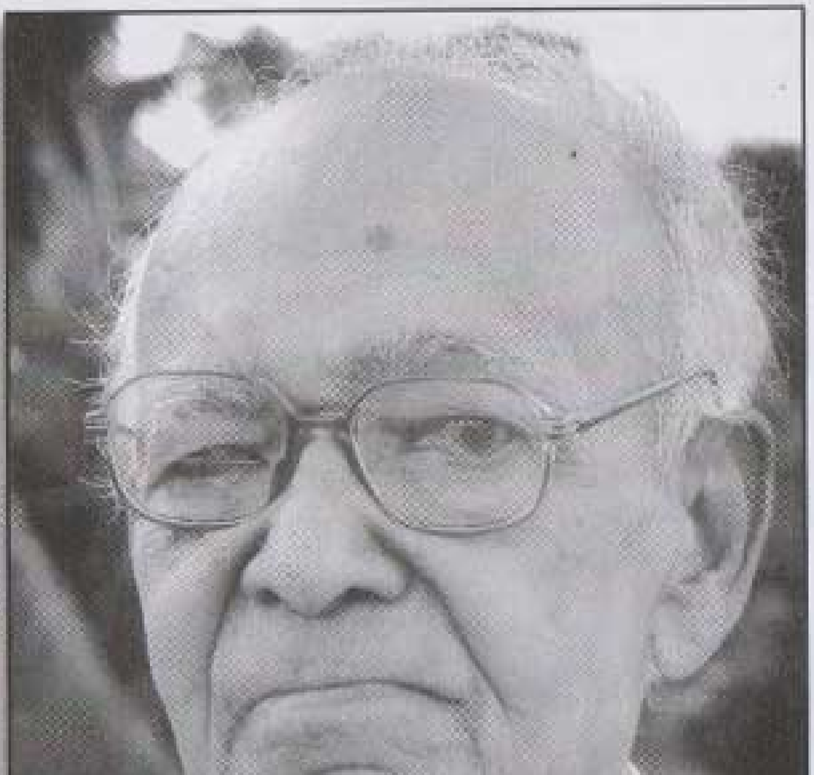

স্মৃতি ও শ্রদ্ধা

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ

আবু মহম্মদ ফেরদাউস স্মরণে

হাতে গোনা যে কয়জন মানুষ ত্যাগের রাজনীতি অর্থাৎ আদর্শের রাজনীতি করতে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস তাঁদের অন্যতম। অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মুক্তচিন্তা, মানবসেবা ছিল তাঁর জীবনাদর্শ। ৪০-এর দশকে যখন প্রগতিশীল রাজনীতি করা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তখন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সাহসী ভূমিকা নিয়ে দেশ ও জনগণের কল্যাণে সেই প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করেই রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার কারণে হুলিয়া মাথায় নিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন এবং তখন মুসলিম লীগের আক্রোশে তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। ১৯৫৭ সালে ন্যাপ গঠন ও পরবর্তী সময়ে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রাম সংগঠিত করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও খুলনার বিভিন্ন সমস্যা এবং উন্নয়নের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করে এ অঞ্চলের মানুষের আস্থার প্রতীক হয়ে ওঠেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। রাজনীতির ভাঙাগড়ার খেলায় কখনো নিজেকে ভাসিয়ে দেননি বরং আদর্শ ত্যাগ না করার কারণে তাঁর অনেক আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক মামলা হয়েছে। কারাবরণও করেছেন কয়েকবার। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সবার কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা অক্ষুণ্ন ছিল। এটা অনেক বড় যোগ্যতা।

ফেরদাউস ভাই-এর সঙ্গে আমার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল নিবিড়। নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। অনেক সময় তিনি ঢাকা আসতে না পারলে টেলিফোনে কথা হয়েছে রাজনীতি ও পার্টির বিষয়ে। তাঁর কথা বুঝতে কখনো অসুবিধা হয়নি আমার। যে কোনো প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দিতে পছন্দ করতেন। শত ব্যস্ততার ভেতরও দেশ-বিদেশের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার ধারণা রাখতেন। শ্রেণীসচেতন, বাস্তববাদী, দেশপ্রেমিক, সৎ ও সাদাসিধে চলনবলনের এই গুণী মানুষটি আগামী প্রজন্মের চলার পথে আদর্শের আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ : সভাপতি, বাংলাদেশ ন্যাপ

প্রকৌশলী শেখ মু. শহীদুল্লাহ

চিরস্মরণীয় আবু মহম্মদ ফেরদাউস

কতই না সুন্দর এই পৃথিবী। নদ-নদী পাহাড়-পর্বত ছড়া-জলপ্রপাত বনজঙ্গল বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তর বিচিত্র বন্য জীবজন্তু পৃথিবীকে সুন্দর ও সুশোভিত করেছে। নানা অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদের তারতম্যে এই সৌন্দর্য উপভোগের বিষয়টিও হয়ে ওঠে ভিন্ন। স্বচ্ছল ও সুখী লোকেরা আনন্দ পায় কিন্তু এই সৌন্দর্য ভোগের বিলাসিতা অধিকাংশ দুঃখী ও ক্ষুধার্ত শোষিত জনগণের জন্য নয়। জীবন তাদের কাছে এক অভিশাপ ও আজন্ম পাপ। তারা কোনো মতে জীবন আঁকড়ে থাকে আর ধনিকশ্রেণী তাদের কোনো রকমে বাঁচতে দিয়ে তাদের হাড়ভাঙা শ্রমের উৎপাদন লুণ্ঠন করে অঢেল সম্পদ সৃষ্টি করে। জীবনধারণ এই অধিকাংশ মানুষের জন্য অভিশপ্ত জীবনের যন্ত্রণা যা দেশপ্রেমিক বিবেকবান লোকের হৃদয়ে ব্যথা বেদনার সঞ্চার করে। শোষক, প্রতারক, লুণ্ঠনকারী ক্ষুদ্রসংখ্যক মানুষ ছাড়া সবাই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। এই অবস্থার মধ্যে বহু লোকের মধ্যে এমন কতিপয় অসাধারণ ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, যারা চরিত্রবান ও দেশপ্রেমিক, যারা জনগণের উপকারার্থে সারা জীবন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন। এরা সর্বজনশ্রদ্ধেয় আদর্শ পুরুষ, মহাপুরুষ। তাদের উপস্থিতি ও কর্মকাণ্ড শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নিষ্ঠুরতার মাঝে আশার আলো দেখায়। এই মহান শ্রেণীর একজন হচ্ছেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় আবু মহম্মদ ফেরদাউস। তিনি ভাষাসৈনিক, স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী, একটি দেশপ্রেমিক পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং সেই পার্টির খুলনা জেলা শাখার সভাপতি, বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। নির্লোভ, সমাজতন্ত্রী, আমৃত্যু সংগ্রামী সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। সারা খুলনা জেলায় একজন লোকও পাইনি যিনি তাঁকে চেনেন অথচ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন না।

আমার বাড়ি বর্তমান খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রামে আর ফেরদাউস সাহেবের পৈত্রিক নিবাস খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সন্নিহিত ফুলতলা উপজেলার আটরা গ্রামে। তাঁর জন্মস্থান আমার জন্মস্থান থেকে মাত্র চার মাইল দূরে। অথচ আমার সত্তর বছর বয়সের পূর্বে (তখন তাঁর বয়স সাতাত্তর বছর) আমাদের দেখা হয়নি। কিন্তু দূর থেকে এই মহাপুরুষের গৌরবগাথার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। বহু লোকের কাছে তাঁর কর্মকাণ্ডের কথা শুনে উচ্ছসিত হয়েছি। তাঁর ছোট ভাই প্রকৌশলী বজলুর রহমান আমার চেয়ে এক বছর নিচে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তেন। তখন জানতাম, ফেরদাউস সাহেব একটি পুস্তক বিপণীর মালিক। সমাজসচেতন, দেশপ্রেমিক, জনপ্রিয় মানুষ হিসেবে এই প্রবাদপুরুষের গুণের কথা শুনি। আদর্শে অবিচল, মেধায় উচ্চ, শ্রমে অক্লান্ত, মানবসেবায় নিবেদিত, সৎ, কর্তব্যপরায়ণ এবং সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ এই মানুষটি

আমাকে শেষ বয়সে অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছেন। এই আদর্শ কর্মযোগীর সংস্পর্শে এসে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান ও গর্বিত মনে করি। দুবছর আগে তাঁর মহাপ্রয়াণে শুধু খুলনা জেলার নয় আমারও অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির কাজে তাঁর সহযোগী হিসেবে আমার পাঁচ বছর কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ২০০৩ সালে অক্টোবর মাসে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ঢাকা-খুলনা-মংলা লংমার্চের শেষ পর্যায়ে বৃদ্ধ বয়সে ফুলতলায় তিনি বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে স্বাগত সংবর্ধনার আয়োজন করেন। এর পরও কয়েকবার খুলনা শহরে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনে তাঁর সান্নিধ্যে এসে গৌরব বোধ করি। যতদিন বেঁচে আছি তাঁর স্মৃতি বহন করে প্রেরণা লাভ করব।

প্রকৌশলী শেখ মু. শহীদুল্লাহ : আহবায়ক,
তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি

এম নূরুল ইসলাম

রাজনীতিক আবু মহম্মদ ফেরদাউস

আবু মহম্মদ ফেরদাউসের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কবে তা আজ সঠিকভাবে মনে নেই, সম্ভবত বিশ শতকের চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে। আমরা দুজনই তখন মুসলিম লীগের জঙ্গি কর্মী, সবুর সাহেব আমাদের নেতা। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান প্রাপ্তির পর আমরা দুজনই সবুর সাহেবের গ্রুপ ছেড়ে মুসলিম লীগের সবুরবিরোধী গ্রুপে যোগ দিই। সেই থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত আমরা দুজনে মুসলিম লীগ, গণতন্ত্রী দল ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির রাজনীতি করি একই চিন্তায় ও আদর্শে। তিনি ছিলেন আমার বড় ভাই, আমার নেতা।

আমি তখন খুলনা শহরের বাবু খান রোডের পৈতৃক বাড়িতে থাকি আর ফেরদাউস ভাই থাকেন তাঁর বাবা-মা-ভাই-বোনদের সঙ্গে শ্রীশনগরের ভাড়াবাড়িতে। ১৯৪৩ সালের প্রথম থেকে তাঁর ঠিকানা শ্রীশনগরের পুকুর পাড়ের দোতলা বাড়ির পুব দিকের ঘরটিতে। তার আগে বছর দেড়েক বি এল কলেজের হোস্টেলে বসবাস করেছেন ছাত্র হিসেবে। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে এতটাই জড়িয়ে পড়েছিলেন যে কলেজের লেখাপড়ায় ইতি টানতে হয়। সে সময় তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাইকগাছা নিবাসী আফিল উদ্দিন আহমদ। দুজনে মিলে বি এল কলেজে রাজনীতি ছাড়াও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী কিছু কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে খুলনার মুসলিম আসনে সবুর সাহেবকে এমএলএ নির্বাচিত করার জন্য ফেরদাউস ভাই দলীয় কর্মীদের নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সফল হন। সবুর সাহেবের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত এ্যাড. আব্দুল হাকিম। জাতীয় কংগ্রেস নেতা সৈয়দ নওশের আলি হাকিম সাহেবের পক্ষে কাজ করার জন্য খুলনা রেলওয়ে স্টেশনে পৌছালে ফেরদাউস ভাই, আফিল সাহেব ও অন্যান্য মুসলিম লীগ কর্মীরা স্টেশন থেকে রেল রোড সম্পূর্ণ অবরোধ করে রাখেন, ফলে সৈয়দ নওশের আলিকে ভিন্নপথে খুলনা শহরে প্রবেশ করতে হয়। সবুর সাহেবের জন্য এত যে শ্রদ্ধা-ভালবাসা সব কোথায় কেন চলে গেল জানি না। আমরা দেখি, ১৯৪৭ সালে খুলনা পাকিস্তানভুক্তির পরপর ফেরদাউস ভাই ও আফিল সাহেব মুসলিম লীগের সবুর গ্রুপ ত্যাগ করে অন্য গ্রুপে যোগ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবুর সাহেবের গুণ্ডাবাহিনী আফিল সাহেবকে নির্মমভাবে মারধর করলে তিনি হাসপাতাল ও বাবু খান রোডের এক বাড়িতে মাসাধিককাল পড়ে থাকেন। মারের ভয়ে আফিল সাহেব সবুর সাহেবের গ্রুপে ফিরে যান। কিন্তু ফেরদাউস ভাই একাধিকবার গুণ্ডাদের হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হলেও সবুর

গ্রুপে ফিরে যাননি। সেই থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি মুসলিম লীগের সবুরবিরোধী গ্রুপে নেতা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মী হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যান। এই সময় ভারতের পশ্চিম বাংলা থেকে খুলনায় আগত দুঃস্থ মুসলিম পরিবারের কিছু কিছু ছেলের পড়াশোনা চালিয়ে যাবার স্বার্থে তাদের লজিং-এর ব্যবস্থা করে দেন ফেরদাউস ভাই।

১৯৪৯ সালে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্মের পর খুলনায় সরকারবিরোধী সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এতে যারা অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন তাদের মধ্যে ফেরদাউস ভাই অন্যতম। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে খুলনায় আওয়ামী লীগের কর্মী এম এ বারী, তোফাজ্জেল হোসেন, সমীর আহমেদ এবং বামপন্থি কর্মী এম এ গফুর, এ কে সামসুদ্দিন সুনু, জাহিদুল হক ও মিজানুর রহিমের সঙ্গে ফেরদাউস ভাই এবং আমিও খুলনার ভাষা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করি। ২১ ফেব্রুয়ারি ও পরবর্তীকালে খুলনায় এই আন্দোলন লাগাতারভাবে চলতে থাকে। প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হতে থাকে এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই দিন খুলনায় ধর্মঘট হয়। প্রতিবছর এই দিন সবুর সাহেবের পক্ষ থেকে মাইকে ঘোষণা করা হতো–আগামীকাল স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত-দোকানপাট খোলা থাকবে। কিন্তু খুলনায় ফেরদাউস ভাইয়ের নেতৃত্বাধীন কমিটির নির্দেশনায় প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি সফল ধর্মঘট পালিত হয়। খুলনার ভাষা আন্দোলনে ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি একটি অবিস্মরণীয় দিন। এদিন সকালে সাউথ সেন্ট্রাল রোডে ছাত্র-যুবকদের মিছিলে সবুর সাহেবের গুণ্ডাবাহিনী আক্রমণ করে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই অল্পবয়সী স্কুল-কলেজের ছাত্র, ফেরদাউস ভাইসহ আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী। ফেরদাউস ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা প্রথমেই পার্শ্ববর্তী দোকানের ঝাঁপের লাঠি নিয়ে হামলাকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি, রাস্তার পাশের গড়ান কাঠের আড়ত থেকে আমাদের জন্য কাঠ ফেলে দেয়া হয়, সেই কাঠ দিয়ে আমরা গুণ্ডাদের মেরে তাড়িয়ে দিই। ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি খুলনার জীবনে আর এক উজ্জ্বল দিন। সেদিনের কথা পরে বলছি।

ইতিমধ্যে ১৯৫৩ সালের প্রথম ভাগে পূর্ববাংলার প্রথম অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রী দল-এর জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে। সাবেক জাতীয় কংগ্রেস কর্মী এ্যাড. আব্দুল জব্বার সভাপতি, গোপন কমিউনিস্ট কর্মী ভাষাসৈনিক এম এ গফুর সাধারণ সম্পাদক, আবু মহম্মদ ফেরদাউস ও দেবেন দাশ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই দলে প্রধানত কমিউনিস্ট ও উদার গণতন্ত্রীরা যোগদান করেন। আমিও এই দলে চলে আসি। আরও আসেন এস এম এ জলিল, ছাত্রনেতা মিজানুর রহিম, নুরুল ইসলাম নান্নু, মালিক আতাহার উদ্দিন, এ কে সামসুদ্দিন সুনু, আব্দুর রব প্রমুখ। প্রথম থেকেই এ দলটি সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী ভূমিকা পালন করতে থাকে। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে গণতন্ত্রী দল যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করে। নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। মুসলিম লীগ নেতা সবুর সাহেবও পরাজিত হন। পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে হিন্দু আসনে গণতন্ত্রী দলের নেতা দেবেন দাশ নির্বাচিত হন। বটিয়াঘাটা-

তেরখাদা-ফকিরহাট-মোল্লাহাট-খুলনা সদর কেন্দ্রে একজন সাধারণ কৃষক কর্মী বিভূতি রায় নির্বাচিত হন। নির্বাচনের বেশ আগেই ফেরদাউস ভাইয়ের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে তিনি আত্মগোপনে চলে যান এবং লাগাতারভাবে বিভূতি রায়ের নির্বাচনী এলাকায় কাজ করতে থাকেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন শান্তি ঘোষ, কালীদাস ব্যানার্জী, আমি ও আরও অনেকে।

যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের মুখ্যমন্ত্রিত্বে পূর্ববাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার পূর্ববাংলার এই সরকারকে মেনে নিতে পারেনি। তারা নানারকম চক্রান্ত করতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৪ সালের মে মাসেই পূর্ববাংলার ফজলুল হক মন্ত্রিসভা বাতিল করে প্রদেশের ওপর গভর্নরের শাসন জারি করে। আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতাসহ কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রী দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়। ফেরদাউস ভাই গ্রেফতার এড়াতে আত্মগোপন করেন, কিন্তু ঢাকার পল্টন ময়দানে পাকিস্তান দলের ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ দেখার সময় ময়দানেই গ্রেফতার হন।

কেন্দ্রে ও পূর্ববাংলা প্রদেশে সরকার গঠন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভাঙাগড়া ও মেরুকরণ চলতে থাকে। আওয়ামী লীগ কিছুকাল কেন্দ্রে ও প্রদেশে সরকার গঠন করে। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে পাকিস্তানের মার্কিনঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি হয়। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী ময়মনসিংহের কাগমারীতে পূর্ববাংলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন সারা পূর্ববাংলায় দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কিন্তু মওলানা ভাসানী প্রতিকূল হাওয়া বুঝতে পেরে সম্মেলনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কোনো আলাপ না করে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন এবং জুলাই মাসে সারা পাকিস্তানের সকল প্রদেশের জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রীদের গণতান্ত্রিক কনভেনশন আহ্বান করেন। এ সময় পূর্ববাংলায় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান, গণতন্ত্রী দলের সেক্রেটারি জেনারেল মাহমুদ আলী ছিলেন অন্যতম মন্ত্রী। কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার সদরঘাটের রূপমহল সিনেমা হলে। প্রথম দিন সকালে খুলনার কাউন্সিলর ও ডেলিগেটরা মাহমুদ আলী সাহেবের সরকারি বাসভবন থেকে রওনা হয়ে সদরঘাটে পৌঁছালে ছাত্রলীগ ও কয়েকটি দক্ষিণপন্থি ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা হাতে ছোট ছোট লাঠির মাথায় কালো পতাকা আটকে রুশ-ভারতের দালাল বলে চিৎকার দিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের সামনেই এ ঘটনা ঘটায় আমরা স্তম্ভিত হয়ে পড়ি এবং পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। অনেকেই আর সম্মেলন কক্ষে ঢুকতে পারেনি। কিছু সময় তাণ্ডব চলার পর পুলিশ বেরিকেড দিয়ে দেয়। পরদিন সকালে কনভেনশন হলে জমায়েতে মওলানা ভাসানীর আবেগময় বক্তৃতার পর নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার সিদ্ধান্ত হয়, নাম দেওয়া হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি–ন্যাপ। পাকিস্তান কমিটি ও পূর্ব পাকিস্তান কমিটির সভাপতি হন মওলানা ভাসানী। বিকালে সদরঘাট থেকে মিছিল করে কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী নেতাকর্মীরা পল্টন ময়দানে উপস্থিত হন। সভার কাজ শুরু হওয়ামাত্র একদল লুঙ্গিপরা

যুবক বাঁশের লাঠি নিয়ে মঞ্চের কাছে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বোমা মারে, কিন্তু ন্যাপকর্মীদের পাল্টা আঘাতে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে জিপ গাড়িতে করে মাইকে ১৪৪ ধারা ঘোষণা করা হয়। জনসভার উপর ইট-পাটকেল ছুড়তে থাকে, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত বর্ষীয়ান জাতীয়তাবাদী নেতারাও এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। কিন্তু সারা পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়। স্বাভাবিক কারণেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে ন্যাপের দূরত্ব তৈরি হয়। এতদিন মুসলিম লীগের হামলার শিকার ছিল গণতন্ত্রী দলের কর্মীরা। এখন থেকে মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের হামলার শিকার হতে থাকে ন্যাপের কর্মীরা। খুলনায় ন্যাপের কমিটি ও অধুনালুপ্ত গণতন্ত্রী দলের কমিটি প্রায় একই রকম থাকে।

এ অবস্থায় ১৯৫৮ সালে খুলনা পৌরসভার নির্বাচন হলে ওয়ার্ড কমিশনার পদে আওয়ামী লীগের ৩ জন ও ন্যাপের ৫ জন নির্বাচিত হন। বাকি আসনগুলি সবুর সাহেবসহ মুসলিম লীগের নেতারা পেয়ে যান। ন্যাপ সভাপতি এ্যাড. আব্দুল জব্বারকে পৌরসভার চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের এ্যাড. মোমিন উদ্দিন আহমদকে ভাইস-চেয়ারম্যান করা হবে এ মর্মে চুক্তি হয়। কিন্তু সবুর সাহেবের লোকেরা যেকোনো একজন কমিশনারকে কিডন্যাপ করতে পারে আশঙ্কা করে আমাদের কমিশনারদের নির্বাচন পর্যন্ত এক জায়গায় থাকার ও একসঙ্গে ঘোরাফেরা করার সিদ্ধান্ত হয়। এ সময় আমরা ফেরদাউস ভাইয়ের পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতায় সবুর সাহেবের নানা অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে জব্বার সাহেবকে চেয়ারম্যান ও মোমিন সাহেবকে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতে সমর্থ হই। কিন্তু ছ'মাস বাদেই আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করলে পৌরসভার স্থানীয় সরকার বাতিল হয়ে যায়।

১৯৬২ সালে আইয়ুব খান প্রণীত সংবিধানবিরোধী ও শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টবিরোধী আন্দোলন শুরু করে ছাত্রসমাজ। এ আন্দোলনে শক্তি যোগায় ন্যাপসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল। ১৯৬২ সালের সংবিধান অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার মোট ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হবার কথা, এরাই দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একমাত্র ভোটার। ১৯৬৪ সালে আইয়ুববিরোধী সকল রাজনৈতিক দল সম্মিলিত বিরোধী দল–কপ নামে একটি জোট গঠন করে মিস ফাতিমা জিন্নাকে প্রেসিডেন্ট পদে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। আমরা ফেরদাউস ভাইয়ের নির্দেশনায় ফাতিমা জিন্নাহর পক্ষে কাজ করতে থাকি এবং বুঝতে পারি যে, আইয়ুব খানকে জেতাবার জন্য সরকারি কর্মকর্তারা নির্বাচিত মৌলিক গণতন্ত্রীদের উপর নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করছে। এ সময় খুলনায় একটি বড় মাপের সরকারবিরোধী ঘটনা ঘটে যায়। আইয়ুব খানবিরোধী বিশাল মিছিল খুলনা থানার সামনে দিয়ে যাবার সময় মিছিল আক্রান্ত হলে থানাও আক্রান্ত হয়। অনেকক্ষণ ধরে আক্রমণ-প্রতিআক্রমণ চলে। পরদিন ভোরে ফেরদাউস ভাইসহ আমাকে ও আরও ৪০/৫০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে আনে এবং মামলা দেয়।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। এই কর্মসূচিকে তারা বাঙালির বাঁচার দাবি হিসেবে জনগণের মধ্যে তুলে ধরেন। ৭ জুন আওয়ামী লীগ হরতাল আহ্বান করে এবং হরতালকারীদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে ১১ জন নিহত হন। এর প্রতিবাদে ৮ জুন ন্যাপ নেতৃবৃন্দ এক দীর্ঘ প্রচারপত্র প্রচার করেন। এ সময় ন্যাপের নেতাকর্মীদের মধ্যে ৬ দফা ইস্যুতে বিভক্তি দেখা দেয়। খুলনা ন্যাপের সেক্রেটারি এম এ গফুর ন্যাপ থেকে পদত্যাগ করে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। বিভক্তি বাড়তে বাড়তে একসময় ১৯৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ন্যাপের সহ-সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে ন্যাপ (মোজাফফর) নামে একটি পৃথক সংগঠনের জন্ম হয়। খুলনায় এ্যাড. আব্দুল জব্বারের নেতৃত্বে আমি, এ্যাড রাজ্জাক আলী, এস এম এ জলিল, শান্তি ঘোষ, গাজী শহীদুল্লাহ, মালিক আতাহার, নজরুল ইসলাম প্রমুখ মূল ন্যাপে থাকি। আর ফেরদাউস ভাইয়ের নেতৃত্বে ন্যাপ (মোজাফফর)-এ চলে যান এ কে সামসুদ্দিন সুনু, এম এ রব, দেবেন দাশ, দীন মহম্মদ প্রমুখ।

এই প্রথম আমি আর ফেরদাউস ভাই আলাদা দলভুক্ত হই। কিন্তু আমাদের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক আজীবন অটুট থাকে। ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময় আমার ও ফেরদাউস ভাইয়ের দলের রাজনীতি ভিন্ন ধারায় চলতে থাকে, তবে উভয় দলই আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে ফেরদাউস ভাই গ্রেফতার হয়ে যান এবং কিছুদিন পর মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি খুলনার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবময় দিন। শহীদ দিবসে আইয়ুববিরোধী বিশাল মিছিল হাজী মহসীন রোডে অবস্থিত পৌর চেয়ারম্যানের বাংলোয় বসবাসরত বাঙালি-বিদ্বেষী পৌর-প্রশাসক কাউতের বাসভবনের সামনে দিয়ে যাবার সময় কাউতের পাহারাদার পুলিশ ও মিছিলকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পুলিশের গুলিতে দু'জন নিহত হন। মিছিলকারীদের কেউ কেউ বন্দুক নিয়ে আসে। এ সময় ফেরদাউস ভাই তাঁর অনুসারীদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে কাউতের বাড়ির মধ্যে ঢুকে যান এবং লাশ নিয়ে মিছিলরত জনতার সাথে শরিক হন। এই মিছিলের একটি অংশ বড়মাঠের নিকটস্থ সবুর সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এখানে পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হন। এই ৩ জন শহীদ হলেন তরুণ লন্ড্রিকর্মী হাদিস, তরুণ কটন মিলশ্রমিক আলতাফ ও কিশোর স্কুলছাত্র প্রদীপ।

এভাবে আইয়ুব শাহীর পতন হয় এবং ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ফেরদাউস ভাই 'কুঁড়েঘর' প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে পরাজিত হন। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আওয়ামী লীগ লাভ করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৪৪টি আসনের মধ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৮৮টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে এবং

পিপলস পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসন লাভে ব্যর্থ হয়। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে উভয় দলই আঞ্চলিক দল হিসেবে বেরিয়ে আসে। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের শাসকরা ও পিপলস পার্টি বাঙালির রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের সরকার গঠনে প্রবলভাবে বাধা দেয়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকে। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী ঢাকায় হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ সময় কিছুদিন বাগেরহাটে অবস্থান করার পর ফেরদাউস ভাই ভারতে চলে যান। আমিও ভারতে চলে যাই। ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হবার পর ফেরদাউস ভাই খুলনায় ফিরে আসেন এবং বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকেন। আমাদের রাজনীতি ভিন্ন পথ গ্রহণ করে।

১৯৭৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সমন্বয়ে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। ওদিকে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ ও কতকগুলি ছোট বাম দল এক বিরোধী ঐক্যফ্রন্ট গঠন করে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর ভিত্তিতে শেখ মুজিবুর রহমান আইনত বৈধ একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ–বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন। ন্যাপ (মোজাফফর)-এর প্রায় সকল সদস্যই এই একমাত্র বৈধ দলে যোগদান করেন। ফলে কার্যত ন্যাপ (মোজাফফর)-এর বিলুপ্তি ঘটে। ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করলে উভয় ন্যাপই সক্রিয় হয়। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর মৃত্যু হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। মওলানা ভাসানীর অনুসারী প্রায় সকল সদস্যই এই নতুন রাজনৈতিক দলে যোগদান করেন। ফলে ন্যাপের বিলুপ্তি ঘটে এবং ন্যাপ (মোজাফফর) নামে ন্যাপের একটি ক্ষীয়মাণ ধারা প্রবহমান থাকে। ফেরদাউস ভাই আমৃত্যু এই দলের খুলনা জেলা সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৮২–৯০ সময়কালে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ভাসানী ও মোজাফফর-এর অনুসারীরা দুটি পৃথক জোটের অন্তর্ভুক্ত থেকে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের সংগ্রামে দেশপ্রেমিক ভূমিকা পালন করে। এ সময় ফেরদাউস ভাইকে আগের মতো সক্রিয় হতে দেখা যায়। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও খুলনা অঞ্চলের পশ্চাৎপদতা নিরীক্ষণ করে ১৯৮৯ সালে ফেরদাউস ভাই বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠন করলেন। তিনি আমৃত্যু এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। এই সংগঠনে দলমতনির্বিশেষে খুলনার উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষী সকল নেতা যোগদান করেন এবং তাঁরা একবাক্যে ফেরদাউস ভাইকে তাঁদের নেতা হিসেবে মেনে নেন।

ফেরদাউস ভাই ১৯৪১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬৫ বছর যথাক্রমে মুসলিম লীগ, গণতন্ত্রী দল ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কর্মীনেতা হিসেবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও বামপন্থি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। কেউ কেউ বলে থাকেন, ফেরদাউস ভাই রাজনীতিতে সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তাঁরা হয়তো মনে

করেন এমপি বা মন্ত্রী হওয়ার মধ্যে অথবা বড় কোনো দলের কেন্দ্রীয় বড় নেতা হওয়ার মধ্যে একজন রাজনীতিবিদের সাফল্য নিহিত থাকে। কিন্তু আমার মতো যারা বিশ শতকের চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সার্বক্ষণিক কর্মী ও নেতা হিসেবে ফেরদাউস ভাইকে দেখেছেন তাঁরা জানেন কী ত্যাগ, নিষ্ঠা, সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে তিনি দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করে গেছেন। খুলনার গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও খুলনার উন্নয়নের সংগ্রামে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল অবদানের জন্য তাঁর নাম খুলনার ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে থাকবে।

এম নূরুল ইসলাম : সাবেক এমপি ও বিএনপি নেতা

কে এম হাসান

আবু মহম্মদ ফেরদাউস : শ্রদ্ধাঞ্জলি

খুলনার কৃতী সন্তান জনাব আবু মহম্মদ ফেরদাউস বৃটিশ আমলের শেষ দিকে খুলনার সংখ্যালঘু মুসলমান ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ করে তদানীন্তন বাংলার মুসলমানদের দাবি পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হন।

আমি স্কুলের ছাত্র থাকতেই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই এবং অচিরেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিলেন। ফলে আমি তাঁকে বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করতাম। তিনি আমাকে তাঁর ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৯৪৫ সালে খুলনার নেতৃস্থানীয় মুসলমান ছাত্রদের উদ্যোগে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্বে ছিলেন সর্বজনাব আফছার সাহেব, আফিল সাহেব, হাশেম সাহেব এবং সর্বোপরি ফেরদাউস সাহেব। বম্বে থেকে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ সভাপতি মহম্মদ আলী জিন্নাহর শুভেচ্ছাবাণী সংগ্রহ করে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অচিরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে পাকিস্তানের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন সে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু এ সত্য প্রকাশ বা এর প্রতিবাদ করার কোনো পরিবেশ তখন ছিল না। ফলে সংগত কারণে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়।

খুলনার বরেণ্য মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আর ছিল না। জনাব ফেরদাউস একজন দূরদর্শী সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। ব্যক্তিস্বার্থে নয়, জনকল্যাণে কাজ করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে গিয়ে তিনি জেল খেটেছেন, আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে দিনের পর দিন।

১৯৫৪ সালে যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন ঢাকায় ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ফেরদাউস ছিলেন ঢাকায় আত্মগোপন করে। খুলনা থেকে আগত বন্ধুদের সঙ্গে আমি রোজ ক্রিকেট খেলা দেখতে যেতাম। একদিন খেলাশেষে স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে আসতে দেখি একজন কালো শেরওয়ানি পরা ব্যক্তি ফেরদাউস সাহেবের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। ফেরদাউস সাহেব আমাকে দেখে কিছু বলতে চাচ্ছিলেন কিন্তু আমার শোনা হলো না।

খুলনায় জনাব ফেরদাউসের নিজের একটি বেশ বড় বইয়ের দোকান ছিল। নাম–মডার্ন বুক ডিপো। তিনি দীর্ঘদিন নিয়মিত বইয়ের দোকানে বসতেন। আমার ছুটি থাকলে আমি

মডার্ন বুক ডিপোতে উপস্থিত থেকে তাঁকে সাহায্য করতাম। দু-একদিন আমাকে বসিয়ে রেখে দুপুরের খাবার খেতে বাড়ি চলে যেতেন। আমি বই পড়ে সময় কাটাতাম।

পাকিস্তান আন্দোলনে জনাব ফেরদাউসের সক্রিয় ভূমিকা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণ বুঝতে হলে বৃটিশ আমলে খুলনার সংখ্যালঘু মুসলমানদের দুরবস্থা এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের একটি কলোনি হিসেবে শাসন-শোষণ সম্পর্কে জানতে হবে। দূরদর্শী ফেরদাউস সাহেব অচিরেই এটা বুঝতে পেরেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শত শত বিহারি (অবাঙালি) খুলনায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। খুলনাবাসীর জন্য আর এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

জনাব ফেরদাউস সাহেবের রাজনীতি এবং কর্মপ্রয়াস বুঝতে হলে খুলনার সামাজিক বৈশিষ্ট্য জানতে হবে। সুতরাং সে সময়কার খুলনা শহরের সামাজিক ইতিহাস বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

খুলনা শহর অন্য শহর থেকে পৃথক অবয়বে গড়া একটি সুন্দর ছোট শহর। শহরের প্রধান রাস্তাগুলো ছিল পিচের এবং সোজা। আঁকাবাঁকা নয়। সব সরকারি অফিস, আদালত এবং জেলা পর্যায়ের অফিসারদের বাসগৃহ ছিল পরিকল্পনা মতো সারিবদ্ধভাবে নির্মাণ করা।

খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন জমিদার রায়বাহাদুর মহেন্দ্র ঘোষ। তিনি অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। খুলনা শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রয়াস ছিল। যে কারণে তিনি থাকতে অন্য আর কাউকে চেয়ারম্যান পদে দেখিনি।

খুলনা শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি মাঠ ছিল যা 'বড়মাঠ' নামে পরিচিত ছিল। এখানে ছিল চারটি ফুটবল মাঠ। এ ছাড়া একটি ফুটবল মাঠ ছিল সার্কিট হাউজের সামনে। মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি পোস্ট-টেলিগ্রাফ অফিস ছিল। এ ছাড়া আর কোনো ভবন (বিল্ডিং) ছিল না এই 'বড়মাঠে'। অপরূপ ছিল এই বড়মাঠের দৃশ্য।

বৃটিশ আমলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই মাঠে ছোট ছোট প্লেন নামার ব্যবস্থা ছিল। তবে খেলার মাঠ খেলার উপযোগী করে রাখা ছিল। প্লেন নামার আগে শুধু ফুটবল মাঠের দুটি গোলপোস্ট তুলে সরিয়ে রাখা হতো। গোলপোস্ট তুলে রাখা এবং প্লেন চলে গেলে আবার বসিয়ে দেবার সুব্যবস্থা ছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই বড়মাঠের অনেকটা মাঝখানে কয়েকজন শ্রমিক একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নির্মাণ করার জন্য মাঠ খুঁড়ছিল। আমাদের পাশের বাড়ি ছিল সবুর সাহেবের পৈত্রিক বাড়ি। সেখান থেকে তিনি দেখতে পেয়ে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা অবস্থায় দ্রুত তাদের কাজ বন্ধ করে ফিরে আসেন। পরে দেখা গেল দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে একটা টিনশেড নির্মাণ করে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে টিএন্ডটি বিভাগ একাধিক বিল্ডিং নির্মাণ করেছে। ওই সময় যদি দ্রুত বর্তমান ক্ষুদ্র স্টেডিয়ামটি নির্মাণ করা না হতো তাহলে সমস্ত মাঠ জুড়েই টিএন্ডটি বিভাগের বিল্ডিংগুলো নির্মিত হয়ে যেত। বৃটিশরা যে

খেলার মাঠ রক্ষা করে কাজ সমাধা করেছে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা সে খেলার মাঠ রক্ষার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। যেমন ইচ্ছে তেমন কাজ করা অবৈধ ছিল না তাঁদের কাছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে খুলনা শহর ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। খুলনা শহরে হাতে গোনা কয়েকটি বর্ধিষ্ণু মুসলমান পরিবার ছিল। খুলনায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তা তখন খুলনার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জেলার জনগণ জানত না। ওই সময় খুলনায় সুশিক্ষিত উচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান তেমন কেউ ছিলেন না। খুলনায় ৬০/৭০ জন উকিল ছিলেন। এঁদের মধ্যে মাত্র আট-দশ জন মুসলমান ছিলেন। বলা বাহুল্য, হিন্দু প্রধান অঞ্চলে এঁদের তেমন পসার ছিল না। খুলনা শহরে একটিমাত্র মসজিদ ছিল বর্তমান বিভাগীয় কমিশনারের বাড়ির সামনে, যা আজো বিদ্যমান।

আমি মডেল হাই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। রায়বাহাদুর মহেন্দ্র ঘোষ এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। হেডমাস্টার ছিলেন নির্মল চন্দ্র পাল। সুযোগ্য হেডমাস্টারের জন্য স্কুলের তখন খুব সুনাম ছিল। হেডমাস্টার ছিলেন শুধুমাত্র বিএ পাশ। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপত্তি তোলা হলো, বিটি পাশ ছাড়া হেডমাস্টার রাখা যাবে না। যার ফলে হেডমাস্টার নির্মল চন্দ্র পাল ছুটি নিয়ে বিটি পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। সে খবর শুনে ছাত্র-শিক্ষক সবাই আনন্দ ও গর্বে উদ্বেলিত হন। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রায়বাহাদুর মহেন্দ্র ঘোষ কর্তৃক নির্বাচিত হেডমাস্টার ছিলেন তাঁরই মতো একজন সাম্প্রদায়িক গোঁড়া হিন্দু। আমি যখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি তখন একদিন নোটিশ দেয়া হলো, সকল ছাত্রকে ছুটির পর স্কুলের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে সমবেত হতে। উপস্থিত সব ছাত্র এবং শিক্ষকদের সামনে রবি ঘোষ নামক একজন ছাত্রকে বেদম বেত মারা হলো। অপরাধ, অসভ্যের মত 'পাজামা' পরে স্কুলে এসেছে!

আমি ১৯৪৭ সালে একাই একজন মুসলমান ছাত্র মডেল স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করি। পাশ করে 'দৌলতপুর কলেজে' ভর্তি হই। তখন খুলনা শহরের মধ্যে কোনো কলেজ ছিল না। কলেজটি 'দৌলতপুর কলেজ' নামে পরিচিত ছিল। প্রকৃত নাম ছিল 'ব্রজলাল হিন্দু একাডেমি'। কলেজের সকল শিক্ষক ছিলেন বর্ণহিন্দু। শুনেছি, ড. মেঘনাথ সাহা বর্ণহিন্দু নন বলে এ কলেজে চাকুরি পাননি। মুসলমান ছাত্র আরবি, ফারসি বিষয় নিয়ে পড়তে চাইলে তাকে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে একটি একতলা ভবনে গিয়ে পড়তে হতো। মুসলিম ছাত্রদের হোস্টেলও ছিল এ ভবনে। খুলনা শহর থেকে ছাত্রদের দৌলতপুর যাতায়াতের জন্য ছিল শাট্‌ল্ ট্রেন। সকাল দশটার দিকে একবার এবং বিকেলে একবার যাতায়াত করত। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কলেজে আমার ক্লাসে একজন শিক্ষক ক্লাস নিতে এসে দেখলেন ব্লাকবোর্ডে আরবি হরফে কিছু লেখা। শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন কে লিখেছে? উত্তর না পেয়ে ক্লাসরুম থেকে তিনি বের হয়ে চলে গেলেন। ক্লাস আর হলো না।

দৌলতপুর ব্রজলাল হিন্দু একাডেমিতে পড়তে দূরদূরান্ত থেকে মেধাবী হিন্দু ছাত্ররা আসত। কলেজের ভিতর বহু ছাত্রের অবস্থানের সুবিধার্থে একটি দোতলা হোস্টেলসহ অনেকগুলো হোস্টেল ছিল। মেজর জেনারেল (অবঃ) সি আর দত্ত সিলেট থেকে হিন্দু

একাডেমিতে পড়তে এসেছিলেন। তিনি বর্তমানে ঢাকায় বাস করেন। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের তিনি সভাপতি।

আমি ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করে ভর্তি হই 'ব্রজলাল হিন্দু একাডেমি'তে; ১৯৪৯ সালে আইএ পাশ করি 'ব্রজলাল একাডেমি' থেকে এবং ১৯৫১ সালে বিএ পাশ করি 'ব্রজলাল কলেজ' থেকে। আমার সার্টিফিকেটগুলো এ সত্যের প্রমাণ বহন করে। ১৯৬০-৬১ সালের পূর্বে বি এল কলেজ নামে এ কলেজের কোনো পরিচিতি ছিল না। 'দৌলতপুর কলেজ' নামে ছিল এর বিস্তৃত পরিচিতি।

ফেরদাউস সাহেব ছিলেন ব্রজলাল হিন্দু একাডেমি তথা দৌলতপুর কলেজের একজন ছাত্র।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার বেশ কয়েক বছর পর ষাট দশকে বি এল কলেজের সন্নিকটে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় যার নাম দেয়া হয় 'দৌলতপুর কলেজ', ফলে দৌলতপুর কলেজ নামে সুপরিচিত ব্রজলাল কলেজ, বি এল কলেজ নামেই পরিচিত হয়। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে ব্রজলাল শাস্ত্রী মহাশয় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী নিয়ে যে হিন্দু একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী কলেজে নেই। হিন্দু একাডেমিরও পতন হয়েছে। তবে 'ব্রজলাল' নামটি বহাল আছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তান এবং অবাঙালিদের দ্বারা শাসন ও শোষণের পরিণতিতে প্রগতিশীল মুসলমানবৃন্দ তাঁদের প্রকৃত বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ বুঝতে পারেন। ফলে নতুন এক আন্দোলন গুমরে ওঠে, এঁদের অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন জনাব আবু মহম্মদ ফেরদাউস। ঢাকা থেকে দূরে পিছিয়ে পড়া খুলনার উন্নয়নে তাঁর বলিষ্ঠ সংগ্রামী ভূমিকা চিরঅম্লান হয়ে থাকবে।

কে এম হাসান : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সরকারি বি এল কলেজ, খুলনা

ওয়াহিদুর রহমান

আবু মহম্মদ ফেরদাউস স্মরণে

স্বীয় নীতিতে একনিষ্ঠ থেকে যে মানুষটি সকল দলমতের মানুষ নিয়ে আন্দোলন করতে পারতেন তিনি আবু মহম্মদ ফেরদাউস। সর্বজনশ্রদ্ধেয় ফেরদাউস ভাই। তাঁর জীবন পরিক্রমা খুলনাকেন্দ্রিক। জীবনের সিংহভাগ কেটেছে খুলনার আনন্দ-বেদনা, শান্তি-অশান্তি, সুখ-দুঃখ, পাওয়া-না পাওয়ার ভাগিদার হয়ে। তাঁর নেতৃত্বে বিভেদ ভুলে সব স্তরের মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন এক কাতারে। সংঘাতময় সমাজে এমন অসাধ্য সাধন করা একমাত্র ফেরদাউস ভাইয়ের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

পিতৃভূমি ফুলতলার আটরায়। বাল্যকাল কেটেছে ঢাকার মুন্সিগঞ্জে নানাবাড়িতে এবং পিতার কর্মস্থল ঢাকায়। জন্ম ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি। পিতা একরামুদ্দিন ছিলেন ইংরেজ আমলে সরকারি চাকুরে। তখনকার দিনে অত্যন্ত সম্মানজনক পদে। মহকুমা স্কুল পরিদর্শক। বদলির চাকরি। এপার বাংলা ওপার বাংলার বিভিন্ন শহরে ঘুরতে হয়েছে তাঁকে। পিতার অনুগামী হয়ে কিশোর আবু মহম্মদ ফেরদাউস ঘুরেছেন অনেক। ঘুরতে ঘুরতে একসময় বরিশাল জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন ১৯৪১ সালে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে তখন। স্কুলপর্ব শেষে দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজে ভর্তি হন আইএস-সি ক্লাসে। কলেজ হোস্টেলে তাঁর অবস্থান। কাছেই আটরা গ্রাম। পিতৃভূমিতে তাঁর এভাবে ফিরে আসা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় জোরেশোরে। স্বাধীনতাকামীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন 'কুইট ইন্ডিয়া' স্লোগানে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের আন্দোলন একটু ভিন্ন মাত্রার। 'কুইট বাট ডিভাইড এন্ড কুইট'। আমাদের জন্য পাকিস্তান দাও তারপর বিদেয় হও। ভারতবর্ষের মুসলমানরা মহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের ব্যানারে একতাবদ্ধ হয়। পাকিস্তানের জন্য আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে বাংলা প্রদেশে। খুলনা বাংলার বাইরে নয়। অতএব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আক্রান্ত। আবু মহম্মদ ফেরদাউস কলেজ পড়ুয়া তরতাজা যুবক। ঝাঁপিয়ে পড়েন 'লড়কে লেংগে পাকিস্তান' স্লোগান মুখে। সবুর খান, খুলনার মুসলিম লীগের দাপুটে নেতা। সবুর খানের নেতৃত্বে আবু মহম্মদ ফেরদাউস রাজনীতি শুরু করেন। লেখাপড়া লাটে ওঠে। ফেরদাউস কলেজ ছাড়েন এবং হোস্টেল ছাড়েন। উঠে আসেন শ্রীশনগরের যৌথ পরিবারের ভাড়া বাড়িতে। তখন থেকে তিনি খুলনা শহরের স্থায়ী বাসিন্দা এবং মুসলিম লীগ কর্মী।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্নে খুলনা ও মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে জট বাঁধে। এ দুজেলার ভাগ্য ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষণার সময় জানা যায় নি। খুলনার রাজনৈতিক নেতাদের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। আবু মহম্মদ ফেরদাউস রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নেতাদের

মতোই উদ্বিগ্ন। তিন দিন পর অর্থাৎ ১৪ আগস্টের পরিবর্তে ১৭ আগস্ট খুলনাকে পাকিস্তানের অংশ এবং মুর্শিদাবাদকে হিন্দুস্থানের অংশ ঘোষণা করা হয়। গান্ধি পার্কে (বর্তমান হাদিস পার্ক) আগে থেকেই হিন্দুস্থানের পতাকা উড়ছিল। মুসলিম লীগের বিজয় মিছিল পার্কে এসে মিলিত হয় এবং হিন্দুস্থানের পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা তুলবার প্রস্তুতি নেয়। এমন সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এসে অনুরোধ করেন পতাকা আমরা নামিয়ে নিচ্ছি। আসুন সবাই মিলে আমরা পাকিস্তানের পতাকা তুলি। এভাবেই সেদিন পতাকা তুলবার বিষয়টি সমাধান হয়েছিল (নিবন্ধকার প্রত্যক্ষদর্শী)। খুলনায় পাকিস্তানের শুরুটা হিন্দু-মুসলমান মিলেই হয়েছিল। কিন্তু পরে দৃশ্যপট পাল্টে যায়। গান্ধি পার্ক রাতারাতি হয়ে যায় জিন্নাহ পার্ক। কংগ্রেস নেতা শৈলেন ঘোষের যশোর রোডের বাড়ি রূপান্তরিত হয়ে যায় সবুর লজ-এ। সবুর খানের আগ্রাসী তৎপরতা বাড়তে থাকে। উদার মতাদর্শের আবু মহম্মদ ফেরদাউসের এসব কর্মকাণ্ড ভাল লাগে না। চরমপন্থি সবুর সাহেবের পক্ষ ত্যাগ করে তিনি চলে আসেন অপেক্ষাকৃত উদারপন্থি এ এফ এম আব্দুল জলীল ও দেলদার আহমদের পক্ষে। সবুর সাহেব ক্ষুব্ধ হন। গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত করেন আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে। পাকিস্তানের প্রতি ফেরদাউসের মোহ কাটতে থাকে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তাঁকে আর আকর্ষণ করে না। বাঙালির জাতীয় চেতনা আবহমানকাল থেকে অসাম্প্রদায়িক। পাকিস্তানের জাতীয় চেতনার সাথে বিরাট গরমিল। পাকিস্তানের রাজনীতি যে বাঙালিদের জন্য শুভ হয়নি এ সত্য বুঝতে বেশি দেরি করতে হয়নি মহম্মদ ফেরদাউসের মতো মানুষদের। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মহম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম এবং শেষবারের মতো এসে ঘোষণা দেন, উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এক তরুণ ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন না, না, না। সেই সময় থেকে ছাত্রদের ভাষা আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। আবু মহম্মদ ফেরদাউস মফস্বলে অবস্থান করেও ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের প্রতি গুলিবর্ষণের পর আবু মহম্মদ ফেরদাউস পুরোপুরি পাকিস্তান মোহমুক্ত হন এবং বাম রাজনীতির দিকে ঝুঁকতে থাকেন। ১৯৫৩ সালে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে গণতন্ত্রী দলে যোগ দেন। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উজ্জীবিত এ দল। এই দল ১৯৫৭ সালে মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর সাথে এক হয়ে গেলে আবু মহম্মদ ফেরদাউস ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত হন। ন্যাপ বিভক্ত হলে আবু মহম্মদ ফেরদাউস মোজাফফর ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর রাজনীতির শেষ ঠিকানা।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নেন। মোজাফ্ফর ন্যাপ দলীয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করে এবং কর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের অগাধ আস্থা ও সমর্থন ছিল বঙ্গবন্ধুর ওপর। স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি আবু মহম্মদ ফেরদাউস শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিনিময়ে আবু মহম্মদ ফেরদাউসের কোনো প্রত্যাশা ছিল না। রাষ্ট্রীয় চার নীতির ওপর আবু মহম্মদ ফেরদাউসের ছিল অটল আস্থা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ওপর ছিল তাঁর অবিচল প্রত্যয়। অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছিল তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত।

আজীবন খুলনায় অবস্থান করেছেন। রাজনীতির শিখরে উঠবার জন্য ঢাকায় অবস্থান

করেন নি। তাঁর রাজনীতি খুলনার উন্নয়নকেন্দ্রিক। খুলনাই তাঁর ধ্যানধারণা। খুলনার প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি উপলব্ধি করেন খুলনার উন্নয়নের জন্য একটি সর্বদলীয় ফোরামের প্রয়োজন। ১৯৮৯ সালে তিনি সকল দলের সকল মতের মানুষদের নিয়ে গঠন করেন 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। তিনি আহ্বায়ক এবং পরবর্তীতে সভাপতি। আমৃত্যু তিনি এই পদটি অলংকৃত করে ছিলেন। সংগ্রাম কমিটিতে নেতৃত্বদানকালে তাঁর সাংগঠনিক বিচক্ষণতার বিকাশ ঘটে। বাঙালি জাতির দুর্নাম আছে এক হয়ে কাজ করতে পারে না। আবু মহম্মদ ফেরদাউস খুলনায় অন্তত সেই দুর্নাম ঘুচিয়েছেন। সকল দল সকল মতের মানুষ খুলনার উন্নয়নে এক কাতারে দাঁড়িয়েছিল আবু মহম্মদ ফেরদাউসের নেতৃত্বে।

উন্নয়ন কমিটি গঠনের আগে এবং পরে আবু মহম্মদ ফেরদাউস খুলনার বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যার পর রাষ্ট্রায়ত্ত মিলকারখানাগুলি পরবর্তী সরকার পানির দরে বিক্রি আরম্ভ করে। অকুতোভয় আবু মহম্মদ ফেরদাউস প্রতিবাদ করেন। সরকারের অদূরদর্শী পদক্ষেপের ফলে শিল্পনগরী খালিশপুর রূপান্তরিত হয় প্রেতপুরীতে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে থাকে। আবু মহম্মদ ফেরদাউস তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। প্রতিবাদ করেন, আশার বাণী শোনান। কিছুই করতে পারেননি। হতাশায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী যখন বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন আবু মহম্মদ ফেরদাউসের নেতৃত্বে বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি প্রতিবাদ করে এবং শ্রমিকদের পুনর্বাসনের দাবি জানায়।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সংগ্রামে তিনি অংশ নেন এবং বক্তৃতা বিবৃতি দেন। রূপসা ব্রিজের জন্য তিনি লড়াই করেছেন। সুন্দরবন বাঁচাও আন্দোলনে সংগ্রাম কমিটি সক্রিয় অংশ নিয়েছে। যেখানে খুলনার স্বার্থ সেখানেই আবু মহম্মদ ফেরদাউসের উপস্থিতি। খুলনার জন্য তাঁর সর্বশেষ বড় আন্দোলন ছিল আকরাম পয়েন্টের গভীর সমুদ্রে নৌ-বন্দর স্থাপন। আন্দোলন শুরু করে গিয়েছেন। পূর্ণাঙ্গ সাফল্য দেখে যেতে পারেননি।

বয়সের ভারে তিনি যখন ন্যুজ তখনও সংগ্রামে অটল ছিলেন। খুলনার জন্য সংগ্রাম ছিল তাঁর প্রাণের সংগ্রাম। আজীবনের সংগ্রাম। তাঁর অসুস্থতার কারণে একবার কথা উঠেছিল ওই পদে আর কাউকে দেয়া যায় কিনা। সকলে একমত হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস আমৃত্যু ওই পদে বহাল থাকবেন। আবু মহম্মদ ফেরদাউস ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করবার পর ওই পদটি শূন্য আছে, কারণ তাঁর প্রতিস্থাপক খুঁজে পাওয়া যায় নি। আবু মহম্মদ ফেরদাউসদের মতো নির্মোহ নির্লোভ অসাম্প্রদায়িক মানুষদের সহজে খুঁজে পাওয়ার নয়। তাঁরা একবারই আসেন এই ধরাধামে। তাঁর স্থান পূরণ হবার নয়। ফেরদাউস ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। খুলনার মানুষদের বুকে তাঁর অবস্থান চিরস্থায়ী হোক।

ওয়াহিদুর রহমান : শিক্ষাবিদ

হারুনুর রশীদ

আবু মহম্মদ ফেরদাউসের কিছু কথা

মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউস আমার মায়ের মামাবাড়ির সম্পর্কে আমার মামা হলেও তাঁকে তাঁর ভাই-বোনদের মতো 'দাদা' বলে ডাকতাম। তাঁর ভাই বজলার রহমান আমার সহপাঠী ছিল, তাঁর আরেক ভাই আমার ছোট ভাইয়ের সহপাঠী ছিল। তাঁর ছাত্র রাজনীতিকালে আমরা স্কুলের ছাত্র ছিলাম। আমরা যখন কলেজে গেছি ১৯৪৯ সালে, তখন তাঁকে কলেজের ছাত্ররাজনীতিতে দেখিনি, তবে শুনেছি এক সময় তিনি খান এ সবুরের সঙ্গে রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁকে দেখেছি সবুর খানের বিরোধী শিবিরে। ফেরদাউস সাহেব পরবর্তীকালে বামপন্থি রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী হন এবং এক পর্যায়ে রাজনীতিতে অসৎ কর্মী-নেতার আধিক্য দেখে একপ্রকার রাজনীতিমুক্ত জীবন যাপন করতে থাকেন। বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে গোড়া থেকেই জড়িত ছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে খুলনার যুব সম্প্রদায়কে দলমতনির্বিশেষে এক পতাকা তলে সমবেত করে খুলনার উন্নয়নের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। এটা তাঁর একটি বিরাট সাফল্য। যেকোনো আন্দোলনের নেতৃত্ব দানে পদ, লোভ, স্বার্থ ইত্যাদি থেকে উর্ধ্বে থাকা দরকার এটা তাঁর অনুসারীরা মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম করেছে।

খুলনার পুরোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে একদিন তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে জানতে চেয়েছিলাম—ভারত বিভাগের পর তিনি কেমন করে বামপন্থি রাজনীতিতে গেলেন এবং কী কারণে তিনি খান এ সবুরের রাজনীতি থেকে সরে এলেন। তিনি খুলনার প্রয়াত মুসলমান নেতাদের অনেকের প্রতি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের মতাদর্শের কথা বললেও কারো কুৎসা করেননি। তিনি জানান যে, পাকিস্তান হওয়ার আগের রাজনীতি একরকম ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর স্বাধীন দেশে রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সাথে সাথে তাদের মতামত সহিষ্ণুতার সঙ্গে জানা এবং তার মূল্যায়ন করা দরকার। পাকিস্তান অর্জনের পরও মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সামন্তবাদী প্রভাবই প্রথম তাঁর মতাদর্শে দ্বিধার সৃষ্টি করে। তিনি বলেছিলেন, ১৯৫৬ সালে গণতন্ত্রী দলের জনসভার জন্য ভালো মাইক জোগাড় করতে না পেরে তিনি খান এ সবুরের বাসায় ১৯৪৭ সালের পর প্রথম গিয়েছিলেন ভালো মাইকের জন্য।

মরহুম খান এ সবুর সেদিন তাঁর ভালো মাইকটি দিয়েছিলেন। তবে মাইক টেস্ট করার সুযোগে ফেরদাউস সাহেবকে বলেছিলেন, মাত্র সাত শত মাইল সামুদ্রিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড একত্রে থাকতে পারেনি। সেখানে পাকিস্তানের দুই অংশের ভিতর একটি বৈরী দেশ প্রায় ১৩০০ মাইল বিস্তৃত, সুতরাং পাকিস্তানের দুই অংশও একদিন পৃথক হয়ে যাবে। খান এ সবুর এমন সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করার পরও

আইয়ুব মুসলিম লীগে তাঁর এত সম্পৃক্ত থাকার কারণ বর্ণনায় তিনি জানালেন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। ১৯৬২ সালে আয়ুবীয় মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে তিনি রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হলেন, জাতীয় পরিষদের নেতা ও যোগাযোগ মন্ত্রী হলেন। সুতরাং আইয়ুব মুসলিম লীগের প্রতি তাঁর অনুরাগই অন্যান্য প্রগতিবাদী শক্তির প্রতি তাঁর বিরাগের কারণ, এটাই স্বাভাবিক, এসব কথা ফেরদাউস সাহেব বললেও খান এ সবুর ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো কুৎসা বা অসম্মানজনক মন্তব্য করেননি। অত্যন্ত সংযতভাবে ব্যক্তিগত জীবনে খান এ সবুরের অসাম্প্রদায়িক কার্যকলাপের প্রশংসা করেছিলেন। সম্পূর্ণ বিরোধী মতবাদের একজন নেতা সম্পর্কে ফেরদাউস সাহেবের মন্তব্যে তাঁর আসল গণতান্ত্রিক চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

মরহুম ফেরদাউস হয়তো রাজনীতিতে তেমন ব্যক্তিগত সাফল্য দেখাতে পারেননি, তবে তাঁর মতো গণতন্ত্রমনা মানুষ রাজনৈতিক অঙ্গনে আরও কিছু থাকলে হয়তো রাজনীতিতে পচন ধরত না, একটি সুবাতাস এ দেশের রাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে পারত। খুলনাবাসী মরহুম ফেরদাউস সাহেবকে বহুকাল স্মরণ করবে শ্রদ্ধার সাথে। খুলনাবাসীর শ্রদ্ধার ফলে তিনি রাজনীতির আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থাকবেন–এটাই সকলের কামনা।

আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর আদর্শ মশালের মতো আলোক বিতরণ করুক–এই কামনা করি।

হারুনুর রশীদ : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সরকারি বি এল কলেজ, খুলনা

সমীর আহমেদ

আবু মহম্মদ ফেরদাউস : অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব আবু মহম্মদ ফেরদাউস আজীবন খুলনার একজন কৃতী সন্তান হিসেবে পরিচিত থেকে এই সেদিন তাঁর সকল কর্মময় জীবনের এক নজিরবিহীন ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস উপহার দিয়ে চিরদিনের মতো লোকান্তরে চলে গেলেন। তাঁর এই শূন্যতায় অর্থাৎ মৃত্যুশোকে বিহ্বল খুলনার আকাশ-বাতাস যেমন স্থবির-স্তব্ধ হয়ে পড়ল ঠিক তেমনি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় জাগ্রত রইল তাঁর অনুসারীরা।

'কৃতী সন্তান' এই বিশেষ বিশেষণে আখ্যায়িত হওয়া বা উপাধি লাভের সৌভাগ্য সকলে অর্জন করে না। একজনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, ন্যায়নীতি ও আদর্শের মাপকাঠিতে তাঁর শীর্ষ অবস্থানই তাঁকে সে মর্যাদার আসনে বসিয়ে দেয়।

আবু মহম্মদ ফেরদাউসের আপন নীতি ও আদর্শ তাঁকেও তাঁর জীবনের শুরু থেকেই একজন বিপ্লবী সৈনিকরূপে সমাজ, জাতি ও গোটা দেশের কল্যাণে ব্রতী হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যা তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শেষ অবধি ধরে রাখতে ও পালন করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। উপরন্তু তাঁর অতি সাদামাটা অমায়িক জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত এক বিরল ঘটনা।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তুলনা না হলেও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের বিশেষ করে আপন ভাই-বোন সকলের মধ্যেও তাঁর সেই সুন্দর স্বভাবসুলভ আচরণ ও মার্জিত রুচিবোধ এবং সরল মন-মানসিকতার প্রতিফলন দেখা যায় এবং যাদের তাঁরই প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়।

বিপ্লবী চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক এবং বিজয় প্রত্যাশী সেই সেনানী, অসাধারণ মানুষ আবু মহম্মদ ফেরদাউস। যিনি কেবল সেদিন জীবন সংগ্রামের এক পর্যায়ে রণাঙ্গনের পরবর্তী কার্যক্রম সহযোদ্ধাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজে অবসর নিলেন, সেই মহানায়কের স্মৃতিকে অমর ও ভবিষ্যৎ কাজ-কর্মে প্রেরণার যোগানদাতা করে 'আবু মহম্মদ ফেরদাউস স্মারকগ্রন্থ' প্রকাশনার আয়োজন–যা তাঁর প্রতি সামান্যতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নমুনা মাত্র।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস ১৯২৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবন একাধিক ও বিভিন্ন গ্রাম গঞ্জ ও জেলা শহরে কেটেছে। যদিও তাঁর পৈত্রিক ভিটে-বাড়ি ছিল খুলনা জেলার ফুলতলা থানার আটরা গ্রামে।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় মুসলিম লীগে যোগদান করে এবং পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নিয়ে।

মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির আন্দোলন বা স্বপ্ন ১৯৪৭ সালে বাস্তবায়িত

হলে এবং ভারত বিভক্তির কারণে ওই সময় বিপুলসংখ্যক মুসলমান শরণার্থীর এ দেশে আগমন শুরু হলে তাদের গ্রহণ, তদারকি ও পুনর্বাসনমূলক সকল সেবাধর্মী কার্যকলাপ তাঁকে প্রশংসিত করেছিল। দুস্থ মানবতার সেবায় সম্পৃক্ত হওয়া সত্যিই প্রশংসার দাবীদার যা আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে স্মরণ করায়।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস গোড়া থেকেই শোষণ ও বঞ্চনাকে ঘৃণা করতেন আর তাই বাম রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা তাঁকে একসময় মুসলিম লীগ ত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁকে সেই আদর্শে অবিচল রাখে।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস ব্রিটিশ শাসিত অবিভক্ত ভারতের নাগরিক থাকাকালে তাঁর তখনকার সঠিক উপলব্ধি বা সিদ্ধান্ত যা ওই সময়ের বিবেচনায় মুসলিম স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজন ছিল তা তিনি অকপটে গ্রহণ করে নিতে কোনো সময়ই দ্বিধা করেননি। দ্বিজাতিতত্ত্বের ফরমুলা তখন তাঁর গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়েছিল। এর পিছনে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসূত যুক্তিও দিয়েছেন। তাঁর ভাষ্যমতে ১৯৪১-৪২ সালের ঘটনা অর্থাৎ তিনি যখন দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে অধ্যয়নরত ছিলেন সেই সময় সেখানকার হিন্দু একাডেমি পরিচালনা পর্ষদ গভীর সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং মুসলমান ও অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রসমাজের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও বৈষম্যমূলক আচরণ করত যা স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে কেবল পীড়িতই নয় প্রতিবাদমুখরও করত। তিনি তার বিরোধিতা করতেন এবং এরূপ প্রত্যক্ষ অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহই তাঁকে তৎকালীন মুসলিম লীগ বা পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিতে তাড়িত করেছিল। যদিও তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতা এই শব্দ বা সংজ্ঞা কেবল ধর্মক্ষেত্রেই বিভাজন বা হিন্দু-মুসলমান পার্থক্য নির্ণয় করে তা নয়। 'সাম্প্রদায়িকতা' এই বিশেষণ গোত্র-বর্ণ ও পেশাগত উঁচু-নিচু সকল ভেদাভেদ শনাক্ত করে দূষিত পরিবেশ সৃষ্টি করে যা পরিত্যাজ্য।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে মানুষে মানুষে দেনাপাওনার সমান অধিকারের ভিত্তিতে বন্টনকে গুরুত্ব দিয়ে এবং তা আদায়ের সংগ্রামে আবু মহম্মদ ফেরদাউস সর্বদা সোচ্চার থাকার পক্ষপাতী ছিলেন।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস অধিককাল মুসলিম লীগভুক্ত থাকেননি। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে এ দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত হতে শুরু করে এবং তখন থেকেই বিভিন্ন মতবাদের দল সৃষ্টি ও আত্মপ্রকাশের কাতারে অপেক্ষারত থাকে। আবু মহম্মদ ফেরদাউসও এই শ্রেণীভুক্ত হন এবং দল গঠনের পর সেখানে যোগ দেন।

১৯৪৬ সালের পর ১৯৫০ সালে একবার এবং ১৯৬৪ সালে আরও একবার দুটি বিভক্ত রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশে পুনরায় ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলিম জাতিগত দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষতিগ্রস্তদের সমবেদনা জানাতে ও সাহায্য-সহযোগিতা দিতে আবু মহম্মদ ফেরদাউস সব সময়ই তাদের পাশে ছিলেন।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস যখন যে রাজনীতিই করুন না কেন, তিনি রাজনীতিতে উচ্চাভিলাষী ছিলেন না এবং এমপি বা মন্ত্রী হবার বাসনাও তাঁর ছিল না। এ ছাড়াও স্বৈরাচারী

যেকোনো ব্যক্তি বা দলকে তিনি কখনই বন্ধু বলে স্বীকার করেননি। বরং বিরোধী মঞ্চের পৃষ্ঠপোষকতায় কোনো কার্পণ্যও করেননি এবং এ সকল মত ও পথের সৎ রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর সঙ্গেই তিনি সুন্দর সখ্য বজায় রেখে চলতেন।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন বলা যেমন অত্যুক্তি হবে না তেমনি তাঁর অবদানকে খাটো করে দেখাও তাঁর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন হবে। তিনি খুলনার ভাষাসৈনিকদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ ও শ্রদ্ধাভাজন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বাংলাভাষা মাতৃভাষার আন্দোলনকে বেগবান ও তেজস্বী রাখতে তিনি কেবল মিটিং-মিছিল ও সভা-সেমিনারেই সীমিত রাখেননি, রীতিমতো কাগজ-কলম ও কালি নিয়েও বেরিয়ে পড়েছিলেন মাঠ-ময়দান সরগরম রাখতে। সাপ্তাহিক 'জনতা' নিপীড়িত, অধিকারবঞ্চিত মানুষের আওয়াজ তুলে ধরেছিল তারই দুহাত বেয়ে তাঁদেরই নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ইস্টার্ন প্রেস, কালীবাড়ী রোড, উল্লাসিনী সিনেমার নিচতলা (যা পরে কে ভি চক্রবর্তী রোড, থানা মোড় বর্তমান স্যার ইকবাল রোড) খুলনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। যদিও তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, ওই সময় তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

অকুতোভয় আবু মহম্মদ ফেরদাউস সেদিক থেকে যথেষ্ট সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন। বলতে কোনো সঙ্কোচ নেই যে, তাঁর সাহসেই সাহসী হয়ে বাংলা ভাষা ও অন্যান্য দাবি আদায়ের শপথে আমিও আমার সাহিত্য পত্রিকা মাসিক 'সবুজপত্র' একযোগে প্রকাশ করি।

যাহোক ওই দুটি পত্রিকা বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি। তৎকালীন রাজনৈতিক শাসক গোষ্ঠীর রোষানল ওদের গ্রাস করে ফেলে। সম্পাদক-প্রকাশকদের নিজেকে প্রশাসনিক ধরপাকড়ের তৎপরতা থেকে বাঁচাতে গা ঢাকা দিয়ে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় বাংলাভাষা ও অন্যান্য যৌক্তিক দাবিসমূহ আদায়ের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। যদিও বিরোধী শিবিরের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নানান অপকৌশলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে দোষী বানানোর অপচেষ্টা এবং শাস্তিস্বরূপ নির্যাতন ও জেল-জুলুমের ভীতিসহ আতঙ্ক প্রদর্শন চলতে থাকে।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে বপনকৃত সেই এক-একটি বীজ ক্রমান্বয়ে পরে চারা এবং শেষে বিরাট মহীরুহে রূপ নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে মাথা উঁচু করে স্বাধীনতার নিশ্বাস নিতে শুরু করে এবং ১৯৭১ সালে ফুলে-ফলে বিকশিত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়।

পূর্বেই বলেছি যে, আবু মহম্মদ ফেরদাউস সকল সঙ্কীর্ণ মনমানসিকতার ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং একমাত্র শোষণের বিরোধিতা ছাড়া অত্যন্ত পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার অবতারণা আবশ্যক। যদিও সঠিক সাল-তারিখ মনে নেই, সম্ভবতঃ ১৯৫৩-৫৪ হতে পারে। ঘটনাটি হলো–খুলনার একজন শীর্ষ ও প্রবীণ ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীদেবেন দাশ তখনকার শাসক দলের গুণ্ডাবাহিনীর হাতে নির্মম ও মারাত্মকভাবে আহত হন। যাঁকে আবু মহম্মদ ফেরদাউস, আমি ও আরও অনেকে খুলনা সদর হাসপাতালে ভর্তি করি এবং তাঁর চিকিৎসার সকল সুব্যবস্থা নিই। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রচার মাধ্যমের জন্য ওই আহত নেতার রক্তাক্ত শরীরের বেশ কয়েকটি আলোকচিত্র ধারণ

করি। কিন্তু, ওই ছবিগুলো যাতে সংবাদপত্রে ছাপার জন্য হস্তান্তরিত না হয় সেজন্য ওই গুণ্ডাবাহিনী আমার বি দে রোড, বর্তমান সামসুর রহমান রোডস্থ বসতবাড়িতে আমাকে অপহরণ ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে ঘেরাও করে রাখে। যেহেতু তখনকার দিনে সংবাদ আদান-প্রদানের কোনো ত্বরিত ব্যবস্থা ছিল না তাই দিনভর আমাকে বন্দি অবস্থায় আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়। পরে লোক মারফত সংবাদ পেয়ে ফেরদাউস ভাই আমাকে উদ্ধার ও আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দলবলসহ ছুটে আসেন। গুণ্ডাবাহিনী পালিয়ে যায় এবং আমি সেদিনের মত জীবনে রক্ষা পাই।

তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও তাদের গুণ্ডাবাহিনীকে প্রতিরোধ করার যে দুঃসাহস প্রয়োজন তা আবু মহম্মদ ফেরদাউসের ছিল এবং তাঁর সাহসেই খুলনার অনেক নেতা-কর্মীও তখন তাদের সাহসী ভূমিকার পরিচয় দিতেন।

পঞ্চাশ দশকের শুরুতে মুসলিম লীগবিরোধী কোনো রাজনৈতিক দল না থাকায় তখন কারো কোনো নির্দিষ্ট কার্যালয় বা বসার জায়গা ছিল না। অবসরে বা আলাপ-আলোচনার জন্য সবাই মিলিত হতো 'তৃপ্তিনিলয়' নামক রেস্তোরায় এবং পরে 'ডেরা' হোটেলে যার মালিক ছিলেন সৈয়দ ওয়াসেফ আলি। তিনিও ছিলেন বিরোধী রাজনীতির একজন সক্রিয় অনুরাগী ও কৃতকর্মা। আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর সঙ্গে প্রতিদিন এখানেই সবার সাক্ষাৎ ও রাজনৈতিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হতো। মতপার্থক্য হলেও কখনো তিনি কারো প্রতি বিরাগভাজন হতেন না। এটাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য ও মহানুভবতা।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত হতে থাকলে এক পর্যায়ে দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আবু মহম্মদ ফেরদাউস ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপে যোগদান করেন এবং আমি আওয়ামী মুসলিম লীগ যা পরবর্তী সময়ে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' নামে পরিচিতি নেয় সেই দলভুক্ত হই। আবু মহম্মদ ফেরদাউসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তাঁর শেষ সময় পর্যন্ত খুবই মধুর ছিল যা ভুলে যাওয়ার নয়।

রাজনীতির পাশাপাশি আবু মহম্মদ ফেরদাউস একজন বিচক্ষণ ব্যবসায়ীও ছিলেন এবং এখানেও তাঁর সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। আমরা অনেকেই তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পূর্ব পাকিস্তানিদের স্বার্থ আদায় যেমন ব্যবসায়ে সমান প্রবেশাধিকার সুনিশ্চিত করতে সফল হয়েছিলাম।

খুলনার সার্বিক উন্নয়নে আবু মহম্মদ ফেরদাউসের অবদান এবং অসাধারণ কীর্তি 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁর জীবনের বিরাট অর্জন যা তাঁকে অমর করে রাখবে—মরেও তাঁর মৃত্যু নেই।

সমীর আহমেদ : কবি ও ভাষাসৈনিক

শেখ তৈয়েবুর রহমান

আবু মহম্মদ ফেরদাউস : একজন সংগ্রামী জননেতা

ফেরদাউস ভাই ছিলেন আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন। খুলনার সমস্যা-সংকট, খুলনাবাসীর চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রায়ই আমরা আন্তরিকভাবে আলোচনা করতাম। রাজনৈতিকভাবেও একসময় আমরা অভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী ছিলাম। তাই সঙ্গত কারণেই তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল অন্তরঙ্গ ও প্রগাঢ়। সেদিক থেকে বলতে পারি আবু মহম্মদ ফেরদাউস ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক, সৎ রাজনীতিক, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতপ্রাণ, ন্যায্য দাবি আদায়ের প্রশ্নে সংগ্রামী। সৎ ও সাহসী বটে। বঞ্চিত খুলনাবাসীর ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। সব সময় থাকতেন আন্দোলনের পুরোভাগে। তাই সংগ্রামী জননেতা হিসেবে তিনি সকলের নিকট সম্যকভাবে পরিচিত।

আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটা বিষয় আজ স্পষ্ট যে, প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনীতিকরা দলমতের উর্ধ্বে উঠতে পারছেন না। দলীয় চিন্তা-চেতনা, দলীয় মতাদর্শে তাঁরা এমনভাবে শৃঙ্খলিত যে, জনকল্যাণকর অনেক বিষয়ই তাঁদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। ফেরদাউস ভাই ছিলেন তার ব্যতিক্রম। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রত্যাশাকে তিনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করতেন না। তাই সকল দলমতের মানুষকে নিয়ে 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গঠন করা তাঁর নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছিল। অন্ত ত এই প্লাটফর্মে তিনি সকল রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের শামিল করতে পেরেছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে ফেরদাউস ভাইয়ের সাথে আমার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সাথে আমি যোগাযোগ রাখতাম। তাঁর মতো একজন সদালাপী ও পরোপকারী মানুষের সংস্পর্শে থাকা যেকোনো ব্যক্তির জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। আমার বিবাহসহ পারিবারিক সকল বিষয়ে ফেরদাউস ভাই বড় ভাইয়ের মতো আমাকে সর্বদা পরামর্শ দিয়ে যে সহযোগিতা করেছিলেন তা এখনো আমার মানসপটে মধুর স্মৃতি হয়ে আছে।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ফেরদাউস ভাই ছিলেন নির্লোভ ব্যক্তি। ক্ষমতার মোহ তাঁর কখনো ছিল না। নীতি-আদর্শের প্রতিও তিনি ছিলেন অটল। তাই অসৎ রাজনীতিকদের মতো তিনি কখনো হালুয়া-রুটির জন্য নীতিহীনভাবে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেননি। মজলুম মানুষের পক্ষে ছিলেন সবসময়। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। অশুভ শক্তির সাথে আপোস করেননি। বরং সাধ্যমতো বিরোধিতা করেছেন। প্রয়োজনে সংগ্রাম করতেও পিছপা হননি। আজকের দিনে এ ধরনের সৎ, নির্লোভ, ত্যাগী দেশপ্রেমিক রাজনীতিকের বড় অভাব। ব্যক্তিস্বার্থের জন্য জনস্বার্থকে কখনো দূরে সরিয়ে দেননি।

মানুষের কল্যাণে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে নিবেদিত রেখেছেন। শারীরিক অক্ষমতা ও বার্ধক্য তাঁর মনোবল ভেঙে দিতে পারেনি। তিনি বিশ্বাস করতেন সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমেই বঞ্চিত মানুষের দাবি আদায় সম্ভব। তাই মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রায়শ নামতেন রাজপথে। তাঁকে দেখা যেত মিছিলের সামনের কাতারে।

৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আমৃত্যু খুলনাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি গণআন্দোলনে ফেরদাউস ভাইয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। খুলনাঞ্চলের মানুষের বঞ্চনা ঘুচাতে হবে, শিল্প ও বন্দর নগরী খুলনাকে সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত করতে হবে, এ বাসনা নিয়েই তিনি জনমত গঠন করেছেন। খুলনাবাসীকে আন্দোলনে শামিল করেছেন। আমি মনে করি উন্নয়নের দাবিতে তাঁর প্রয়াস নিঃসন্দেহে একটি মহতী উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগী মানুষ আজকের দিনে বিরল। স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে যায়নি তাঁর প্রচেষ্টা। লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে থেকে তিনি কাজ করেছেন। তবে তাঁর এই চলার পথ মসৃণ ছিল না। এ পথ ছিল বন্ধুর, কণ্টকাকীর্ণ।

খুলনাঞ্চলের মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে ওই বন্ধুর পথ থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হননি। পিছপা হননি অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে। ফেরদাউস ভাইয়ের এই সূচিত পথ বেয়ে নিশ্চয়ই খুলনার বিভিন্ন দাবি পর্যায়ক্রমে সফলতার মুখ দেখবে। কেননা কোনো আন্দোলনই বৃথা যায় না। তাঁর কর্মোদ্দীপনা আগামী দিনগুলোতে আমাদের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। খুলনার উন্নয়ন প্রশ্নে তাঁর আপোসহীন মনোভাব প্রতিটি ন্যায়ের সংগ্রামে আমাদের প্রেরণা যোগাবে। তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। তাই খুলনার উন্নয়নে অনাগত আন্দোলনের মাঝেই তিনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন। খুলনাবাসী তাঁকে কোনোদিন ভুলবে না। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

শেখ তৈয়েবুর রহমান : সাবেক মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন

মোঃ বজলুল করিম

আবু মহম্মদ ফেরদাউস : একজন খাঁটি মানুষের কথা

সরকারি বি এল কলেজে প্রায় সাড়ে তিন দশক কাল শিক্ষকতার সুবাদে বিভিন্ন মহলে সুধী ব্যক্তিবর্গের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ হয়। আমার মনে হয়েছে অধিকাংশ মানুষের মনের জগৎটি বেশি গণ্ডিবদ্ধ, আমিত্বের বাইরে খুব প্রসারিত নয়। এর মানে এই নয় যে ব্যতিক্রম নেই। এই ব্যতিক্রমীদের একজন হলেন খুলনার বিপ্লবী রাজনীতিবিদ, ভাষাসৈনিক আবু মহম্মদ ফেরদাউস। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনাবোধ তাঁর সকল কর্মে বিজড়িত ছিল। আবার উন্নয়ন কর্মে শশব্যস্ত ও অনুরাগী হয়ে উঠতেন।

আদর্শময় জীবনের উৎস পিতার আদর্শময় জীবনের ধারা

খুলনার রাজনৈতিক অঙ্গনে এক উজ্জ্বল মধ্যমণি আবু মহম্মদ ফেরদাউস। খুলনা উন্নয়নে বিভিন্নমুখী চিন্তা ও তা বাস্তবায়নের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। তাঁর পৈতৃক নিবাস খুলনা জেলার ফুলতলার আটরা গ্রামে। এর কাছেই গড়ে উঠেছে সুসজ্জিত জাহানাবাদ সেনানিবাস। পিতা মোঃ একরাম উদ্দিন বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মুসলিম সমাজে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। ১৯০৯ সালে দৌলতপুর হাজী মুহম্মদ মুহসিন হাই স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং 'হিন্দু একাডেমিতে' (বর্তমান বি এল কলেজ) আইএ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এটি তাঁর জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ হিন্দু একাডেমিতে ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাত্র, মুসলিম ছাত্র এবং কোনো ছাত্রী ভর্তি করা হতো না। এ জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে অনুমোদন দেয়নি। ১৯০৮ সালে এ মতের পরিবর্তন করে; অনুমোদন পাওয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মুসলিম ছাত্র ভর্তি করা হবে। এ পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০৯ সালে দু'জন মুসলিম ছাত্র হিন্দু একাডেমিতে ভর্তির সুযোগ পান। তাদেরই একজন হলেন আবু মহম্মদ ফেরদাউসের পিতা মোঃ একরাম উদ্দিন। তিনি বি এল কলেজের প্রথম মুসলিম ছাত্র। তিনি এক ঐতিহাসিক বিরল ব্যক্তিত্ব। অপরজন ছিলেন নড়াইল জেলার মির্জাপুর নিবাসী সৈয়দ নওশের আলী (পরে ভারতের কংগ্রেসপন্থি খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ)। এ দুজনই কলেজের উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৯১১ সালে মোঃ একরাম উদ্দিন হিন্দু একাডেমি থেকে আইএ পাশ করেন। শিক্ষকতা পেশায় যোগদান এবং L.T. (Licentiate in Teaching) পাশ করেন। কর্মনিষ্ঠার গুণে Subdivisional Inspector of Schools পদে বৃত হন। তাঁর অব্যবহিত উর্ধ্বতন অফিসার ছিলেন একজন ইংরেজ। একরাম উদ্দিনের দায়িত্ববোধ, সততা, কর্মনিষ্ঠা উন্নতমানের ছিল। চাকুরির সুবাদে তাঁকে বরিশাল, দিনাজপুর, ঢাকা এবং খুলনায় থাকতে হয়েছে। তাঁর ৪ পুত্র, ২ কন্যা।

তাঁরা হলেন ক) আবু মহম্মদ ফেরদাউস, খ) এ এফ এম শামসুর রহমান (সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী), গ) ডা. ফাতেমা আখতার চৌধুরী, ঘ) বজলুর রহমান (B. Sc. Engineer) ঙ) রোকেয়া খাতুন, চ) মুজিবর রহমান (গণিতের প্রফেসর, অধ্যক্ষ)। তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সমাজ উন্নয়নে অবদান রেখেছেন।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর জন্ম, শিক্ষা

পিতার কর্মস্থল ছিল ঢাকা। শিশু ফেরদাউসের জন্ম হয় মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার লক্ষীপুর গ্রামে মাতুলালয়ে (১৯২৪ সাল, ১১ ফেব্রুয়ারি)। প্রাথমিক শিক্ষা পিতা-মাতার পরিচালনায় বাড়িতেই শুরু। পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনের সাথে সাথে ছেলের পড়ালেখার স্থানও বদলে যেত। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং পরে বরিশাল জিলা স্কুলে পড়ালেখা করেছেন। বরিশাল জিলা স্কুল থেকে ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪১-৪২ শিক্ষাবর্ষে খুলনার দৌলতপুর হিন্দু একাডেমিতে ভর্তি হন। পড়ালেখার সাথে সাথে দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে চেতনা জেগে ওঠে। তৎকালীন মুসলিম ছাত্রলীগ ও মুসলিম লীগের সাথে জড়িত হন।

হিন্দু একাডেমি চত্বরে অন্যায় দূর করার প্রথম প্রচেষ্টা

বর্তমান বি এল কলেজ চত্বরে মসজিদের সম্মুখে বৃহৎ আকারের পুকুরটি ১৯০৮ সালে খননকৃত। কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে খুলনা জেলার প্রথম মুসলিম ডিএম (ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট) জনাব আহসান আহমেদ অর্থ সংগ্রহ করে ৪৫০০ টাকায় পুকুরটি খননের ব্যবস্থা করেন। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ঘাট বাঁধানো হয়। উত্তর দিকে ঘাটের প্রবেশপথে ২৫´×২৫´ মাপের, উচ্চতায় ৬ ফিট পিলার নির্মাণ করে ডিএম সাহেবের নাম লিখে মূল্যবান পাথরের প্লেট লাগানো হয়। প্লেটে লেখা আছে "Gift of the Zilla Parisad, Khulna, under the Presidency of Ahsan Ahmed, BES, DM, Khulna–1908"। ১৯১৫ সালে এই পিলারের গা ঘেঁসে একটি হাস্নাহেনা ফুলের গাছ লাগানো হয়। পরে ঝোপের সৃষ্টি হলে ডিএম-এর নাম ঢাকা পড়ে যায়। এ অবস্থায় ফেরদাউস সাহেব এবং তাঁর সুহৃদ পাইকগাছা নিবাসী আফিল উদ্দিন আহমদ এক গভীর রাতে হাস্নাহেনা ফুলের গাছ কেটে ফেলেন। ফলে 'আহসান আহমেদ' নাম স্পষ্ট দেখার সুযোগ হয়। ঘটনাটি নেপালি নাইট গার্ডের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। পরের দিন সূর্যোদয়ের পরপরই উপাধ্যক্ষ চারুচন্দ্র বসু ওই দুজন ছাত্রকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা কলেজ চত্বরের বাইরে মুসলিম ছাত্রাবাসে থাকতেন। তাঁরা যথানিয়মে কলেজের অফিসে উপস্থিত হন। বিনীতভাবে উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে বললেন, 'স্যার, ঝোপ সৃষ্টিকারী হাস্নাহেনা গাছ কেটে ফেলেছি যাতে ঐ ফলকটা স্পষ্ট দেখা যায়। আপনি কলেজের পরিচালক এবং গুরুজন। যা ভাল বোঝেন তাই করুন। আমরা বিনা প্রশ্নে মেনে নেব। প্রাজ্ঞ উপাধ্যক্ষ তাদেরকে বিদায় করে দিলেন। অধ্যক্ষ বঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্যও ঘটনা জ্ঞাত হন।

মানুষ হিসেবে বিরাট মাপের মানুষ ছিলেন তিনি। যেখানেই পরিবেশ বিপন্ন হতে দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদমুখর হয়েছেন এবং আন্দোলন শুরু করেছেন। মানুষের

কল্যাণ হয় যে ব্যাপারে তিনি সে বিষয়ে সদাসক্রিয় ছিলেন। মানুষের হিত কামনায় সর্বদা জড়িত ছিলেন। এমন মানুষ আমাদের সমাজে প্রায় দুর্লভ।

কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। এনএসআই-এর রিপোর্ট তাঁর বিপক্ষেই ছিল। ১৯৪৮-৪৯ বর্ষে পুলিশ তাঁকে খোঁজ করে। গ্রেফতারি পরোয়ানা তাঁর মাথার উপর। বুঝতে পেরে তিনি গা-ঢাকা দেন। তেলিগাঁতি কাজীবাড়িতে আশ্রয় নেন। ফেরদাউস সাহেব ওই বাড়ির পাকা ঘরের চিলেকোঠায় গোপনে শুয়ে থাকেন। পুলিশ খুঁজে না পেয়ে চলে যায়। তাঁর অপরাধ তিনি বাম রাজনীতি করেন এবং সরকারের সমালোচনা করেন। সকল ক্ষেত্রে বামপন্থি হয়ে চিন্তা না করলে সত্যের প্রকৃত চেহারা ধরা যায় না।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ

খুলনায় ভাষা আন্দোলন বি এল কলেজ থেকে শুরু। প্রাক্তন ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি এতে যোগদান করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাহমিদ উদ্দিন, এস এম এ জলিল (ক্রীড়াবিদ), মোঃ মুনসুর আলী (পরে বস্ত্রমন্ত্রী), কাজী মাহবুবুর রহমান (এ্যাডভোকেট, নূরনগরে বসবাসরত), দৌলতপুরের কাজী নুরুল ইসলাম (পরে যুগ্মসচিব)। মুসলিম লীগের কিছু লোক ফেরদাউস সাহেবকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে। তিনি আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। সমাজে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করতেন। ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপে যোগদান করেন। অনেক সময় পুলিশি তৎপরতাকে ফাঁকি দিয়ে আন্দোলনকে সফল করার চেষ্টা করতেন। রাজনীতি করে যারা অবৈধ অর্থের পাহাড় গড়েছেন তিনি তাদেরকে দুচোখে দেখতে পারতেন না। খুলনার উন্নয়নে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। জনহিতকর কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িত রাখতে ভালোবাসতেন এবং নবীনদের উদ্বুদ্ধ করতেন।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা

১৯৭১-এর এপ্রিলে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময় ফেরদাউস সাহেব খুলনায় অবস্থান করছিলেন। ইপিআর ও পাক বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। ফেরদাউস তাঁর রচিত প্রবন্ধ 'মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস'-এ লিখেছেন : 'আমার কাছে একজন ইপিআর-এর সদস্য বললেন—আমরা খানসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। কিছু খাবার ও যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে যদি সাহায্য করতেন তবে আমরা এগোতে পারতাম।' ফেরদাউস সাহেব তাদের কিছু খাদ্যদ্রব্য দিলেন ও উৎসাহ প্রদান করলেন। এই সময় হাজীবাড়ির আবুল হোসেন তাঁকে ঘটনাটা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন—ইপিআর-এর লোকজন রাইফেলের গুলি চায়। আবুল হোসেন খুব গোপনে এবং দ্রুততার সঙ্গে প্রায় ২০০ রাউন্ড গুলি কোথা থেকে নিয়ে এসে তাদের দিয়ে দিলেন। এর পরই পাক বাহিনী এসে ওই পাড়ার অনেক বাড়িতে তল্লাশি চালায় ও বাড়িঘরের ক্ষতি সাধন করে। ফেরদাউস সাহেব খুব সঙ্গোপনে বাড়ি ত্যাগ করে বাগেরহাট চলে যান। সেখান থেকে এক পর্যায়ে তিনি কলকাতা চলে যান। সেখানে খুলনার প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড রতন সেনের সঙ্গে দেখা। উভয়ে বি এল কলেজের ছাত্রনেতা এবং জনদরদি। উভয়ে লেনিন স্কুলে স্থান পান সাময়িক থাকার জন্য। টাকিতে প্রশিক্ষণ

ক্যাম্পে গমন করেন। যুবকদের ট্রেনিং ও সাহস যোগাতেন। যুদ্ধের পর বিজয় অর্জিত হলে তাঁরা দেশে ফেরত আসেন। এবার খুলনাকে নতুনভাবে গড়ার জন্য মনোনিবেশ করেন।

খুলনার উন্নয়ন-আন্দোলনে নেতৃত্ব দান

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ও স্বাধীনতা উত্তরকালে খুলনা শহর, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে যত কমিটি গঠিত হয় তার মধ্যে আবু মহম্মদ ফেরদাউস সাহেবের নাম প্রথমেই আসে। তিনি সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বঞ্চিত খুলনার উন্নয়নের জন্য যেসব আন্দোলন হয়েছে তা যারা করেছেন তার মধ্যে ফেরদাউস সাহেব ছিলেন অন্যতম। বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক। রাজনৈতিক জ্ঞান ও চেতনায় পরিপক্ক, সুবিবেচক, নিরপেক্ষ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন।

খুলনার জোড়াগেট থেকে রেলস্টেশন পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষের ২০৩ একর জমি লুটপাট ও জবরদখলের হাত থেকে রক্ষার জন্য ফেরদাউস সাহেবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। রেলওয়ে বিভাগ ও কেডিএ-এর মধ্যে সমন্বয় করে একটি সুন্দর টাউন গড়ে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু একটি স্বার্থপর মহল এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। ১৯৮৯ সালে সিটি কর্পোরেশন বেশি মাত্রায় হোল্ডিং কর বৃদ্ধি করলে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তিনি এর প্রতিবাদ করে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর ধার্য করতে পরামর্শ দেন কর্তৃপক্ষকে। শহরকে পরিচ্ছন্ন করতে তিনি প্রতিবাদী হন। রূপসা সেতু নির্মাণে অবরোধ করেন। শহরে বিনোদন ব্যবস্থার উন্নয়নে, চিড়িয়াখানা নির্মাণে, বোটানিক্যাল গার্ডেন নির্মাণের জন্য প্রেস কনফারেন্স করেন। ১৯৯৪ সালের ১০ জুন খুলনার বিশিষ্ট ২৫ জন নাগরিক সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খুলনার সমস্যাদি তুলে ধরেন। এর ফলে ২০০০ সালে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়। খুলনায় ওয়াসা স্থাপন, মেরিন একাডেমি স্থাপন, কৃষি কলেজ স্থাপনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। প্রবীণ বয়সেও প্রচুর কাজ করে গঠনমূলক কর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস ছিলেন একজন সমাজহিতৈষী ও সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। আর্থিক স্বচ্ছলতার মধ্যে থেকেও বিলাসবহুল জীবন যাপন করেননি। তাঁর চিন্তা-চেতনায় ছিল দেশ ও জাতির সেবা করা। এমন উদার ও বিশাল মনের মানুষ সত্যই বিরল। তাঁর বিদেহী আত্মাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

মোঃ বজলুল করিম : শিক্ষাবিদ ও গবেষক

বীরেন্দ্রনাথ রায়

ফেরদাউস ভাইকে যেমন দেখেছি

পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরা আপন কর্মগুণে মরেও অমর হয়ে থাকেন। আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে, ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সমাজ, দেশ, জাতি এবং মানুষের জন্য এমন কিছু করে যান যা তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁকে স্মরণীয়, বরণীয় করে তোলে। কথাগুলো শ্রদ্ধেয় ফেরদাউস ভাই সম্পর্কে প্রযোজ্য। তিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ড সর্বত্র এমনভাবে ছড়িয়ে আছে যে, প্রতিমুহূর্তেই তাঁকে স্মরণ করতে হয়।

১৯৬৫ সালের শেষের দিকে ফেরদাউস ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। মিষ্টভাষী, সদালাপী, মিশুক এই মানুষটিকে সর্বপ্রথম দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শিক্ষকতার সুবাদে প্রায়শই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হতো। নানা বিষয়ে আলাপ হতো। সেই সব অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার ভিতর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ছাপ পেতাম । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক ছিলেন। সেই পাকিস্তান আমলেও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থেকে সকল মানুষকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমানভাবে ভালোবাসতেন।

থানার মোড়ে মডার্ন বুক ডিপো নামে সেই সময় একটি মস্ত বড় বইয়ের দোকান ও ইস্টার্ন প্রেস নামে একটি প্রেস তাঁদের ছিল। ফেরদাউস ভাই ওই প্রেসে বসতেন এবং দেখাশুনা করতেন। তিনি যখন প্রেসে বসতেন, তখন খুলনার গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেখানে যেতেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। সেই আলোচনার আসরেও ফেরদাউস ভাই ছিলেন মধ্যমণি। মাঝে মাঝে আমি ব্যক্তিগত কাজে প্রেসে গেলে তিনি বসতে বলতেন এবং চা না খাইয়ে আসতে দিতেন না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক হিসেবে ভারতে যান। পশ্চিম বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকা টাকী নামক স্থানে একটি বাড়িতে তিনি থাকতেন। আমিও স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পরিবার-পরিজনসহ ভারতে যাই এবং ওই টাকী শহরে কিছুদিন অবস্থান করি। টাকীতে অবস্থান করার সময় মাঝে মাঝে আমি ফেরদাউস ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা প্রয়াত রতন সেনও ওই বাড়িতে অবস্থান করতেন। সেই সময় এই দুই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ ও পরবর্তীতে কী ঘটতে পারে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে যা আলাপ করতেন পরে তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল। রাজনৈতিক দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান এই মানুষটির কথা আমার বারবার মনে পড়ে।

দেশ স্বাধীন হবার পর দেশে ফিরে এসেও তিনি ছিন্নমূল মানুষগুলোর সর্বক্ষণ খোঁজখবর

নিয়েছেন। অসহায় মানুষদের পাশে গিয়ে সাধ্যমতো তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে এসে প্রায় প্রতিদিনই ফেরদাউস ভাইয়ের সঙ্গে আমি দেখা করতাম এবং যোগাযোগ রক্ষা করে চলতাম। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ন্যাপ (মোজাফ্ফর আহমেদ)-এর নেতা ছিলেন।

বেশভূষায় অতি সাধারণ, নিরহঙ্কার, নির্লোভ নির্মোহ এই মানুষটির মর্মমূলে গ্রথিত ছিল 'Plain living and high thinking'.

১৯৪৭ সালে যখন দেশ বিভাগ হয়, তখন হিন্দুরা এ দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাবার সময় তিনি তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। চলে না যাবার জন্য অনুরোধ করেও ব্যর্থ হয়েও দুষ্কৃতকারীদের হাত থেকে তিনি তাঁদের নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন। এ ধরনের ঘটনা অনেক আছে। মোটের উপর মানুষের উপকারের জন্য এই অসাম্প্রদায়িক মানুষটি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সেই মানুষটি আমাদের মাঝে আজ আর নেই। মৃত্যুকে অস্বীকার করার শক্তি কারও নেই। আমাদেরও নেই। তাই সবশেষে বলি,

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

বীরেন্দ্রনাথ রায় : শিক্ষক ও সংস্কৃতি সংগঠক

অসিতবরণ ঘোষ

এক মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণের স্বরলিপি

['It is death is dead, not he.']

এক

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব কিনা জানি না, কেননা বিপুল এ বিশ্বের কতটুকুইবা আবিষ্কৃত হয়েছে? তবে পৃথিবী নামক আমাদের এই গ্রহে মানুষকেই যে জীবশ্রেষ্ঠের শিরোপা দেওয়া হয়, মনে হয় তার অন্যতম কারণ মানুষ তার নিজের হাতের মাত্র সাড়ে তিন হাতে বাঁধা পড়া সত্ত্বেও হিমালয়সম বাধা অতিক্রম করার স্পর্ধা ও সাহস রাখে, এবং কখনো কখনো বিস্ময়কর সাফল্যও অর্জন করে। আবার ব্যষ্টিমানবের এই সিদ্ধি সমষ্টিকেও উজ্জীবিত করে, তারা যূথবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলে যুগ থেকে যুগান্তরে। অন্ধকার থেকে আলোতে। চলতে চলতে কখনো পিছিয়ে পড়ে, আততায়ী আঁধার অর্জিত সাফল্য ছিনিয়ে নিতে চায়। এভাবে কেটে যায় হয়তোবা সুদীর্ঘ সময়, তারপর সেই অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর সরণি বেয়ে আবার শুরু হয় নতুন পথচলা। এভাবে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে চলার যে শক্তি, তার অপ্রতিরোধ্য প্রয়াসেই নিহিত মানুষের মহত্ত্ব, অর্জিত সাফল্যের পরিমাপে নয়। তুলাদণ্ডে মেপে মেপে সাফল্যের মূল্য ধার্য করা ব্যবসায়ী বুদ্ধির দায়; সংস্কৃতির দায় নিরন্তর নিজেকে উজিয়ে যাওয়ায়, নিজের বিরুদ্ধ পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করার তপস্যায়।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বারবার এই উপলব্ধিগুলোই নির্যাস আকারে ভাবনার উপরিতলে ভেসে উঠছে। কারণ, এই তপস্যার অগ্নিস্নানেই তিনি আমাদের বরণীয়, আর বরণীয় বলেই স্মরণীয়। নইলে, মাত্র পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট রোগাপাতলা ছোট্টখাট্ট এই মানুষটি কী এক দুর্দমনীয় কেন্দ্রাতিগ শক্তির অমোঘ আকর্ষণে ঘরকে পর করে পথের মাঝেই জীবনের পরমার্থের সন্ধান করে গেলেন দীর্ঘ তিরাশি বছরের সিংহভাগ সময়, উৎসর্জন করলেন তাঁর সমগ্র জীবন-যৌবন-ধন-মান! জীবনের শেষ পঞ্চাশটি বছর দুরারোগ্য ডায়াবেটিস ব্যাধিকে সঙ্গী করে অবিশ্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছেন পথে পথে, আঁধারের বৃন্ত থেকে আলোর প্রসূন তুলে এনে একটি অখণ্ড মালা গাঁথার জন্য, অধিকারবঞ্চিত মানুষকে তার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, অন্যায় ও মিথ্যার জাল ছিন্ন করে অপাপবিদ্ধ একটি জীবনে সমষ্টিকে অভিষিক্ত করার জন্য। পথে নেমেই পথ চিনতে চেয়েছেন, কবোষ্ণ ড্রইং রুমে বসে ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে নয়। পথ চলতে গিয়েই পথের সত্যকার সাথীদের চিনেছেন। কোনো যুগেই কাজটি সহজ নয়, সে যুগে তা ছিল কঠিনতর। পাথর ছড়ানো পথে বারবার হোচট খেয়েছেন, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, শুধু বাইরের শরীরে নয়, ভিতরের অন্তর্গত অনুভবেও। মাঝে মাঝে ক্লান্ত বোধ করেছেন, দুর্বল মুহূর্তে হতাশ্বাস বেরিয়ে এসেছে; কিন্তু সময় লাগেনি আত্মসংবিৎ ফিরে পেতে, শুরু হয়েছে নতুন করে পথচলা...

দুই

১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪। সেই স্মৃতিজাগানিয়া ফেব্রুয়ারি। লক্ষ আশার আলোয় দীপান্বিতা ফেব্রুয়ারি। ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার গজারিয়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে পৃথিবীর আলোতে সেদিনই প্রথম চোখ মেলেছিলেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস। পৈত্রিক নিবাস খুলনা জেলার ফুলতলা থানার আটরা গ্রামে হলেও মাতুলালয়েই তাঁর জন্ম। লক্ষ্মীপুর গ্রামে জন্মালেও আদর্শ লক্ষ্মীছেলে হয়ে 'বোতাম-আঁটা জামার' ফ্রেমে-বাঁধা জীবন তাঁর বিধিলিপি ছিল না। পিতা একরামউদ্দীন আহমেদ ছিলেন স্কুল পরিদর্শক। মাতা মেহেরুন্নেসা সেকালে ঢাকা ইডেন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন, যেখানে তখন শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরাজি। গ্রামের স্কুলের অন্তরঙ্গ পরিবেশ থেকে হঠাৎ করে ইংরাজি মাধ্যমের সোনার খাঁচায় ডানা ঝাপটানো তাঁর পক্ষে বেশিদিন সম্ভব হয়নি। পিতা স্কুল পরিদর্শকের দায়িত্বপূর্ণ তদারকি চাকুরি করলেও সংসার বিষয়ে তিনি ছিলেন অনেকটাই নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ। কর্তৃত্বপরায়ণতার প্রকাশ তাঁর অন্তর্মুখী স্বভাবের সহজিয়া সৌন্দর্যকে কোনোদিন ক্ষুণ্ন করেনি। সন্তানসহ স্বজনেরা সবাই তাদের আপন স্বভাবধর্ম অনুযায়ী সুন্দরভাবে বিকশিত হোক, সম্ভবত এটিই তাঁর কাম্য ছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় ধ্যানধারণায় তাঁর এই উদারপন্থি নির্বিরোধী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিটি তাঁর সন্তানদের যে প্রভাবিত করেছিল তা খুবই স্পষ্ট। মাতা মেহেরুন্নেসা সে যুগের মুসলিম পরিবারের মহিলা হলেও তাঁর চলাফেরা ও কথাবার্তায় কোনোরকম জড়তা বা দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল না। ঘরের ও বাইরের জীবনের মিথস্ক্রিয়ায় লব্ধ তাঁর সুস্থ ও স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা সে যুগে খুব সহজলভ্য ছিল না। তাই, স্বাভাবিকভাবেই একটি মুক্ত, অবাধ, উদার আবহের আনুকূল্যে এঁদের প্রথম সন্তান আবু মহম্মদ ফেরদাউসসহ অন্য চারটি পুত্র ও দুটি কন্যা বড় হয়ে উঠেছিলেন।

বদলির চাকরি পিতা একরামউদ্দীনের। নির্দিষ্ট কোনো একটি জায়গায় থিতু হয়ে বসার জো ছিল না। তাঁর এই চলমানতা তাঁদের এই প্রথম সন্তানের মগ্নচৈতন্যে কোনো দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব ফেলেছিল কি? পিতা স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটেছিলেন চাকুরির তাগিদে: আর তাঁর এই জ্যেষ্ঠ সন্তানটি একটি নির্দিষ্ট শহরে থেকেও যে প্রায় সারাটা জীবন ছুটলেন ঘরকে বাহির ও বাহিরকে ঘর করে, তা কিসের তাগিদে, কোন্ অন্তর্গূঢ় যন্ত্রণার তাড়নায়? তা কি শুধুই যন্ত্রণা, না যন্ত্রণার সাগরসেঁচা মুক্ত জীবনানন্দের অথবা কোনো অমৃতকুম্ভের স্বপ্ন?

ফেরদাউসের জীবনের প্রথম চোদ্দটি বছর অতিক্রান্ত হয় পিতার তৎকালীন কর্মস্থল ঢাকায়। পুরনো ঢাকার ওয়ারি এলাকার দক্ষিণ মৌসণ্ডি মহল্লায় ১৯৩৭ পর্যন্ত তাঁদের বসবাস। ১৯৩৮-এ পিতা বদলি হলেন বরিশাল। মহাত্মা অশ্বিনী দত্ত, চারণকবি মুকুন্দ দাস, জীবনানন্দ, শের-এ-বাংলার বরিশাল। মনোরমা মাসীমার বরিশাল। ফেরদাউস ভর্তি হলেন বরিশাল জেলা স্কুলে। দু'বছর পরেই ১৯৪০-এর প্রথম দিকে পিতা আবার বদলি হলেন দিনাজপুর। দূরের পাড়ি, অন্তত সেদিনের নিরিখে। ফেরদাউসকে রেখে গেলেন স্কুলের ছাত্রাবাসে, সামনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা। পরের বছর ১৯৪১-এ সেখান থেকেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সোজা খুলনায় এসে ভর্তি হলেন দৌলতপুর বি এল কলেজে আইএস-সি ক্লাসে। এখানেও আশ্রয় নিলেন কলেজ ছাত্রাবাসে।

এক শহরের ছাত্রাবাস থেকে অন্য শহরের, বিভাগীয় শহরের ছাত্রাবাস। আগেই উল্লেখ করেছি, পারিবারিক জীবনে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকলেও ছাত্রাবাসের চারদিকের দরজা-জানালাগুলো তো আরো খোলা। সেই খোলা পথে ধুলোবালিও যেমন ঢোকে অবাধে, তেমনি ঢোকে পরিবর্তনের দখিনা হাওয়া। সেখানে নানা জনের আনাগোনা। নানা জন মানেই তো নানা মন, আর নানা মন মানেই নানা মত। আবার মত থেকেই যেমন মতৈক্য, তেমনি মতানৈক্য। মত থেকে তৈরি হয় মতবাদ, সৃষ্টি হয় বাদানুবাদ, বিতর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ-সংশ্লেষ। এর নামই পৃথিবীজোড়া পাঠশালা। তখন থেকেই ফেরদাউস এই পাঠশালা থেকে গভীর অভিনিবেশে পাঠ গ্রহণ শুরু করেছেন। ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি দিলেই দেখতে পাই অগ্নিগর্ভ '৪০ এর দশক জুড়েই পালাবদলের দুরন্ত হাওয়া হু-হু করে অনেক কিছুই উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। একদিকে যেমন ব্রিটিশ রাজকে ভারত ছাড়ার হুশিয়ারি জারি করে সূচিত হল 'ভারত ছাড়ো' ('Quit India') আন্দোলন, এই দশকের প্রথম ভাগেই, তেমনি আবার এ সময়েই অবিভক্ত বাংলার শাসনভার অর্পিত হল 'শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা'র উপর। এইসব বাস্তবতার পাশাপাশি ততদিনে ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ও তার প্রচার-প্রসারও একটি বড় ঘটনা। ত্রিশের দশকেই (১৯৩৪-এ) খুলনায় মুসলিম লীগের শাখা স্থাপিত হয়েছে। যুগসঞ্চিত পুঞ্জিত অভিমান-অভিযোগের রূঢ় ও বাস্তব প্রেক্ষাপটে সেদিন মুসলিম লীগ আন্দোলনকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার অবকাশ ছিল না। বৃহত্তর খুলনার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নেতৃত্বে মুসলিম লীগের ছায়াতলে সেদিন অনেক সফল আইনজীবী ও নবীন ছাত্রনেতা একত্রিত হন। ছাত্র অবস্থায় সেই সতের-আঠার বছর বয়সেই ফেরদাউস মুসলিম ছাত্রলীগে যোগদান করেন, এবং মুসলিম লীগের মূল ধারার অনুসারী হন।

১৯৪২-এর ডিসেম্বরে পিতা একরামউদ্দীন খুলনায় বদলি হয়ে আসার পর ফেরদাউস বি এল কলেজের ছাত্রাবাস ছেড়ে পরিবারের সাথে শহরের শ্রীশনগরের ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। এ সময় থেকে তিনি রাজনীতির পাশাপাশি পৈতৃক বইয়ের ব্যবসায়ে আংশিক মনোনিবেশ করেন। তিন বছর পর ১৯৪৫-এ পিতা চাকুরি থেকে অবসর নিলে তিনি তাঁদের বই-এর দোকান 'মডার্ন বুক ডিপো'র মূল দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

সে সময়ে মুসলিম লীগের ভিতরে দুটি ধারার স্রোত প্রবহমান ছিল। একটি ছিল খাজা নাজিমউদ্দীন, মাওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখদের নেতৃত্বে রক্ষণশীল ধারা, অন্যটি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখদের নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত উদারপন্থি ধারা। এই দ্বিতীয় ধারায় যুবকর্মীদের আধিক্য যেমন ছিল তেমনি তাদের প্রাধান্যও কম ছিল না। খুলনায় খান এ সবুর এই ধারার নেতৃত্বে ছিলেন। আবু মহম্মদ ফেরদাউস, বলা বাহুল্য, এই অপেক্ষাকৃত উদারপন্থি ধারার সাথে যুক্ত হয়ে খুব দ্রুতই এর অগ্রণী ভূমিকায় চলে আসেন। আপন বুদ্ধিমত্তা, নিষ্ঠা ও চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারা তিনি নিজেকে একটি শক্ত অবস্থানে সেদিন দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। তবে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরে জাতীয় পর্যায়ে মুসলিম লীগ বিভক্ত হয়ে গেলে খুলনাতেও তার প্রভাব পড়ে। সে সময় ফেরদাউস ও তাঁর কয়েকজন সহমর্মী সবুর গ্রুপ ত্যাগ করে দেলদার আহমদ, আব্দুল জলীল, মোস্তা

গাউসুল হক প্রমুখদের সাথে যুক্ত হন, যার কারণে তাঁদের উপর ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। এই ঠ্যাঙাড়েদের আক্রমণে জখম হয়ে কেউ কেউ সে যাত্রায় রক্ষা পেয়ে, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে, শুধুমাত্র 'প্রাণে বেঁচে থাকার গ্যারান্টি'র জন্য এবং রাজনৈতিক কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ সুখসমৃদ্ধির আকর্ষণে সবুর গ্রুপে ফিরে যান। কিন্তু অকুতোভয় ফেরদাউস কিছুতেই সেই সন্ত্রাসী আঁধারে ফিরে যাননি। 'ফিরে যান' আর 'ফিরে যাননি'র মাঝখানের ব্যবধান তৈরি হয় একটি অতি তুচ্ছ 'নি' দিয়েই। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটিমাত্র শব্দ, একটি আপাতনিরীহ অব্যয়। অথচ এই একটি অব্যয়ের ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমেই পরিস্ফুট হয় সতব্রত, নির্ভেজাল নেতৃত্বের এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার যথার্থ পরিচয়।

১৯৪৭-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও আন্দোলনের সেই উত্তাল সময়ের অল্প কিছুকাল পরেই শুরু হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের প্রথমপর্ব—১৯৪৮ সালে। সে সময় খুলনায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে। অচিরেই এদের সাথে যুক্ত হন উদারপন্থি ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ। '৪৮ সালে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে মিঃ জিন্নাহ্ একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা দেবার পর সমগ্র পূর্ববাংলায় আন্দোলনের যে জোয়ার বয়ে যায় তার ঢেউ খুলনাকেও প্লাবিত করে। আরো অনেকের মতো আবু মহম্মদ ফেরদাউসও সে জীবনযজ্ঞে সমিধ সংযোজন করেন। আর সেদিনের কথা স্মরণ করে খুলনার বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা কলকাতা-প্রবাসী ধনঞ্জয় দাস তাঁর রচিত 'আমার জন্মভূমি—স্মৃতিময় বাংলাদেশ' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

"সেই আন্দোলনে ফেরদাউস ভাই, আনোয়ার, আমজাদ, আজিজ, জহিরুল, হামিদ, জাহান আলী, কেষ্ট, পরমেশ আমরা সবাই একসঙ্গে ছিলাম। ধর্মের বন্ধন নয়—বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার মূল প্রশ্নে বাংলাভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সেদিন আমরা হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সবাই এক হয়ে গিয়েছিলাম।"

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে তাঁদের শ্রীশনগরের বাড়িতে দু'বার পুলিশ সার্চ ক'রে বেশকিছু প্রগতিশীল বই ও পত্রিকা আটক করে নিয়ে যায়। অর্থাৎ তিনি যে সে সময় পুলিশের—বিশেষত গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের অন্যতম টার্গেট হয়ে ওঠেন, এ বিষয়ে মতদ্বৈধতা নেই। ভাষা আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জোয়ারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে '৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার মিছিলের উপর পুলিশের গুলি বর্ষণ এবং হতাহত মানুষের সংবাদ যখন খুলনায় এসে পৌঁছাল তখন সারা দেশের মতো খুলনার রূপসার শান্ত জলও উত্তাল জোয়ারে ফুঁসে উঠেছিল। যাঁরা এতদিন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে কিছুটা দূরে ছিলেন তাঁরাও ছুটে আসেন এ আন্দোলনে যোগ দিতে। এদের মধ্যে আবু মহম্মদ ফেরদাউস ছিলেন অন্যতম। ২৩শে ফেব্রুয়ারি খুলনা শহরে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ওই দিন বিকেলে তৎকালীন গান্ধী পার্কে এম এ গফুরের নেতৃত্বে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে অন্যান্যদের মধ্যে আবু মহম্মদ ফেরদাউসও বক্তব্য রাখেন। পরদিন ২৪শে ফেব্রুয়ারি এম এ গফুরকে আহ্বায়ক করে খুলনায় ১১ সদস্যের যে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় তার অন্যতম সদস্য ছিলেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস। তখনো কিন্তু তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতি ত্যাগ করেননি। আসলে দল দিয়েই কি সব মানুষকে চেনা যায়?

আগেই বলেছি, সে সময়টা ছিল সম্ভব-অসম্ভবের বাধা ভাঙার অস্থির ও দ্রুত পটপরিবর্তনের এক উত্তাল সময়। '৫২-র ডিসেম্বরে দেশের কিছু বামপন্থি চিন্তাবিদ ও কর্মীর উদ্যোগে 'গণতন্ত্রী দল' নামে একটি অসাম্প্রদায়িক দল আত্মপ্রকাশ করে, যার সভাপতি হন হাজী মোহাম্মদ দানেশ এবং সম্পাদক হন মাহমুদ আলী। এ্যাড. আব্দুল জব্বার, এম এ গফুর, দেবেন দাস প্রমুখদের নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালে এই দলটি যখন খুলনায় সংগঠিত হতে যাচ্ছে তখন আবু মহম্মদ ফেরদাউসের ক্রমোত্তিন্ন চেতনার সৈকতে নতুনতর আলোকসম্পাত ঘটল। সৃষ্টি হল অন্যতর সমীকরণ। নির্বাচিত হলেন এই দলের জেলা কমিটির সহ-সভাপতি পদে। তখন থেকেই পুলিশের বিশেষ শাখায় তাঁর নাম 'কমিউনিস্ট' অভিধায় চিহ্নিত হয়ে যায়। এই ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির সকালে খুলনার সাউথ সেন্ট্রাল রোডে ছাত্র-জনতার মিছিলে মুসলিম লীগের গুণ্ডারা হামলা চালায়। সেদিন আবু মহম্মদ ফেরদাউসের নেতৃত্বে তরুণেরা হামলা মোকাবিলা ক'রে পাল্টা জবাব দিলে মুসলিম লীগের লেলিয়ে দেওয়া গুণ্ডারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

আন্দোলনের দুর্বার প্রবহমানতার তাড়নায় ভাষা আন্দোলন ক্রমশ বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের আন্দোলনে পরিণত হল। এল '৫৪-র নির্বাচন। মুসলিম লীগের দুঃশাসন ও বাঙালি জাতিসত্তা ও বাংলা সংস্কৃতিবিরোধী দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল ও নেজামে ইসলাম যুক্তফ্রন্ট গঠন করল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ জয়লাভ ক'রে সরকার গঠন করলেও শুরুতেই জঘন্য ষড়যন্ত্র ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের অঙ্কুশ-আঘাতে এক মাসের মাথাতেই শের-এ-বাংলার মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করে ৯২(ক) ধারা জারির মাধ্যমে পূর্ববাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করা হল। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভূমিকার জন্য নির্বাচনের আগেই আবু মহম্মদ ফেরদাউসের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। আত্মগোপনে থেকে ফকিরহাট-মোল্লাহাট-তেরখাদা-খুলনা সদর ও বটিয়াঘাটা এলাকা নিয়ে গঠিত তপশিলী আসনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী বিভূতি রায়কে জয়যুক্ত করতে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। প্রেসিডেন্টস রুল জারি হলে ফেরদাউস আবার আত্মগোপন করেন। এর কিছুকাল পর ক্রীড়ামোদী ও সফল ক্রীড়া-সংগঠক ফেরদাউস ঢাকায় ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং কিছুকাল কারাবরণ করেন। ১৯৫৬ সালে পুলিশ ধর্মঘটের সময় সম্পূর্ণ বিনা কারণে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকৃত অপরাধীকে ধরতে না পারলেও পুলিশকে তো দক্ষতা দেখাতেই হয়। সেক্ষেত্রে কিছু 'চিহ্নিত' মানুষকে তো তাদের দরকার।

১৯৫৭ সালে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে সংযুক্ত হল নতুন এক অধ্যায়। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হল পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। 'গণতন্ত্রী দল' এই দলের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং আবু মহম্মদ ফেরদাউস ন্যাপ-এর খুলনা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সালে ন্যাপ বিভক্ত হলে তিনি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ-এর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের খুলনা জেলা কমিটির সভাপতি হন। ১৯৭০ ও ১৯৭৩-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ন্যাপের প্রার্থী হিসাবে খুলনা-২ আসনে নির্বাচন করে পরাজিত হন। ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বরে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই পদেই ছিলেন।

তিন

আগেই বলেছি ১৯৪৫ সালে পিতা একরামউদ্দীন আহমেদ সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেবার পূর্ব থেকেই আবু মহম্মদ ফেরদাউস পৈতৃক উদ্যোগে স্থাপিত বই-এর ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত হন, এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এর মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জিত হওয়ায় তিনি ও তাঁর দু'ভাই শামসুর রহমান ও আমজাদ হোসেন মিলে খুলনায় 'ইস্টার্ন প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৫২/৫৩ সালে। এর পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা ১৯৬০ সালে খুলনা-যশোর রুটে তখনকার দিনের উন্নত মানের কয়েকটি বাস চালু করেন। ঐ ষাটের দশকেই উদ্যোগী ভাইদের সহযোগিতায় 'রূপসা হোটেল' ও 'সুন্দরবন রাইস মিল' নামে আধুনিক হোটেল ও স্বয়ংক্রিয় রাইস মিল প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁরা আর্থিক সংকটে পড়েন। এইসব ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত থাকাকালে আবু মহম্মদ ফেরদাউস তাঁর সচ্চরিত্র ও সাংগঠনিক গুণাবলির কারণে খুলনার পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি এবং খুলনা বাস মালিক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং বেশ কিছুকাল সেসব দায়িত্বও তিনি সাফল্যের সাথে পালন করেন।

আবু মহম্মদ ফেরদাউসের ভিতরের মানুষটিকে সঠিক পরিচয়ে চিনে নেবার জন্য এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য। রাজনৈতিক জীবনে 'মস্কোপন্থি' অভিধায় পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সকল মত ও পথের পত্রপত্রিকা ও বই পড়তেন। এমনকি তিনি ফিদেল ক্যাস্ট্রো, চে গুয়েভারার সমর্থক ছিলেন এবং নেপাল ও ভারতের মাওবাদীদের সশস্ত্র সংগ্রামের সমর্থক ছিলেন। এইযে সকল বৃত্তকে অতিক্রম ক'রে মুক্ত বুদ্ধ শুদ্ধ আলোর পিপাসা–'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে'–এই আলোক-সন্ধানী চিরন্তন জীবনতৃষা একজন মানুষকে নিঃসঙ্গ ক্ষুদ্রতার সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম ক'রে চিরঞ্জীব মহিমায় উত্তীর্ণ করে। এই জিজ্ঞাসা, এই উন্মুখতা মূলত যৌবনেরই ধর্ম। আর এই যৌবধর্মেই আবু মহম্মদ ফেরদাউসের দীক্ষা ছিল, যার প্রকাশ ঘটেছিল যেমন রাজপথের অজস্র প্রতিবাদী মিছিলে–রাজনীতির অঙ্গনে, তেমনি ক্রীড়াঙ্গনে এবং নাট্যাঙ্গনেও। আসলে, রাজনীতি তো 'an end itself' নয়, তা 'means to an end', আর সে end হল বৃহত্তম মানুষের মহত্তম কল্যাণ–সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক কল্যাণ।

ছেলেবেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং সেখানেও তাঁর একটি অগ্রণী ভূমিকা থাকত। '৬০-এর দশকের প্রথম দিকে নিজস্ব উদ্যোগে 'খুলনা হিরোজ' নামে তিনি একটি ফুটবল দল প্রতিষ্ঠা করেন। পঞ্চাশের দশকে খুলনার সাংস্কৃতিক জগতের ঐতিহ্যমণ্ডিত 'খুলনা নাট্য মন্দির'-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'খুলনা নাট্যনিকেতন'। ১৯৮১-'৮২ থেকে ১৯৮৫-'৮৬ পর্যন্ত আবু মহম্মদ ফেরদাউস এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন।

চার

আশির দশকের শেষের দিকে আবু মহম্মদ ফেরদাউস অবহেলিত বৃহত্তর খুলনার সার্বিক উন্নয়নের জন্য, এই উন্নয়ন দাবিকে একটি বেগবান ও ইতিবাচক আন্দোলনে পরিণত করার লক্ষ্যে, বলতে গেলে, এক ধরনের তাড়না অনুভব করতে থাকেন। শহরের

এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ছোট ছোট অথচ দ্রুত পদক্ষেপে ছুটতে থাকেন ঘরে ঘরে কড়া নাড়তে। এভাবে ছোট ছোট জলধারাকে স্রোতধারায়, নানা স্রোতধারাকে একটি বেগবতী গণ-আন্দোলনে রূপায়িত ক'রে তাকে ধাপে ধাপে সাফল্যের তীর্থসঙ্গমে পৌঁছে দেওয়া যে কী আয়াসসাধ্য এবং এর জন্য কী অপরিসীম সময়, শ্রম, নিষ্ঠা ও চরিত্রবল প্রয়োজন, বিশেষ করে কলহপ্রবণ ও ঈর্ষাপ্রবণ বাঙালিদের ক্ষেত্রে, তা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে পুরোপুরি ধারণা করা সহজ নয়। ১৯৮৯ সালে যে বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়, তিনিই ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক, পরবর্তীতে সভাপতি। আমৃত্যু তিনি এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন অবিচল নিষ্ঠার সাথে। তাঁরই নেতৃত্বে বর্ধিত পৌরকর প্রত্যাহার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, রূপসা ব্রিজ নির্মাণ সফলতার মুখ দেখেছে, এবং তাঁর জীবনাবসানের পরও তাঁর প্রেরণা এই আন্দোলনকে গতিশীল রেখেছে।

পাঁচ

আকাশ যতই অসীম ও বাধাবন্ধহীন হোক না কেন, নিঃসীম নীলিমার আহ্বান যতই অপ্রতিরোধ্য হোক না কেন, দিনান্তে একসময় 'সব পাখি ঘরে ফেরে, সব নদী, ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন·····।' ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর খুলনা শহরের নিজগৃহে তিনি জীবনের সব লেনদেন চুকিয়ে দিয়ে গেলেন। কিন্তু না, কিছুতেই জীবনানন্দীয় বিষাদকে টেনে নিয়ে বলা যাবে না 'থাকে শুধু অন্ধকার····'। আবু মহম্মদ ফেরদাউসেরা সারাটা জীবন ধরে অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর সন্ধান করেন, তাঁদের যাত্রা আঁধার রাতে বাধার পথে হলেও তাঁরা রেখে যান আলোকিত পথের দিশা।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস তাঁর আশি-উর্ধ্ব জীবনে দেশের মানুষের জন্য, বৃহত্তর খুলনাবাসীর জন্য কী কী করেছেন বা তাদেরকে কতটুকু দিয়েছেন, তিনি কত বড় মাপের একজন জননেতা ছিলেন শুধু তার হিসাব মিলিয়ে মিলিয়ে সেই অনুপাতে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার অর্থ তাঁকে খাটো করে দেখা। একজন বড় মাপের মানুষের সত্যকার পরিচয় নিহিত থাকে তাঁর অচরিতার্থ মহৎ স্বপ্নে, তাঁর মহত্তম ব্যর্থতার দায়ভাগে, যার বেদনমধুর প্রকাশ ঘটেছিল জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো ক্রান্তদর্শী নিউটনের কণ্ঠে, সুরসম্রাট আলাউদ্দীন খাঁ-এর মর্মের গভীরে। আবু মহম্মদ ফেরদাউস কি একজন সফল জীবনযোদ্ধার আত্মতুষ্টি নিয়েই চলে গেলেন? কোনো মহৎ ব্যর্থতার গ্লানি কি তাঁর ছিল না? না থেকেই পারে না। কী সেই ব্যর্থতা? আমরা যারা তাঁকে সত্যিই শ্রদ্ধা করি বলে মনে করি তারা কি প্রস্তুত তাঁর সেই মহান দুঃখটিকে চিনে নিতে, সেই ব্যর্থতার উত্তরাধিকার ও দায়ভাগ গ্রহণ করতে? উত্তর দেবার আগে অন্তত একবার নিজের কাছে যেন সৎ হই।

তথ্য উৎস : ড. শেখ গাউস মিয়া রচিত 'মহানগরী খুলনা–ইতিহাসের আলোকে'
প্রফেসর মুজিবর রহমান রচিত সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি

অসিতবরণ ঘোষ : শিক্ষাবিদ, গবেষক, লেখক

মোঃ এনায়েত আলি

ফেরদাউস ভাই স্মরণে

আবু মহম্মদ ফেরদাউস নামটি খুলনায় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ফেরদাউস ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় ঘটে পঞ্চাশের দশকে। আমি তখন কলেজের ছাত্র। কলেজের ছাত্র হিসেবে সক্রিয়ভাবে ছাত্ররাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। প্রথমে ছাত্র ইউনিয়ন ও পরবর্তীতে ছাত্রলীগের সাথে আমার ছাত্ররাজনীতির সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

আমার জীবনের এ পর্যায়ে আমি ফেরদাউস ভাইকে চিনতে শুরু করি। তিনি বাম রাজনীতিক হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের দর্শনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং সেই আদর্শ তদানীন্তন পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জীবনের বহু ঝুঁকি নিয়ে তিনি তাঁর বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন।

এমনি এক সময় তদানীন্তন আওয়ামী লীগের দুই নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মধ্যে বৈদেশিক নীতি নিয়ে এক মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পশ্চিমা গণতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি এতটা অনুরক্ত ছিলেন যে তাঁকে আমরা গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলতাম। অন্যদিকে মওলানা ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলা হতো।

কাগমারীতে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে উভয় নেতার মতপার্থক্যের কারণে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে সমাজতন্ত্রের দর্শনে একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম দেন। এই সুবাদে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রায় সকল বাম রাজনীতির অনুসারীরা যোগদান করে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে তাদের রাজনৈতিক কামনা-বাসনা পূরণের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ফেরদাউস ভাইও তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকেন। তদানীন্তন গণতন্ত্রী দলের নেতা হিসেবে খুলনার রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে সমৃদ্ধ এ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বারও যোগদান করেন।

বিভিন্ন চিন্তাভাবনায় লালিত বাম দলসমূহ একত্রিত হয়ে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ায় তাদের মধ্যে মওলানা ভাসানীর বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যকে নিয়ে নতুন করে নানাপ্রকার মতপার্থক্য দেখা দেয়। বস্তুত ওই সময়ে বিশ্বে সমাজতন্ত্রের ধারক হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন প্রধান ভূমিকায় থাকার কারণে সমাজতন্ত্রকে নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে বিশ্বের সমাজতন্ত্রের সমর্থক ও অনুসারীরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যারা পরিচিতি লাভ করে–হয় মস্কো (সোভিয়েত) পন্থি না হয় চীনপন্থি হিসেবে। এমন পরিস্থিতিতে মওলানা ভাসানীর কথাবার্তা ও বক্তব্য চীনপন্থিদের স্বপক্ষের বক্তব্য হিসেবে পরিগণিত হতো। উল্লিখিত ভিন্নতার কারণে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি দুভাগে

বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি হলো প্রফেসর মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে ন্যাপ–মস্কোপন্থি এবং অপরটি হলো মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ–চীনপন্থি।

ফেরদাউস ভাই ও তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা মিলে মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে মস্কোপন্থি ন্যাপের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিসর বৃদ্ধির জন্য নিরলস পরিশ্রমের নিদর্শন রাখেন।

ফেরদাউস ভাইয়ের গ্রামের বাড়ি ফুলতলায়। কিন্তু তিনি ও তাঁর ভাইয়েরা খুলনা শহরে দীর্ঘকাল হতে বসবাস করেন। তাঁরা সকলে মিলে কে ডি ঘোষ রোডে একটি বইয়ের দোকান চালাতেন। তাছাড়া উল্লাসিনী সিনেমা হলের মালিকদের জায়গায় একটি প্রিন্টিং প্রেস পরিচালনা করতেন। বস্তুত ফেরদাউস ভাইয়ের পরিবারের অন্যরা ওসব ব্যবসা দেখাশুনা করতেন। আর তিনি জনসেবার উদ্দেশ্যে রাজনীতিকে নেশায় পরিণত করেছিলেন।

খুলনাতে ন্যাপের মোজাফফর গ্রুপের রাজনীতিতে ফেরদাউস ভাইয়ের সাথে যারা বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পাইকগাছার আব্দুল গফুর ও দাকোপের লুৎফর রহমান মণি, খুলনার এ কে সামসুদ্দিন সুনু, এ্যাডঃ আবদুল হালিম ও আরো অনেকে। খুলনার কে ডি ঘোষ রোডে অবস্থিত রেস্টুরেন্ট তৃপ্তিনিলয় ন্যাপের রাজনৈতিক আড্ডাখানা ছিল। ন্যাপ বিভক্ত হবার পূর্বে এ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার ও ফেরদাউস ভাইকে প্রায়ই সেখানে পাওয়া যেত।

আইয়ুব খান যখন পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন তখন বাম রাজনীতিকদের প্রকাশ্যে থাকাটা বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই ফেরদাউস ভাই অন্তরালে থেকে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। আসলে তিনি এমনভাবে বাম রাজনীতিতে নিবেদিত ছিলেন যে, তাঁর পরিবারের লোকেরা প্রায়ই তাঁর সাহচর্যবঞ্চিত ছিলেন।

আইয়ুবের শাসনের মধ্যে ১৯৬৪ সনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণায় ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে গঠিত রাজনৈতিক মোর্চা COP (Combined Opposition Party)-এর একজন প্রথম সারির নেতা হিসেবে খুলনাতে নির্বাচন প্রচারণার কার্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। যেহেতু সে নির্বাচন ছিল মৌলিক গণতন্ত্রের নামে আইয়ুবের সৃষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মেম্বারদের নিয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা, সেহেতু ওই সকল মুষ্টিমেয় নির্বাচকমণ্ডলীকে ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে ভোট প্রদানে রাজি করাতে ফেরদাউস ভাই নিরলস পরিশ্রম করেন। ওই সময় আমরা অনেকেই আওয়ামী লীগের কর্মী হিসেবে যথেষ্ট চেষ্টা করি ফাতেমা জিন্নাহকে বিজয়ী করতে। কিন্তু তা হয়নি।

১৯৬৬ সনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি উত্থাপন করে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করলে সারা পাকিস্তান জুড়ে স্বার্থান্বেষী মহল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আইয়ুব খান যখন অস্ত্রের ভাষায় জবাব দিতে চান, জুলফিকার আলী ভুট্টো যখন পল্টন ময়দানে জনসমাবেশ করে ৬ দফার বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার ডাক দেন তখন শেখ মুজিব তার চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করলে সারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে এক নতুন চেতনা জন্ম নিতে শুরু করে।

এরপর যখন ৬ দফার ধারাবাহিকতায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, গণঅভ্যুত্থান ও

শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাঙালি জাতি তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখন মোজাফফর ন্যাপের নেতৃবৃন্দ গণআন্দোলনের লক্ষ্যে সম্পৃক্ত হবার এক পর্যায়ে মোজাফফর ন্যাপের খুলনার নেতৃবৃন্দের মধ্যে জনাব আব্দুল গফুর, লুৎফর রহমান মণিসহ আরো অনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন ও পরে এমএনএ নির্বাচিত হন। ফেরদাউস ভাই মোজাফফর ন্যাপের রাজনীতিকে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি চালিয়ে যেতে খুলনাতে নেতৃত্ব অব্যাহত রাখেন।

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চের পর যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে ফেরদাউস ভাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে মোজাফফর ন্যাপের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে খুলনার রাজনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্মরণীয় ভূমিকা রাখেন। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসব্যাপী খেয়ে না খেয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফেরদাউস ভাই মুক্তিযুদ্ধে সংগঠকের ভূমিকা রাখেন।

চূড়ান্ত মুক্তি লাভের পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন সরকার পরিচালনার পরিকল্পনায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিসমূহের মধ্যে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সখ্য গড়ে ওঠে এবং প্রায়ই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তিনটি দলের যৌথ ভূমিকা পরিলক্ষিত হতো। ওই সময় ফেরদাউস ভাই অনন্য ভূমিকা রাখেন।

স্থানীয় পর্যায়ে পুনর্বাসনসহ অন্যান্য বিভিন্ন কাজে উক্ত তিনটি দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। ওই সময় খুলনার জনগণের জন্য সরকার গৃহীত বহুমুখী কর্মসূচিতে ফেরদাউস ভাই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতেন। তিনি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও তাঁর বয়োকনিষ্ঠদের সাথে মিলে সুন্দর কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। বর্তমানে যার বড় অভাব।

ফেরদাউস ভাই যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠনে চমৎকার নেতৃত্ব দিতে সক্ষম ছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব সব সময় গতিশীল ছিল। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সব সময় নির্ভীক ভূমিকা রাখতেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হয়েও জনগণের দাবি আদায়ে সোচ্চার থাকতেন। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী। অপ্রীতিকর সত্য কথা বলতেও তিনি দ্বিধা বোধ করতেন না। তিনি তাঁর অতি নিকটের ব্যক্তিকেও প্রয়োজনে সমালোচনা করতে ছাড়তেন না। তাঁর দীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বস্তুত রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে জীবনসায়াহ্নে বৃহত্তর খুলনার বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে খুলনার বহুমুখী উন্নয়ন নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির শীর্ষ নেতৃত্বে এসে হাল ধরেন। তিনি গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, মংলা বন্দর, খুলনার বিমানবন্দর, রূপসা সেতু নির্মাণ, পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহ, ইপিজেড, সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র, শিল্পকারখানার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বহুমুখী বিষয় নিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি সফল হন বিভিন্ন মতাদর্শের ব্যক্তিদেরকে খুলনার উন্নয়নের জন্য একত্রিত করতে। তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি কঠোর আন্দোলন দিতেও

পিছপা হননি। বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও স্থায়ী রূপদানের জন্য তাঁর প্রয়াত হবার অব্যবহিত পূর্বে খুলনা নগরীতে একখণ্ড মূল্যবান ভূমি খরিদ করে বিরল ভূমিকা রেখেছেন।

অন্যান্য দানশীল ব্যক্তিবর্গসহ তাঁর নিজ পরিবার ও নিকট আত্মীয়স্বজনের অবদান চিরস্মরণীয়।

তিনি আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছেন ঠিকই কিন্তু আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে গেছেন জনকল্যাণে ব্যয়িত এক কর্মব্যস্ত জীবনপ্রবাহের নিদর্শন। আমাদের প্রজন্ম ফেরদাউস ভাইয়ের জীবন থেকে জনসেবার জন্য জ্ঞানসমৃদ্ধ হবে এমন কামনাই হোক আমাদের ভবিষ্যতের দিনগুলোয়।

মোঃ এনায়েত আলি : আইনজীবী, সাবেক গণপরিষদ সদস্য ও খুলনা পৌর চেয়ারম্যান

মোঃ দেলোয়ার হোসেন

স্মৃতিতে ফেরদাউস ভাই

'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা রবে'– এ এক অমোঘ চিরসত্য–তারপরেও কিন্তু মানুষ তার সুকর্মের মাঝেই অমর হয়ে থাকে। তার জন্য স্মরণসভা হয়, তাকে নিয়ে স্মরণিকা বের হয়–তেমনি ফেরদাউস ভাই আমার স্মৃতিতে অমর। আমাদের এই সমাজের অনেক মহারথীর মঞ্চের বক্তৃতার সাথে তাদের চারিত্রিক মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ফেরদাউস ভাই ছিলেন তাদের ব্যতিক্রম। তাঁকে প্রথম দর্শনে খুব গম্ভীর প্রকৃতির মনে হলেও তাঁর পোশাক-আশাক ও আলাপে ছিলেন খুবই সাধারণ কিন্তু ব্যক্তিত্বে ছিলেন অসাধারণ। অতি সহজেই ছোট-বড় সবাইকে মুগ্ধ ও আপন করে নেয়ার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা ছিল ফেরদাউস ভাইয়ের। তিনি তাঁর ভিন্ন মতের ব্যক্তিকেও সম্মান দিতেন বলেই হয়তো তিনি দলমতনির্বিশেষে সবার কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

১৯৬৬ সালে দেশ বিভাগের পর খুলনায় সর্বপ্রথম সরকারি পর্যায়ে নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ নির্দেশক ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পাওয়ার পরে সেদিনের নাট্যমন্দির আজকের নাট্য নিকেতনের সদস্য হয়ে যখন গিয়েছিলাম তখন ফেরদাউস ভাইকে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। খুব একটা কথাবার্তাও হতো না। সামনাসামনি হলে সালাম দিয়েছি। উনি হয়তো বড় জোর জিজ্ঞেস করেছেন–কেমন আছি? ওই পর্যন্তই। কিন্তু একদিন (১৯৬৮ সাল) আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন–দেলোয়ার সাহেব আপনার 'জ্বালা' দেখলাম। আমার জ্বালা মানে? হেসে দিয়ে বললেন–মানে আপনার পরিচালিত ঋত্বিক ঘটকের documentary drama 'জ্বালা'। অপূর্ব পরিকল্পনা, সেট সেই সাথে প্রতিটি শিল্পীর চরিত্র রূপায়ন। 'ছেঁড়া তার' নাটকের পরেই এই 'জ্বালা'। এমনি নাটক দিয়েই তো আমাদের সমাজজীবনের পরিবর্তন করার চেষ্টা আপনাদেরই করতে হবে। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে–আপনি পাকিস্তান সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরি করেও কী করে শ্রেণীসংগ্রামের নাটক করতে সাহস করলেন। উত্তরে বলেছিলাম–আমার কোনো পিছুটান নেই যে অত ভাবব। তাছাড়া আমাদের নিম্ন মধ্যবিত্তদের জ্বালাই তো ওই নাটকে ফুটে উঠেছে। অবশ্য ওই 'জ্বালা' নাটকের জন্য 'লিপিকা' আমাকে ওই বছরের খুলনার শ্রেষ্ঠ নাট্যনির্দেশক ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার দেয়। 'জ্বালা' নাটকের আহ্বান ছিল–

> আব কোমর বন্ধ তৈয়ার হো লক্ষ-কোটি
> ভাই-ও, হাম ভুখসে মরণে বালে,
> ন গৌতমে ডরনে বালে, আজাদীকা
> ডঙ্কা বাজাও, উঠাও অগ্নিধ্বজা।
> লোক যুদ্ধ কি পুকার আতি হায় বারম্বার

হো তৈয়ার, মাজদুর হোঁশিয়ার হো
কিষাণ হোঁশিয়ার–হো তৈয়ার...........

(সুর করেছিলেন প্রয়াত সাধন সরকার)

আমার 'দারিদ্র্য' নৃত্যনাট্য (কাজী নজরুল ইসলামের 'দারিদ্র্য' কবিতা অবলম্বনে) দেখে বলেছিলেন কোনো কিছুর গভীরে প্রবেশ করতে না পারলে সার্থক সৃষ্টি করা যায় না। 'দারিদ্র্য' কবিতার গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছেন বলেই ওই দুরূহ কাজটি আপনার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ফেরদাউস ভাই আরো বলেছিলেন নাটকে অবশ্যই মানুষের জন্য কিছু না কিছু দিকনির্দেশনা থাকতে হবে। অথচ এখনকার প্রায় নাটকই কিছু নাটকীয় ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়–শুধু সময়ের অপচয়। তাঁর ওটুকু কথাই আমার মনোবল অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল যার জন্য আমার নাটকের স্লোগান হলো–'যে নাটক দেশ ও দশের উপকারে আসে না মানুষকে জীবনের পথ দেখাতে পারে না–আজ সে নাটকের প্রয়োজন নেই'। ফেরদাউস ভাই আমার জন্য কিছু নাটকের বই দেশের বাইরে থেকে এনে দিয়ে বলেছিলেন–এই নাটকগুলো আপনার সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। বইগুলোর মধ্যে বিশেষ করে গোর্কির 'মাদার' (মা), 'দ্য লোয়ার ডেপথস' (নিচের মহল), 'এনিমিজ' (দানব) ও চীনের 'লাল লণ্ঠন' যা আমাকে আরো সাহসী করে তোলে। যার ফলশ্রুতিতে সরকারি চাকুরিতে থেকে কোনো রাজনৈতিক দলের লোক না হয়েও শুধু দেশের প্রতি একজন নাট্যকর্মীর দায়বদ্ধতা ভেবেই ১৯৭১-এ স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের প্রথম পথনাটক–'মুক্তির রক্ত শপথ' রচনা, পরিচালনা ও অভিনয় করতে সাহস করেছিলাম। ('মুক্তির রক্ত শপথ' একাত্তরের ১৩ মার্চ থেকে ২২ মার্চ খুলনার শহীদ মিনারে ও ট্রাকের উপরে খুলনায় এবং ২৩ মার্চ বাগেরহাটে অভিনীত হয়।) ফেরদাউস ভাই বলেছিলেন সংগ্রাম-আন্দোলনে নাটক হতে পারে একটি ভয়ংকর হাতিয়ার। হ্যাঁ, প্রমাণ পেয়েছিলাম যখন রূপসা ইপিআর ক্যাম্পে আমার ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার হচ্ছিল–'মুক্তির রক্ত শপথ' নাটক করার অপরাধে। দেশ স্বাধীন হলো। 'মুক্তির রক্ত শপথ'-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ আমার লেখা 'একটি দেশ একটি স্বাধীনতা' নাটক আমার একান্ত অনুগত শহীদ নূরুল ইসলাম মুন্নু ও হায়দারের স্মৃতির উদ্দেশে খুলনা করোনেশন হলে মঞ্চস্থ করি। সে সময় ফেরদাউস ভাই গভীর ক্ষোভের সাথে বলেছিলেন, এত করেও কী লাভ হলো বলতে পার দেলোয়ার.......এই স্বাধীনতা কি গুটিকতক লোকের জন্য? এ স্বাধীনতা কি অস্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য? যারা লক্ষ লক্ষ শহীদি রক্তের সাথে মা-বোনের ইজ্জতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বাধীনতাকে লুটেপুটে ভোগ করছে–স্বাধীনতার কাঁধে ভর করে সম্পদের পাহাড় গড়ছে–তাদের বিচার কবে কারা করবে? এর পরেই আমি লিখেছিলাম স্বাধীনতার অবমূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে একক অভিনয়ের বেতার নাটক 'একদা নিশীথে' (খুলনা বেতার থেকে প্রচারিত)। নাটক শুনে ফেরদাউস ভাই বলেছিলেন, 'দেলোয়ার যারা জেগে ঘুমায় তাদের জাগানো যায় না। জানি না স্বাধীনতার এই অবমূল্যায়নের মাশুল আমাদের কত যুগ ধরে দিতে হবে।'

ফেরদাউস ভাই আমাকে নিশ্চয়ই ভীষণভাবে ভালোবাসতেন। তা নইলে যখন 'সন্ধানী'

১৯৮৩ সালে খুলনা বিভাগীয় গুণীজন সংবর্ধনাতে আমাকে খুলনা জেলার গুণী হিসেবে নির্বাচন করল, খুলনা সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কয়েকজন নাট্যকর্মী তাতে বিরোধিতা করে বললেন, ' দেলোয়ার তো খুলনার লোক নয়, বহিরাগত। তাকে কেন খুলনা জেলার গুণী নির্বাচন করা হবে?' সন্ধানীর কর্ণধার প্রয়াত শ্রীকানাই বিশ্বাস মহাবিপাকে পড়ে ফেরদাউস ভাইয়ের শরণাপন্ন হলেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য। ফেরদাউস ভাই নাকি এক কথায় কানাইদাকে বলেছিলেন–যারা আপত্তি করছে তাদের কী অবদান আছে খুলনা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে–যা দেলোয়ারের আছে। দেলোয়ার আমাদের খুলনার গৌরব আর মানব সভ্যতায় বিশ্বায়নে–মানুষ এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেয়ে বসতি স্থাপন করেছে। ওরা গুণের মূল্যায়ন করতে পারে না বলেই হীনম্মন্যতায় ভোগে। অনুষ্ঠানের শেষে কানাইদা-ই আমাকে কথাগুলো বলেছিলেন। ফেরদাউস ভাইয়ের কথাগুলো ভেবে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছিল–উনি কত উদার–কত মহৎ। আর একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'খুলনা থেকে মন্ত্রী, স্পিকার থাকলেও খুলনার উন্নয়নের জন্য তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। খুলনা উন্নয়নের জন্য জনগণকে সাথে নিয়ে আমাদেরই সংগ্রাম-আন্দোলন করতে হবে। ন্যায্য পাওনা থেকে আমরা কেন বঞ্চিত হব। সংগ্রাম-আন্দোলন ছাড়া কোনো কিছু পাওয়া যায় না। তাই বোধ হয় মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত ফেরদাউস ভাই বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি ছিলেন।

আজ ফেরদাউস ভাই আমাদের মাঝে নেই–তাঁর লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদের খুলনাবাসীর, আমি আর তাঁর মুখোমুখি হতে পারব না। আর উনি আমায় কিছু বলবেন না কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ফেরদাউস ভাইয়ের 'কুঁড়েঘর', 'মডার্ন বুক ডিপো', 'তৃপ্তিনিলয়', কে ডি ঘোষ রোডের মোড় ঘুরে ফেরদাউস ভাইয়ের পাশে হেঁটে চলেছি......... তাঁর সেই ক্ষোভ–'স্বাধীনতার অবমূল্যায়নের মাশুল আমাদের কত যুগ ধরে দিতে হবে?' এত বছর পরেও তার উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে–স্বাধীনতার কাঁধে ভর করে আর কত–কত বড় হতে হবে–আর কত সম্পদ চাই–সবাইকে তো খালি হাতেই কবর বা চিতায় যেতে হবে–তবে আর কেন? কোনো উত্তর নেই–চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার–প্রকৃতি স্তব্ধ–মাতৃভূমি কেঁদে কেঁদে বলছে–আলোকিত মানুষ চাই, কিন্তু দেশবাসী তো সেই আলোকিত সৎ মানুষের খোঁজ করেও বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। উৎস খোঁজ, শেকড়ের সন্ধান কর–ফেরদাউস ভাইরা আবার জন্ম নিক। দেশে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটলেও সৎ ও সত্যিকারের মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। 'কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ'–নইলে যে দেশের সার্বভৌমত্ব থাকবে না। সার্বভৌমত্বহীন জাতি আর মেরুদণ্ডহীন মানুষ সে তো একই কথা।

এহসান চৌধুরী

একজন আলোকিত ব্যক্তিত্বের বিদায়

মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে আমি দীর্ঘ সময় ধরেই জানতাম। কারণ আমার বাড়ি যেহেতু যশোরে, সুতরাং খুলনায় আসা-যাওয়া কোনো ব্যাপারই ছিল না। বলতে গেলে কী আমি ১৯৫৬ সাল থেকে খুলনায় নিয়মিত যাতায়াত করতাম। সেই সময় যশোরের সুধীমহলে মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউসের নাম আমি বহুবার শুনেছি, এমনকি রাজনৈতিক মহলেও। মূলত ১৯৫২র ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত মরহুম ফেরদাউস ও অন্যান্যরা যশোরের মরহুম আলমগীর সিদ্দিকি, মরহুম এ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম প্রমুখের সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। আমি ১৯৫২ সালে যশোর জিলা স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে যশোরে যে আন্দোলন দেখেছি সেই আন্দোলনেরই অংশ হিসেবে খুলনায় ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল, সহজেই অনুমান করতে পারি। ভাষাসৈনিক ফেরদাউস সাহেব এ আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।

যাহোক মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউসের সঙ্গে দ্বিতীয়বার ভালোভাবে পরিচিত হই ১৯৯২ সালে যখন খুলনায় বাংলা একাডেমির দায়িত্বভার গ্রহণ করে এখানে আসি। খুলনায় এসে প্রথমেই সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা পাই মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউসের নিকট হতে। যদিও তিনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক প্রবীণ, তবুও খুলনার সমসাময়িক অন্যান্যের মতো আমি তাঁকে ফেরদাউস ভাই বলেই ডাকতাম। কোনো প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপন করা যে কত বড় দুরূহ কাজ তা যারা করেছেন তারাই কেবলমাত্র জানেন। বলা বাহুল্য ১৯৯২ সালের ৩১ শে জুলাই খুলনায় বাংলা একাডেমির শাখা স্থাপিত হয় যথেষ্ট জাঁকজমকের সাথে এবং ওই দিনই খুলনার কমিউনিস্ট নেতা রতন সেন নিহত হন। ফলে আমরা এক সমস্যায় পড়ে যাই। এ সময় মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউসের সাহায্য ও সহযোগিতায় আমরা নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করি।

মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে কাছে থেকে যতটা দেখেছি তাতে তিনি একজন মুক্ত বুদ্ধির মানুষ ছিলেন। বিশেষ করে বাংলা একাডেমির শাখা স্থাপনের ব্যাপারে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি প্রায়ই আমার খোঁজখবর নিতেন। কোন বই কেমন চলছে জানার চেষ্টা করতেন। বিভিন্ন সমস্যায় আমাকে সাহায্য করতে ছুটে আসতেন। বিশেষ করে হাদিস পার্কের বইমেলায় তিনি এমনই এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে তাঁর মতামত নেওয়ার জন্য প্রশাসনিক মহল ও বই বিক্রেতারা উৎসুক থাকতেন। 'খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' তাঁর চিন্তা ও চেতনার ফসল বলে জেনেছিলাম। খুলনার উন্নয়নের জন্য তিনি মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছেন,

অসুস্থ শরীরে মিটিংয়ে-মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। নিঃস্বার্থভাবে। তাঁর মতো একজন আলোকিত ব্যক্তিত্বের মহাপ্রয়াণ নিঃসন্দেহে খুলনাবাসীদের জন্য এক চরম আঘাত। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

এহসান চৌধুরী : শিশু সাহিত্যিক

মাজেদা হক

চেনা-অচেনা এক রাজনীতিবিদ

বাগেরহাটের প্রবাদপুরুষ, বহু তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থপ্রণেতা ড. শেখ গাউস মিয়ার অনুরোধক্রমে খুলনার রাজনৈতিক অঙ্গন ও বৃহত্তর খুলনার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অগ্রনায়ক আবু মহম্মদ ফেরদাউস সাহেবের স্মৃতিচারণ করে দু'কথা লিখতে বসে মনে হচ্ছে, আমি এই প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতার জীবন ও কর্মপরিধি সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি কতটুকুই বা লিখতে পারব। ব্যক্তিগত জীবনে এই রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আমার একটা মধুর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কটি কী? তিনি আমার একমাত্র খালাতো বোন আনোয়ারা বানুর স্বামী। আমাদের দুলাভাই। কিন্তু এই সম্পর্কের সূত্রটি খুব দৃঢ় ও মধুর না হলেও আমাকে দেখলেই হেসে বলতেন, কেমন আছ? কেমন চলছে তোমাদের দিনকাল? বাচ্চারা কে কোথায় আছে? কে কী করে ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন মনে হতো খুলনা শহরে ফেরদাউস ভাই-এর মতো এত আপনজন বুঝি আর কেউ নেই।

১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে খুলনা জেলার আশাশুনি উপজেলার শ্রীউলা গ্রামের মরহুম চৌধুরী আশরাফউদ্দীন মকবুল সাহেবের কন্যা আনোয়ারা বানুর সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সে যুগে এ পরিবারটি ধনে-জনে ও ইসলামী শিক্ষায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। বিবাহের সময় 'বানু আপা'র বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। তৎকালীন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের অল্পবয়েসেই বিয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। বিয়ের পরে ফেরদাউস ভাই খুলনায় ফিরে আসেন কিন্তু হঠাৎ ডিসেম্বরে যেয়ে আপাকে খুলনায় নিয়ে আসেন। এজন্য আপার বিয়েতে বিশেষ ধুমধাম বা কোনো অনুষ্ঠান হতে পারেনি।

ফেরদাউস ভাইয়েরা তখন বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-পরিজন সবাইকে নিয়ে শ্রীশনগরের বাসায় থাকতেন। আমাদের বয়স সে সময় খুব অল্প হলেও বেশ মনে পড়ে ফেরদাউস ভাই তখন মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু দু-চার বছর বাদেই বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। সরকারবিরোধী যেকোনো আন্দোলনে মরহুম আব্দুল গফুর ভাই ও ফেরদাউস সাহেব সবার আগে থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। আমার আব্বার বাড়ি বর্তমান জেলা শহর সাতক্ষীরায়। আমাদের এই দুলাভাইয়েরা মিছিল-মিটিং, অবরোধ শেষে আমাদের বাড়িতে আসতেন। হঠাৎ করে রাজনীতিবিদ এই জামাইদের আগমনে আম্মা বিব্রত বোধ করলেও আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি থাকত না।

১৯৬২ সালে আমি আমার স্বামী চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোজাম্মেল হকের সাথে খুলনায় এসে ডেরা বাঁধলাম। আহসান আহমেদ রোডে আমাদের বাসা আর কাছেই বাবু খান রোডে থাকতেন ফেরদাউস ভাইয়েরা। দুটি বাসার দূরত্ব খুব বেশি নয়। এজন্য প্রায় প্রতিদিনই সময়ে-অসময়ে আমাদের যাওয়া-আসা চলত। ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদ ভারিক্কি

চালের এই দুলাভাইটির সাথে খুব বেশি দেখা হতো না। সৌভাগ্যক্রমে দেখা হলেও শালীদের সাথে গল্পগুজব করার অভ্যাস তাঁর ছিল না। শুধুমাত্র সবার খবরাখবরই জানতে চাইতেন। বিশেষ করে আমার মেজো দুলাভাই আজীজ সাহেবের কথা। আজীজ ভাই তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

সকাল-বিকাল খাওয়ার পূর্বে আপা দুলাভাইকে ইনসুলিন ইনজেকশন দিয়ে দিতেন। অর্থাৎ তখন হতেই তাঁর ডায়াবেটিস ছিল। কিন্তু কী রাজনৈতিক অঙ্গন, কী পারিবারিক ব্যবসা সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী এক সফল মানুষ। মিছিল-মিটিং, সভা-সমাবেশ সব কিছুরই পুরোভাগে থাকতেন তিনি। এজন্য হয়তো রোগ-শোকের কাছে তিনি পরাজয় বরণ করেননি।

আপারা ছিলেন দুটি পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জনক-জননী। একটি কন্যা অল্প বয়েসেই মৃত্যুবরণ করে। অন্য সন্তানেরা শিক্ষা জীবনে অত্যন্ত মেধাবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। সবাই স্ব-স্ব অবস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর বড় ছেলে এ এন এম সালেক বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে চাকুরিরত ছিল। বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. সাজ্জাদ জহীর তাঁর ছোট ছেলে।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস সাহেব ছিলেন সংসারের প্রতি চিরউদাসীন, সদাব্যস্ত এক রাজনীতিবিদ। সংসারের কোনো বিষয়ে কোনো দিন কোনো খোঁজখবর নিয়েছেন বলে জানি না। তবে ধরণীর মতো সর্বংসহা আমাদের আপা সংসারসমুদ্র মন্থন করে নিজেই হলাহলটুকু পান করেছেন, অমৃতটুকু বিলিয়েছেন স্বামী-সন্তান আত্মীয়-পরিজনের মাঝে।

সবার শেষে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। আবু মহম্মদ ফেরদাউস সাহেব যে বাম রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন সেই বিশ্বাস হতে জীবনে কখনও বিচ্যুত হননি। অবিভক্ত ভারতবর্ষের সেই বৃটিশ শাসনামল হতে বাংলাদেশ পর্যন্ত তিনি দীর্ঘপথ পরিক্রমা করেছেন কিন্তু সেই একই রাজনৈতিক বিশ্বাস লালন করে গেছেন। আধুনিক যুগের তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের মতো বারবার খোলস পাল্টে বাড়ি-গাড়ি-ব্যাংক ব্যালান্স বাড়াতে চেষ্টা করেননি। তাঁর মতো নিঃস্বার্থ একজন রাজনৈতিক কর্মী এ যুগে বিরল।

মাজেদা হক : কবি ও সাহিত্যিক

মনোয়ার আলী

আবু মহম্মদ ফেরদাউস এবং খুলনার পাকিস্তানভুক্তি প্রসঙ্গ

'৪৭-এ দেশভাগ কালে অপেক্ষাকৃত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ খুলনার পাকিস্তানভুক্তি কীভাবে সম্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে কিছু লোকের মধ্যে এখনো বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। কেননা বিষয়টি নিয়ে এখানে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের মতো একটা ব্যাপার ছিল। খুলনার পাকিস্তানভুক্তি ঘোষিত হয় '৪৭-এর ১৭ আগস্ট। শুধু খুলনা কেন, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী বাংলা এবং পাঞ্জাবের কোন্ কোন্ এলাকা কোন্ দেশভুক্ত হচ্ছে তা এ তারিখেই প্রথম ঘোষিত হয়। এর আগে ১৪ ও ১৫ আগস্ট কেবল দু'দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে আগে থেকেই স্থির ছিল যে, মুসলিম ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারতভুক্ত হবে। ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদে ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের পতাকা এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ খুলনায় ১৫ আগস্ট ভারতের পতাকা উত্তোলন করা হয়, যা ছিল মারাত্মক ভুল। এই ভুলের পিছনে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের বিলম্বিত ঘোষণাই ছিল মূল কারণ। কেননা বিভাজনের প্রশ্নে রোয়েদাদের মুসলিম-অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়াও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা হয়েছিল।

দেশভাগ কালে ভারতের অন্য সব প্রদেশ প্রায় অখণ্ডভাবে ভারত ও পাকিস্তান ভুক্ত হলেও বাংলা ও পাঞ্জাবকে ব্যবচ্ছেদ করে উভয় দেশের সাথে সংযুক্ত করা হয়। বৃটিশ আইনবিশারদ স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বাধীন বাংলা ও পাঞ্জাব বাউন্ডারি কমিশনের উপর এই বিভাজনের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং সময় দেয়া হয় মাত্র পাঁচ সপ্তাহ। কাজটি খুবই জটিল এবং অপ্রিয় ছিল। কেননা উভয় প্রদেশে ধর্মভিত্তিক বসতি এমন সুবিন্যস্ত ছিল না যে সহজ কোনো রেখা দ্বারা তার বিভাজন সম্ভব। তারপরও ছিল নানাবিধ জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন, যেমন–হিন্দু প্রধান কলকাতার হিন্টারল্যান্ড ছিল মুসলিম প্রধান পূর্ববাংলা। আবার কলকাতা বন্দরের নাব্যতা নির্ভরশীল ছিল মুসলিম প্রধান মুর্শিদাবাদ দিয়ে প্রবাহিত নদনদীর উপর। এমন অজস্র প্রশ্ন কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে, পাঞ্জাবের বিভাজন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার র‍্যাডক্লিফ কলকাতার প্রকাশ্য অধিবেশনে অংশ নিতে পারেননি এবং কমিশনের ভারতীয় সদস্যবৃন্দ–মুসলিম লীগ সমর্থিত বিচারপতি সালেহ মোঃ আকরাম ও এস এ রহমান এবং কংগ্রেস সমর্থিত বিচারপতি বি কে মুখার্জী ও সি সি বিশ্বাস ধর্মীয় ও দলীয় বিশ্বাসের কারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে অভিন্ন সিদ্ধান্ত দিতে অপারগ ছিলেন। ফলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার চাপে স্যার র‍্যাডক্লিফের উপর। র‍্যাডক্লিফ পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করতে সমর্থ ছিলেন। তিনি শর্ত দেন যে, সীমানা বিভাজন সংক্রান্ত তাঁর সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত এবং তাঁর ভারত ত্যাগের পূর্বে তাঁর রায় প্রকাশ করা যাবে না। জিন্নাহ, নেহেরু এবং ভারতের বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন

তৎকালীন পরিস্থিতির আলোকে এসব শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হন।

স্যার র‍্যাডক্লিফ পরবর্তীতে দলিলপত্র, যুক্তিতর্ক এবং কমিশনের সদস্যবৃন্দের ব্যাখ্যাসমূহ বিশ্লেষণ করে এককভাবে বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণ চূড়ান্ত করেন এবং ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদের নিকট হস্তান্তরের জন্য রায়ের দুই কপি ১৩ আগস্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে প্রদান করেন। অর্থাৎ এই তারিখে চূড়ান্ত হয়ে যায় খুলনা, মুর্শিদাবাদ, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর, মন্টোগোমারী প্রভৃতি জেলা কোন্ দেশভুক্ত হবে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন উক্ত রায়ের কপি নেহেরু ও লিয়াকতের নিকট হস্তান্তর করেন স্যার র‍্যাডক্লিফের ভারত ত্যাগ এবং স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ-উৎসব শেষ হওয়ার পর। র‍্যাডক্লিফ অ্যাওয়ার্ড জনসমক্ষে প্রকাশিত হয় ১৭ আগস্ট। বিপত্তি ঘটে এখানেই। অ্যাওয়ার্ড জানা না থাকায়, দেশ বিভাজনের মূলসূত্র অনুযায়ী স্বাধীনতা দিবসে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ খুলনায় ভারতীয় পতাকা এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করা হয়। অথচ এ সকল এলাকার ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিবর্তে স্যার র‍্যাডক্লিফ ভিন্ন যুক্তিতে খুলনাকে পাকিস্তান এবং মুর্শিদাবাদকে ভারতভুক্ত করেন। সাধারণ ধারণার বাইরে এই সিদ্ধান্ত এবং এর বিলম্ব প্রকাশকে কেন্দ্র করে সে সময় খুলনায় ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের মতো একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। খুলনাকে শেষ মুহূর্তে ভারত থেকে ছিনিয়ে আনার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব দাবি করে বসেন খুলনার জনৈক মুসলিম লীগ নেতা এবং তার পারিষদবৃন্দের কল্যাণে সে দাবি এমনভাবে পল্লবিত হয় যে, কথাটা অনেকেই প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, ফেরদাউস ভাই সম্পর্কে লিখতে যেয়ে খুলনার পাকিস্তানভুক্তি প্রসঙ্গের অবতারণা এ কারণেই যে, একটি ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে প্রচলিত এমন একটি ভুল ধারণা অপনোদনের অভিপ্রায় ফেরদাউস ভাই নিজেও পোষণ করতেন। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী ঋজু একজন মানুষ। বৃটিশ আমল থেকেই রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের কর্মী। দেশভাগের সেই ক্রান্তিকালে অনেক কিছু নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখেছেন, অনেক কিছুর সাথে নিজেও যুক্ত ছিলেন। যেমন, খুলনার পাকিস্তানভুক্তি দাবির পক্ষে যুক্তি ও দলিলপত্রসমূহ বাউন্ডারি কমিশনের নিকট দাখিলের জন্য খুলনা মুসলিম লীগের যে প্রতিনিধি দলটি কলকাতায় গিয়েছিল, তিনিও সে দলের সাথে ছিলেন। সে সময় বঙ্গীয় মুসলিম লীগ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে প্রগতিশীল অংশে এবং খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে রক্ষণশীল অংশে বিভক্ত ছিল। খান আব্দুস সবুরসহ খুলনার বহু নেতাই তখন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন প্রগতিশীল অংশের সাথে যুক্ত ছিলেন। ফেরদাউস ভাইও ছিলেন এই অংশে। পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে '৪৭-এর মার্চ-এপ্রিলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্তবাংলার স্বাধীনতা এবং পরবর্তীতে কলকাতার পাকিস্তানভুক্তির দাবিতে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। ফলে ভিতরে ভিতরে তিনি এবং তাঁর গ্রুপ মুসলিম লীগ প্রধান মোহম্মদ আলী জিন্নার বিরাগভাজন হন। তাঁর প্রতি জিন্নাহ সাহেবের বীতস্পৃহ ভাব শেষদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। যার ফলে পার্টিশন সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের হাতে উল্লেখযোগ্য কোনো দায়িত্ব দেননি।

বাংলা বিভাজন সংক্রান্ত বাউন্ডারি কমিশনে পাকিস্তানের পক্ষে সওয়াল-জবাবের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো অভিজ্ঞ আইনজীবীকে পাশ কাটিয়ে হামিদুল হক চৌধুরী ও যুক্ত প্রদেশের মোঃ ওয়াসিম আলীকে নিয়োগ দেয়া হয়। ভেবে দেখুন, যেখানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী উপেক্ষিত, সেখানে তাঁর গ্রুপের মিড-লেভেলের একজন আঞ্চলিক নেতা কীভাবে পার্টিশনের গতি-প্রকৃতি নিরূপণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন?

ফেরদাউস ভাই-এর সাথে ২০০১ সালের শেষদিকে পিকচার প্যালেস ভবনে 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র অফিসে এ বিষয়ে কথা হচ্ছিল। সঠিক তথ্যের জন্য আমার প্রয়োজন ছিল একজন প্রবীণ বিদগ্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্য। ফেরদাউস ভাই ছিলেন তেমনই একজন। তিনি সে সময় বৃহত্তর খুলনার অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। '৮৯-এর সেপ্টেম্বরে তিনি যখন এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন, কেউ কেউ তখন এর মধ্যে আঞ্চলিকতার ছায়া আবিষ্কার করে 'খুলনায় খুলনা সমিতি' বলে উপহাস পর্যন্ত করেছিলেন। তাঁরা ভেবে দেখতে চাননি যে, প্রগতিশীল এই মানুষটির মধ্যে সংকীর্ণতার লেশমাত্র থাকাও যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি অন্যায়-অবিচারের সাথে আপোস করাও ছিল তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ফেরদাউস ভাই বিশ্বাস করতেন, কেবল রাজধানী ও দু'একটি এলাকার শ্রীবৃদ্ধি গোটা দেশের উন্নতির পরিচয় বহন করে না, এজন্য কম-বেশি হলেও দেশজোড়া উন্নয়ন প্রয়োজন। তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্যও ছিল তাই। সে আন্দোলনের কিছু সুফল আজ আমরা দেখি খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, রূপসা ব্রিজ, ওয়াসা প্রভৃতি স্থাপনার মধ্যে। তিনি নেই, তাঁর আরব্ধ কাজ নিয়ে খুলনাবাসীর এখনো অনেক দূর যেতে হবে।

ফেরদাউস ভাই-এর কাছে আমি খুলনার পাকিস্তানভুক্তি প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিলাম। এ সময় 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র 'যুগপূর্তি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী' উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় খুলনার উন্নয়ন প্রসঙ্গে একটি লেখার উপর স্থানীয় এক কাগজে কিছু সমালোচনা হয়। ওই লেখায় বলা হয়েছিল, অতীতে বিভিন্ন সরকারভুক্ত খুলনার মন্ত্রীরাও খুলনার জন্য বিশেষ কিছু করেননি, আইয়ুবের প্রভাবশালী যোগাযোগমন্ত্রী খান আব্দুস সবুরও খুলনার উন্নয়নে বিশেষ কোনো অবদান রাখেননি। এমনকি সে সময় পার্কের জনসভায় তিনি খুলনা-সাতক্ষীরা সড়ক নির্মাণের জনদাবি উপেক্ষা করেন এই যুক্তিতে যে–নরম মাটি, কাঁকড়া ও ইঁদুরের কারণে দক্ষিণাঞ্চলে সড়ক নির্মাণ কঠিন, তারা বরং নদীপথের উন্নয়ন প্রচেষ্টা দেখছেন। তাঁর এই বক্তব্য যে কতখানি অসার ছিল তা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এ লেখার সমালোচনা প্রসঙ্গে কাগজটিতে খুলনার পাকিস্তানভুক্তিতে খান আব্দুস সবুরের ব্যক্তিগত অবদানের গালগল্প ফলাও করে তুলে ধরা হয়। সৌভাগ্যক্রমে, খুলনার পাকিস্তানভুক্তি প্রসঙ্গে আমি আগেও পড়েছিলাম, তথাপি বাস্তব তথ্যের জন্য সে সময়কার একজন প্রত্যক্ষ কর্মী ফেরদাউস ভাই-এর অভিজ্ঞতা জানা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ফেরদাউস ভাই-এর বক্তব্য ছিল ইতিহাসাশ্রয়ী এবং যথেষ্ট তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, প্রথমে আমাদের জানতে হবে কাজটি কত বড় মাপের ছিল, তারপর বুঝতে হবে সেই '৪৭-এ সবুর সাহেব তত বড় মাপের নেতা ছিলেন কিনা? সে সময় জিন্নাহ,

নেহেরু এবং কাছাকাছি পর্যায়ের কিছু নেতাই কেবল স্যার র‍্যাডক্লিফের সাথে দেখা করার সুযোগ পেতেন। এমনকি বাউন্ডারি কমিশনের দেশীয় সদস্যদের সাথেও সবুর সাহেবের পর্যায়ের নেতারা দেখা করার সুযোগ পাননি। তদুপরি সবুর সাহেব কলকাতার চাকরি ছেড়ে খুলনায় রাজনীতিতে সক্রিয় হন ৪০ দশকের মাঝামাঝিতে এবং ১৯৪৬ সালে খুলনা থেকে মুসলিম লীগের পক্ষে এমএলএ নির্বাচিত হন। তবে এর আগে খুলনার মুসলমানদের প্রয়োজনে তিনি সবসময় শক্ত হাতে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং মূলত একজন ফুটবল সংগঠক হিসেবে অধিক পরিচিত ছিলেন। '৪৭-এর মাঝামাঝি যখন বাউন্ডারি কমিশন বিভিন্ন এলাকার পক্ষ থেকে স্মারকলিপি, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি আহ্বান করে, সবুর সাহেব তখন ফুটবল খেলা উপলক্ষে কলকাতায় ছিলেন। জনাব আব্দুল মজিদ, দেলদার আহমদ, আব্দুল জলীল প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তখন প্রাজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তা সৈয়দ আব্দুল হালিমের সহায়তায় খুলনার পাকিস্তানভুক্তির পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি, তথ্য ও দলিলপত্র সমন্বিত দীর্ঘ স্মারকলিপি প্রস্তুত করে একটি প্রতিনিধি দলসহ কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করেন। এই কর্মযজ্ঞে ফেরদাউস ভাই সেচ বিভাগের প্রকৌশলীদের সহায়তায় মুসলিম প্রধান এলাকা চিহ্নিত খুলনার ম্যাপ প্রস্তুতের দায়িত্বে ছিলেন যা স্মারকলিপির সাথে সংযুক্ত করা হয়। এসব কর্মকাণ্ডে জনাব আব্দুস সবুর ছিলেন না। তিনি কলকাতা থেকেই বেলভেডিয়ার হাউসে খুলনার প্রতিনিধি দলের সহগামী হন। তিনি ভালো বাগ্মী ছিলেন, কিন্তু সীমানা কমিশনের সামনে তাঁর কথা বলার সুযোগ ছিল না। মুসলিম লীগের পক্ষে নিয়োজিত উকিলরাই পাকিস্তানের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। খুলনার পক্ষে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকও সওয়াল-জবাবে অংশ নিয়েছিলেন। শুনানির জন্য বাউন্ডারি কমিশনের প্রকাশ্য অধিবেশন বসেছিল কলকাতায় বেলভেডিয়ার হাউসে ১৬ থেকে ২৪ জুলাই। উল্লেখ্য যে, খুলনার ভারতভুক্তির দাবিতে একইভাবে কংগ্রেস প্রতিনিধি দলও কলকাতায় গিয়েছিলেন।

কমিশনকে ব্যস্ততার মধ্যে সীমানা নির্ধারণের জটিল কাজ সম্পন্ন করতে হয়, কেননা তাদের হাতে এক মাস সময়ও ছিল না। কমিশনকে পাশাপাশি অবস্থিত মুসলিম-অমুসলিম অঞ্চলের ভিত্তিতে সীমানা নির্ধারণের জন্য বলা হয় এবং ওই সাথে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিবেচনারও নির্দেশ দেয়া হয়। যেহেতু বিভিন্ন দলের মধ্যে মতপার্থক্য প্রকট ছিল এবং বহুক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এলাকা বিভাজনের মতো সন্তোষজনক প্রাকৃতিক সীমানা ছিল না, সেহেতু কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশন কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের জবাবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত টানার চেষ্টা করেন। খুলনার ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন ছিল, যশোর যে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত তার বাইরে অন্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে খুলনার সুবিধা-অসুবিধা কতটুকু?

খুলনা ছিল মার্জিনালি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু ভারতভুক্ত হলে খুলনা একটি বিচ্ছিন্ন পকেটে পরিণত হতো, কেননা উত্তরের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ যশোরের উপর দিয়ে রেল-যোগাযোগ ছাড়া সে সময় খুলনার সাথে কলকাতা বা পশ্চিম বাংলার বিকল্প যোগাযোগ ছিল না। সুন্দরবন এবং অজস্র নদনদীর কারণে সীমান্তবর্তী সাতক্ষীরা মহকুমা দিয়েও তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। তদুপরি সাতক্ষীরা ছিল বিপুলভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ

যার ভারতভুক্তি অযৌক্তিক হতো। পাশাপাশি বিবেচিত হয়েছিল একটি রাষ্ট্রের (পূর্ববাংলার) জন্য আবশ্যিক বনভূমির চাহিদার প্রশ্ন। এসব বিচার-বিবেচনা করেই স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ যথার্থভাবে খুলনাকে পাকিস্তানভুক্ত করার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, ১৭ আগস্টের আগে সবুর সাহেবতো বটেই, খোদ বাউন্ডারি কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও এ রায় সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন না। ফলে খুলনার ভারতভুক্তি পাল্টে দিয়ে, ১৭ আগস্ট তাকে পাকিস্তানভুক্ত করার জন্য আঞ্চলিক নেতা বিশেষের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের দাবি যেমন অবান্তর তেমনই হাস্যকর। আসলে এ কৃতিত্ব স্যার র‍্যাডক্লিফের এবং বাউন্ডারি কমিশনকে উপযুক্ত তথ্য যোগানোর জন্য খুলনার তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের।

এসব ঐতিহাসিক তথ্য। তথাপি সবুর সাহেবের পক্ষে এ ধরনের দাবি কীভাবে প্রচার পেয়েছিল তা জানতে চাইলে, ফেরদাউস ভাই খুবই চিত্তাকর্ষক তথ্য দেন। তিনি বলেন, সবুর সাহেব, মজিদ সাহেব তখন খুলনা মুসলিম লীগের সভাপতি ও সম্পাদক। ভারতভুক্ত খুলনায় তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে শহীদ সাহেবের সাথে আলোচনার জন্য তাঁরা তখনো কলকাতায় ছিলেন। এর মধ্যে ১৭ আগস্ট রেডিওতে খুলনার পাকিস্তানভুক্তি ঘোষিত হয়। এ অবস্থায় কালবিলম্ব না করে তাঁরা ট্রেন যোগে খুলনায় চলে আসেন। এদিকে ১৭ আগস্ট খুলনার চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরদিন ঈদ সত্ত্বেও মুসলমানরা বিমূঢ় অবস্থায় ছিলেন। খুব কম মুসলমানের ঘরে তখন রেডিও ছিল, কিন্তু রেডিও খোলার উৎসাহ কারো ছিল না। পক্ষান্তরে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা নেতৃবৃন্দ রেডিও খুলে হতবাক হয়ে যান, তাঁরা সংবাদটি প্রকাশ করেন নি। খুলনাবাসী মূলত ট্রেনযাত্রীদের আনন্দ-উল্লাস থেকেই সংবাদটি প্রথম জানতে পারে। একই ট্রেনে সবুর সাহেব, মজিদ সাহেবরাও ছিলেন। স্বভাবতই প্রচার হয়ে যায় যে, তাঁরাই কলকাতায় থেকে দেন-দরবার করে খুলনাকে ছিনিয়ে এনেছেন। ফেরদাউস ভাই বলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে, দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে তাঁরা এই ভুল প্রচারকে নিরুৎসাহিত করেননি। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বে দেউলিয়াপনা এমনই যে, মিথ্যা ও অসংগত কৃতিত্ব বয়ে বেড়ানোর মতো লজ্জাকর ব্যাপারকেও আমরা গৌরবের মনে করি। ফেরদাউস ভাই-এর কথা শুনতে শুনতে আমি আমাদের আর এক দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার কথা ভাবছিলাম–'৭১-এর স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে সেই একই ইতিহাসের কী আশ্চর্য পুনরাবৃত্তিই না আমাদের দেখতে হচ্ছে।

তথ্যসূত্র : 'যুগান্তর' পত্রিকা ১৯ আগস্ট, ১৯৪৭ (মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর), 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট'–ল্যারি কলিন্স ও দোমিনিক লাপিয়ের (অনুবাদ–রবিশেখর সেনগুপ্ত), 'দ্য লাস্ট ডেজ অব বৃটিশ রাজ'–লিওনার্ড মোসলে (অনবুাদ–মোয়াজ্জেম হোসেন), 'শহর খুলনার আদি-পর্ব'–আবুল কালাম সামসুদ্দিন, 'খুলনা শহরের ইতিকথা'–মীর আমীর আলী।

মনোয়ার আলী : সাবেক ছাত্রনেতা ও সংস্কৃতি কর্মী

কাজী ওয়াহিদুজ্জামান

আবু মহম্মদ ফেরদাউস : স্মৃতির পাতায় অম্লান যে নাম

ফেরদাউস ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৬২ সালে। পাকিস্তানের 'লৌহমানব' নামে পরিচিতিপ্রাপ্ত সামরিক-স্বৈরাচারী আইয়ুব শাসনের সূর্য তখন মধ্য গগনে। আজকের বাংলাদেশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ তখন ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে উঠছে। প্রস্তুতি চলছে কুখ্যাত শরিফ কমিশনের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের। সে সময় আমি দৌলতপুর বি এল কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ২য় বর্ষের ছাত্র। বামপন্থি দলগুলো নিষিদ্ধ থাকায় সে সময় বামপন্থিরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি'র ব্যানারে সংগঠিত হচ্ছিলেন। সামরিক শাসকের পেশির জোরে প্রকাশ্যে ছাত্ররাজনীতি তখন নিষিদ্ধপ্রায়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' তখন প্রকাশ্যে সংগঠিত হতে না পেরে গোপনে 'সাংস্কৃতিক সংসদ' নামে সংগঠিত হচ্ছে। একজন উৎসাহী ছাত্র হিসেবে আমি সে সময় এই সাংস্কৃতিক সংসদের সঙ্গে যুক্ত হই। আর এ সূত্রে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ি।

১৯৬২ সালের এক দিনে সে সময় সাংস্কৃতিক সংসদের অন্যতম সংগঠক মিয়া সাদেকুর রহমানের সঙ্গে দৌলতপুর বিএল কলেজ থেকে খুলনা শহরে আসি। সাদেক ভাই আমাকে নিয়ে যান বিখ্যাত 'তৃপ্তিনিলয়'-এ। তৃপ্তিনিলয় তখন ছিল বাম সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মিলনকেন্দ্র বা আড্ডাস্থল। এই তৃপ্তিনিলয়ে সেদিন আমার পরিচয় হয় এ্যাড. আব্দুল জব্বার, আবু মহম্মদ ফেরদাউস, এসএমএ জলিল, নূরুল ইসলাম, শান্তিরঞ্জন ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে। তৃপ্তিনিলয়ের অনেকেই ফেরদাউস ভাইকে দাদা বলে ডাকতেন। সেদিন থেকে আমিও দাদা বলে ডাকা শুরু করলাম। তারপর তার সঙ্গে আমার বৈবাহিকসূত্রে আত্মীয়তা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক শুভানুধ্যায়ীর গভীর সম্পর্কের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি যে, ফেরদাউস ভাইয়ের রাজনীতির শুরু কিন্তু মুসলিম ছাত্র লীগ দিয়ে। কিন্তু পরবর্তীতে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক চেতনার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে তিনি প্রথমে গণতন্ত্রী দল এবং পরে ঐ দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি–ন্যাপ-এ বিলুপ্ত হয়ে গেলে ন্যাপের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ফেরদাউস ভাই তখন অবিভক্ত ন্যাপের খুলনা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি। দেশজুড়ে আইয়ুব শাহীর শাসন আর সেদিনের খুলনাতে তখন মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুরের একচ্ছত্র আধিপত্য। সবুর খানের সেই একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরোধিতা করে অতি অল্প দু'একটি কণ্ঠ সেদিন খুলনাতে উচ্চকিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রথম কণ্ঠটি ছিল মরহুম আব্দুল জব্বারের আর তারপরেই ছিলেন ফেরদাউস

ভাই। সেদিন সবুর খানের সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করতে যেয়ে তাঁরা নানা নির্যাতন ও অত্যাচারের মোকাবিলা করেছিলেন–যা আর এক ইতিহাস।

প্রথম পরিচয়ের দিনই ফেরদাউস ভাই আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন তৃপ্তিনিলয়ের পাশে তাঁর নিজের দোকান 'মডার্ন বুক ডিপো'য়। বেশ অনেক সময় কথা হলো প্রথম সাক্ষাতেই। সমসাময়িক ছাত্ররাজনীতি, আন্দোলনের ধারা, কৌশল ইত্যাদি নিয়ে বেশ দীর্ঘ আলাপচারিতা। এই আলাপচারিতা থেকে সেদিন একটি জিনিস আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে সাহায্য করেছিল তা হচ্ছে রাজনৈতিক বিষয়ে ফেরদাউস ভাইয়ের অগাধ জ্ঞান। বাম রাজনীতি না করলেও বামপন্থি আন্দোলন ও কমিউনিস্ট সাহিত্যে তাঁর ছিল যথেষ্ট দখল–যা সেদিনের অনেক বামপন্থি নেতারও ছিল না। ফেরদাউস ভাইয়ের সঙ্গে সেদিনের প্রথম আলাপেই আমি তাঁর বিশেষ ভক্ত ও অনুরাগী হয়ে পড়ি। এরপর রাজনৈতিক বা নানা কারণে প্রায়ই খুলনা যেতে হতো। ফেরদাউস ভাই-এর সঙ্গে দেখা হলেই তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলতেন, জানতে চাইতেন আন্দোলনের বিভিন্ন তথ্য। প্রয়োজন মনে করলে পরামর্শ দিতেন। তাঁর এসব পরামর্শ সেদিন আমাদের ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ছিল।

১৯৬২ সালের পরিচয়ের পরে আত্মীয়তা বা রাজনৈতিক-সামাজিক প্রয়োজনে তাঁর কাছে প্রায়ই আমার যেতে হয়েছে। তিনি আমার স্ত্রী সাহারা বানু শিরির নিকটাত্মীয়। আমার স্ত্রী কিশোরী বয়স থেকেই ফেরদাউস ভাইদের পরিবারে বড় হয়েছেন। সেই সূত্রে তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে।

সম্ভবত ১৯৬৩ সালের ঘটনা। সবুর খান তখন পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী। খুলনায় তার দোর্দণ্ড প্রতাপ। মন্ত্রী তার দলের লোকজন নিয়ে কর্মীসভা করবে। আজকের সার্কিট হাউস মাঠ, পূর্বে যা হেলিপ্যাড ছিল তার পাশে। আমরা ছাত্ররা পরিকল্পনা করলাম সবুর খানকে কর্মীসভা করতে দেওয়া হবে না। বিএল কলেজ থেকে শত শত ছাত্র ট্রেনে চড়ে এসে সভাস্থলে ভাঙচুর চালাল। কিন্তু পরে পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জে আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ি। সেদিন আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে দেখেছি গভীর মমতা আর স্নেহ নিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে। আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা ছাত্র আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম।

তিনি অন্তরের গভীর থেকে বিশ্বাস করতেন যে, ছাত্র-যুবকরাই আগামী দিনে দেশ ও জাতির কর্ণধার। তাই রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার পাশাপাশি ছাত্র-যুবাদের ক্রীড়াচর্চায় তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। সে কারণে তাঁর অনুপ্রেরণায় খুলনা শহরে 'হিরোজ' নামে একটি স্পোর্টস ক্লাব গড়ে উঠেছিল। ক্লাবটি খুলনা জেলা ফুটবল লীগে একবার চ্যাম্পিয়ন হলেও পরবর্তীতে অবশ্য অর্থাভাবে সেটি আর সক্রিয় থাকেনি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন ন্যাপ (মোজাফ্ফর)-এর নেতা। আর আমরা তখন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক হিসেবে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই)'র তত্ত্বাবধানে কলকাতার 'লেনিন স্কুলে' থাকতেন। আর আমরা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)'র তত্ত্বাবধানে পাশের 'কলাকার' ভবনে

থাকতাম। আসা-যাওয়ার পথে প্রায়ই দেখা হতো ফেরদাউস ভাইয়ের সঙ্গে। এ ছাড়া প্রায়ই দেখা করতে যেতাম তাঁর সঙ্গে। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করা এবং যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতো সে সময়। উনি বলতেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে না–আমরা জিতবই। সে সময় তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার বেশির ভাগই সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল যা তাঁর প্রজ্ঞার স্বাক্ষর বহন করে।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমি লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হই। আর উনি তখনো ন্যাপ (মোজাফ্ফর)-এ। সে সময় দেখা হলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতো। উনি কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান রাখতেন তা সেদিনের অনেক কমিউনিস্ট নেতারও ছিল না। পাকিস্তান আমলে তৎকালীন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা শচীন বোস, অমল সেন, রতন সেন, বিষ্ণু চ্যাটার্জী প্রমুখের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর সম্পর্ক।

তিনি ছিলেন একজন নীরব সংগঠক, সহানুভূতিশীল, দায়িত্ববান মানুষ। পাজামার সঙ্গে ফুলহাতা শার্ট পরে পায়ে হেঁটেই চলাফেরা করতেন বেশির ভাগ সময়। আজকের রাজনৈতিক নেতাদের মতো নিজস্ব প্রচারণা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। ন্যাপ অবিভক্ত থাকার সময় তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন। কিন্তু খুব কমই ওনাকে মঞ্চে দেখা যেত। অথচ সে সময়ের যেকোনো সভার পেছনে ফেরদাউস ভাই, নূরুল ইসলাম ও শান্তিরঞ্জন ঘোষের ছিল মুখ্য ভূমিকা। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ন্যাপের একাংশের (মোজাফ্ফর ন্যাপ) খুলনা জেলা সভাপতি হিসেবে তাঁকে বহুবার মঞ্চে বক্তৃতা করতে দেখেছি। বার্ধক্যের ভারে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর নিলেও খুলনাবাসীর পশ্চাৎপদতার গ্লানি ঘুচাতে তাঁরই নেতৃত্বে 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' গড়ে ওঠে। এই কমিটি খুলনার গণমানুষের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে দলনিরপেক্ষ একটি প্লাটফর্ম হিসেবে ইতোমধ্যেই স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। এই কমিটির আন্দোলনের ফসল–খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খানজাহান আলী সেতুসহ অন্যান্য অর্জনগুলোর সুফল আমরা আজ ভোগ করছি। আর এর পেছনে যে মানুষটির অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন–আবু মহম্মদ ফেরদাউস।

ফেরদাউস ভাইকে নিয়ে এই স্বল্প পরিসরে লেখা দুঃসাধ্য। কিন্তু তারপরও যে মানুষটি চিরকাল স্মৃতিতে অম্লান থাকবেন তাঁর কথা কিছুটা স্মরণ না করে থাকা সম্ভব হলো না। অন্তরের সেই তাগিদ থেকেই এই লেখা। পরিশেষে বলতে চাই সহজ একটি কথা–আমাদের দেশে ফেরদাউস ভাই-এর মতো প্রজ্ঞাবান, নিঃস্বার্থ, পরোপকারী এবং সৎ নেতৃত্ব যদি আরো কিছু বেশি থাকত তাহলে এদেশের ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লেখা হতো।

কাজী ওয়াহিদুজ্জামান : সাবেক ছাত্রনেতা ও নির্বাহী প্রধান, নবলোক

পঞ্চানন বিশ্বাস

স্মৃতির পাতায় ফেরদাউস ভাই

মহাবিশ্বের গতি পরিক্রমায় মানবজীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এর মধ্যে কিছু কিছু মানুষের কথা স্মৃতির পাতা থেকে মুছে যায় না। অমলিন থাকে মনের আয়নায়। ফেরদাউস ভাই ছিলেন এমন একজন মানুষ যার কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারিনি, পারবও না।

আর শুধু আমার কথা বলি কেন? বৃহত্তর খুলনার উন্নয়নকামী, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল মানুষেরা তাঁকে মনের মণিকোঠায় জায়গা করে দিয়েছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যার পর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণবিসর্জন ও মা-বোনদের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও শোষণহীন সমাজ গড়ার পরিবর্তে দেশে সামরিক শাসন, স্বৈরশাসন এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চালু হওয়ার ফলশ্রুতিতে এ দেশের সমন্বিত ও সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয়েছে। যার জন্য এককালের প্রাণচঞ্চল শিল্পনগরী আজ মৃতপ্রায়। বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্পকারখানার শ্রমিকেরা তাদের বকেয়া বেতন পাওয়ার জন্য কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি এমনকি গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে আত্মাহুতি দেয়ার চেষ্টাও করেছে।

দীর্ঘদিন যাবৎ যারা ক্ষমতায় ছিলেন তাদের উন্নয়নের থেকে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, আত্মীয়, পরিবার-পরিজন ও নিজস্ব ক্যাডারদের স্বার্থরক্ষা এবং ভোটের আশায় নিজ এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নের নামে সরকারি অর্থের অসম বণ্টনের কারণে আমাদের ছোট দেশটিও দু-তিন ভাগে ভাগ হয়ে পড়েছে যার ফলে আজ খুলনার এই অন্তিম দশা।

এ শুধু আমার কথা নয়, ২০০৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের দৈনিক প্রথম আলোতে প্রথম পাতায় 'আঞ্চলিক বৈষম্যে বাংলাদেশ বিভক্ত। পূর্বাঞ্চল এগিয়ে, পশ্চিমাঞ্চল পিছিয়ে' শিরোনামে তথ্যভিত্তিক খবর প্রকাশিত হয়েছে। গত ৫ বছরে খুলনায় দারিদ্র্যের হার বেড়েছে দশমিক ৬ শতাংশ, অপর পক্ষে ঢাকায় দারিদ্র্যের হার কমেছে ১৪.৭ শতাংশ, চট্টগ্রামে কমেছে ১১.৭ শতাংশে এবং সিলেটে কমেছে ৮.৬ শতাংশ। খুলনায় ৪৫.৭ শতাংশ মানুষ দরিদ্র। উন্নত এলাকা থেকে দারিদ্র্য এখানে বেশি।

এই বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য খুলনার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজ, ছাত্র-শিক্ষকসহ অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ৮০'র দশক থেকেই সোচ্চার হয়ে ১৯৮৯ সালে বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠন করে সর্বসম্মতিক্রমে দলীয় রাজনৈতিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বের মানুষ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর খুলনা জেলা শাখার সভাপতি জনাব আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে সভাপতি নির্বাচিত করেন।

ফেরদাউস ভাই-এর নেতৃত্বে গ্যাস সরবরাহ, অচল মংলা বন্দরকে সচল করা,

মাওয়াতে ব্রিজ নির্মাণ, শিল্পকারখানায় পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরুর পরিবেশ সৃষ্টি, বিমানবন্দর স্থাপনের যৌক্তিক দাবিগুলো রাজনৈতিক কারণে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের শীর্ষ নেতারা মেনে না নিলেও আন্দোলনের ফসল হিসেবে খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, রূপসা ব্রিজ, মংলা-মাওয়া সড়ক আমরা পেয়েছি। শেখ নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালের কাজ চলছে।

সংস্কৃত শ্লোকে পড়েছি 'কীর্তির্যস্য সঃ জীবতি'। খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ কেডিএ-র মূল্যবান প্লটে কমিটির নিজস্ব কার্যালয় হচ্ছে যার সঙ্গে আজীবন সভাপতি ফেরদাউস ভাইসহ খুলনা গড়ার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নেতারা চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

দিনক্ষণ তারিখ সঠিক মনে নেই তবে ষাটের দশকের মাঝামাঝি কার্তিক মাসে ফেরদাউস ভাইয়ের চিঠি পেলাম। তিনি ন্যাপ নেতা এ্যাডভোকেট জব্বার সাহেবকে নিয়ে কপিলমুনিগামী লঞ্চে করে সকাল সাতটায় মাইলমারা বাজারে নামবেন এবং কৃষক সমিতির নেতাদের সঙ্গে নিয়ে মাইলমারা, মাইটভাঙ্গাসহ আরও দু-একটি গ্রামে জনসংযোগ করবেন। তখন বটিয়াঘাটা ইউনিয়নে ওয়াপদা বাঁধ হয়নি, রাস্তাঘাট প্রায় ছিল না বললেই চলে। খাল-নালে ব্রিজের স্থলে কাঠ ও বাঁশের সাকো। আমি এসবের বর্ণনা দিলে ফেরদাউস ভাই বললেন গ্রামের চেহারা তাঁর ভালো জানা আছে এবং চলার অভ্যাস আছে।

তাই আমি দ্বিতীয়বার কিছু না বলে নির্দিষ্ট দিনে ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে উঠে বটিয়াঘাটা বাজার লঞ্চঘাটে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। সকাল সাড়ে ছ'টায় লঞ্চের আগমন ঘটলে আমি খানিকটা সংশয় নিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ল দুই নেতা লঞ্চের ছাদে দাঁড়িয়ে বোধ হয় আমাকে দেখার চেষ্টা করছেন। নেতাদের সঙ্গে লঞ্চে করে মাইলমারায় সকাল সাতটায় নেমে উপস্থিত কৃষক নেতাদের নিয়ে মাইলমারা, মাইটভাঙ্গা ও বলাবুনিয়া এ তিনটি বড় গ্রামে আমরা জনসংযোগ করলাম। রাস্তায় কোথাও জল, কোথাও কাদা এমনকি বাঁশের সাকো জলের মধ্যে থাকলে জুতো খুলে ঢিলা পাজামা হাঁটুর উপরে তুলে যেতে হলেও, পায়ে হেঁটে কৃষকদের সঙ্গে দেখা করার কর্মসূচি বন্ধ হয়নি।

চলার পথে এক ফাঁকে ফেরদাউস ভাই পাজামা উপরে তুলে উরুতে নিজে একটা ইনজেক্শন পুশ্ করলেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ডায়াবেটিস-এর জন্য প্রতিদিন ওইভাবে তিনি ইনসুলিন নিতে অভ্যস্ত এবং আজীবন তাঁকে নিতে হবে। আমার অজ্ঞতা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। আমি নিজে নিজে কাউকে ইনজেক্শন নিতে এর পূর্বে দেখিনি।

দুপুরের সব্জি-ভাত মাইলমারার কৃষক নেতা শ্রীনিতাই বৈরাগীর বাড়িতে বিকেলে খেয়ে নেতারা সন্ধ্যায় আবার লঞ্চে করে খুলনায় রওনা হলেন।

ষাটের দশকে আমরা যখন ছাত্র তখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, মওলানা ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, কমরেড মনি সিং-এর মতো জাতীয় নেতারাও ছোট ছোট জনসভা করার জন্য এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে পায়ে হেঁটে ছুটে গেছেন। দূরের পথ হলে অবশ্য নৌকো, গরুর গাড়ি, লঞ্চ বা স্টিমারে করে যেতেন। কিন্তু পাজেরো বা মূল্যবান গাড়ির কোনো চাহিদা তাঁদের ছিল না। তাঁরা জনগণের নিকট যেতেন তাঁদের সংগঠিত করতে। আবার নেতাদের ডাক পেলে ওই সংগঠিত জনতা পোটলায় চিড়ে-গুড়

বেঁধে নিয়ে খুলনা বা ঢাকায় রওনা হতেন। মিটিং সমাবেশে তখন প্রচুর টাকা খরচ করে লোক আনার প্রয়োজন পড়ত না।

আজ দিন বদল হয়েছে। জনতাকে সংগঠিত করার দায়িত্ব অনেকাংশে পড়েছে মিডিয়াগুলোর ওপর। যারা পুরনো রাজনীতির ধারায় চলতে চাচ্ছে তারা প্রতিযোগিতার দৌড়ে ক্রমশ পিছনের কাতারে চলে যাচ্ছে।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস সাহেব রাজনীতির জন্য অসাম্প্রদায়িকতা ও গণতন্ত্রের লেবাস পরতেন না, তিনি ব্যক্তিগতভাবে অসাম্প্রদায়িক ও গণতন্ত্রমনা একজন মানবদরদি ছিলেন।

১৯৬৪ সালের ৩রা জানুয়ারি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আমাকে খুলনায় অর্ধমৃত করে আহত করা হয়। আমার করুণাবস্থা দেখে আমার কলেজের অনেক হিন্দু সহপাঠী দেশত্যাগ করে। সেদিন খুলনাতে ফেরদাউস ভাইসহ অনেক নেতাই দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন যা খুলনাবাসী আজও মনে রেখেছেন। সেদিন আমাকে দেখতে গিয়ে ডাঃ অতুলদা, রতন সেন, ফেরদাউস ভাই ও রব ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, পশুশক্তির নিকট হেরে গিয়ে দেশত্যাগ করবে নাকি? আমি বলেছিলাম দেশে থেকেই অপশক্তির সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাব। জানি না এখন স্বাধীন দেশে দাঁড়িয়ে সে লড়াই-এর পরিণাম কী হবে?

তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না। সংকটে সমস্যায় ছিলেন সহকর্মীদের ভাই, বন্ধু ও অভিভাবক। ১৯৬৩-৬৪ সালে স্বৈরাচার আইয়ুব শাহীর পতন, কুখ্যাত হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের আন্দোলনে তৎকালীন সারা পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল উদ্বেলিত। আর ওই সময়ে খুলনার বি এল কলেজ ছিল আন্দোলনের সূতিকাগার। তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল আবু সাঈদ চৌধুরী কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দকে ডেকে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, আমাদের পড়ায় মন নেই। আমরা আন্দোলনের নামে কলেজের লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট করছি। তাই পুনরায় আন্দোলন করলে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হবে। আমার বাবা কলেজ থেকে ফিরে আমাকে ডেকে বলেন, 'রাজনীতি করা বন্ধ করে ডিভিশন নিয়ে বিএস-সি পাশ করার চেষ্টা কর। প্রিন্সিপ্যাল পুনরায় অভিযোগ করলে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেব।'

এর কিছুদিন পর আন্দোলনের গতি বাড়ল। বি এল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের অপসারণের দাবিও রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে যুক্ত হলো। ফলে যা হবার তাই হলো। ছাত্রনেতা আনু ভাই, এরফান ভাই, দীদার বখত, কাজী ওহিদুজ্জামান, পাবলার রুকু, খুলনার মোহিত ও আমাকেসহ ১০ জনকে ফোর্স টিসি দেওয়া হলো। খবর পেলাম শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের অভিযোগে মামলা দেওয়া হয়েছে। রাত্রে গ্রেপ্তার এড়াতে কলেজের হোস্টেল ছেড়ে পাবলার ছাত্র মেসে চলে যাই। সেখানে ২/১ দিন থাকি। আমার খবর শুনে বাবা যেমন রাগান্বিত তেমনি মনঃকষ্টে অধীর হয়ে পড়েছেন। তাই, ভয়ে বাড়ি যেতে পারছি না। আজকালের ছাত্রনেতাদের মতো গাড়ি-বাড়ি বা নগদ টাকা তখন আমাদের নিকট থাকা তো দূরের কথা খাওয়ার পয়সাও পকেটে থাকত না। তাই হতাশা আস্তে আস্তে আমাকে গ্রাস করছিল। হঠাৎ টানেলের শেষ প্রান্তে আলোর রশ্মির মতো আমার পরিচিত একটি ছাত্র আমাকে

জানায় যে, ফেরদাউস সাহেব খুলনায় যেতে বলেছেন। আমি যথাস্থানে গেলে তিনি জানালেন আমার বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। রাগ একটু প্রশমিত হয়েছে। যার ফলে বাড়ি ফেরার মতো পরিবেশ হয়েছে। সমমনা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে অবৈধ ফোর্স টিসি ইস্যুর বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা দায়ের করার জন্য প্রস্তুতি চলছে। ফেরদাউস ভাই-এর অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও প্রিন্সিপ্যালের দাখিলকৃত মামলায় জামিন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে কিন্তু তাঁর সময়ের অভাব হয়নি।

স্মৃতিচারণ করতে গেলে অনেক ঘটনাই মনের জানালায় উঁকিঝুঁকি দেয়। সব কথা বলা না গেলেও শুধু বলব তিনি ছিলেন সৎ, নির্লোভ, উদার গণতন্ত্রমনা একজন গণমানুষের নেতা। তাঁর মতো নেতার রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন বড় অভাব। নতুন প্রজন্মের মধ্য থেকে খুলনায় আরও ফেরদাউস ভাইয়ের মতো নেতার জন্ম হোক এই কামনা করে প্রয়াত নেতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি।

পঞ্চানন বিশ্বাস : সাবেক এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতা

সুশান্ত সরকার

সেইখানে তার আসনপাতা

খুলনা শহরে একডাকের নাম ফেরদাউস সাহেব–আবু মহম্মদ ফেরদাউস, আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কে ফেরদাউস ভাই, ক'দিন আগে আমাদের মায়া ত্যাগ করলেন, তাঁর এত সাধের খুলনা ছেড়ে যাত্রা করেছেন অসীম পরপারে। যে খুলনার প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনে, দাবি আদায়ের সংগ্রামে, উন্নয়নের মিছিলে যে লোকটা আমৃত্যু কাটিয়ে গেছেন তাঁর মৃত্যুর পর সেই খুলনায় তাঁকে নিয়ে তেমন কোনো সরব-সোচ্চার হাহুতাশ অন্তত আমার কানে আসেনি, এমনকি এই আমি তাঁর মৃত্যুর পর মামুলি দায়িত্ব সারা তাঁর মৃতদেহ দেখতে তাঁর ঐ আমতলার বাসভবনে যাওয়া ছাড়া আর তো কোনো দায় পালন করিনি। তাও বা কেন? এ কারণে ফেরদাউস ভাইয়ের সাথে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা অনেক দিন আগে। সময়ের প্রবহমানতায় তাও প্রায় শিথিল হয়ে এসেছিল। তবু দেখা সাক্ষাতে কুশল বিনিময় বা পারিবারিক খোঁজখবর নেয়া এই পর্যন্ত। আর সেই সম্পর্ক ধরে বেশ খানিকটা স্মৃতিচারণ করা সম্ভব। তা সেই সত্তরের দশকের মাঝামাঝি মির্জাপুরের ইউসুফ রো-এ মরহুম আলী হাফেজ সাহেবের বাড়িতে একই সমতলে আমরা অর্থাৎ ফেরদাউস ভাই-এর পরিবার ও আমার পরিবারসহ বাস করেছি বেশ কিছু দিন–একটা লম্বা সময়। সে সময় ফেরদাউস ভাই-এর ছেলে লালন একেবারেই শিশু, লাভলী একটু বড়। তারপর তিনি আমতলায় বাড়ি করে উঠে গেলেন, আমার যাযাবর জীবনের শেষ আজও হয়নি। ক্রমান্বয়ে সম্পর্ক শিথিল হয়েছে, লাভলীর দুর্ঘটনা আমাদের পারিবারিকভাবে শোকাহত করেছে, লালন কত বড় হয়েছে আমি হয়তো দেখলে চিনতেই পারব না। থাক সে কথা। কেননা ফেরদাউস ভাই-এর মতো পরিচিত স্বজনদের প্রয়াণে কিছু বলতে বা লিখতে গেলে স্মৃতি এসে ভিড় করে তাকে এড়িয়ে যাওয়াও খুব কঠিন। যে প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে যাই।

কোনো মহৎ মানুষের মৃত্যুর পর আমরা কতকগুলো মামুলি দায় সারি, তারপর এক সময় সে লোকটা স্মৃতির পাতা থেকে বেমালুম হারিয়ে যায়। গুণীজনেরা বলেছেন–যার সুকৃতি আছে তিনি মানুষের মনে জায়গা করে নেন। আর সে জায়গা করার জন্যেই রচিত হয় ইতিহাস–আমি প্রচণ্ড হতাশার ভেতর দিয়েও একটা প্রচণ্ড আশার আলো দেখতে পাচ্ছি– ফেরদাউস ভাই-এর সুকৃতি হয়তো সত্যি তাঁকে মানুষের মনে জায়গা করে দেবে। হয়তো বা কোনো অনাগত ভাবী কালের খুলনার বাসিন্দা একদিন কালো কালির শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বন্দি হয়ে থাকা আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে আবিষ্কার করবে। সে জানবে সারা জীবন এই একটি লোক, যে তাঁর নীতির সাথে আপোস করেনি, রাজনীতির বিকিকিনিতে নিজেকে বিক্রি করে দেয়নি, সাধারণ মানুষের সপক্ষে খুলনার উন্নয়নে সংগ্রাম করে গেছেন দৃঢ় প্রত্যয়ে রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে, প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মের পুরোধা হিসেবে

অবদান রেখে গেছেন। আবু মহম্মদ ফেরদাউস ভাইকে নিয়ে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে–এ কেবল আনন্দের নয়–আত্মতৃপ্তির। আর মনে হচ্ছে প্রকৃতই ফেরদাউস ভাই সুকৃতির অধিকারী ছিলেন।

আমরা স্মারকগ্রন্থে লিখতে গিয়ে প্রায়শই স্মৃতিকথা লিখি। বস্তুত তার বাইরে যাওয়াও কঠিন, আমারই তো মনে হচ্ছে যা লিখব তা স্মৃতিকথার বাইরে কিছুই হবে না। অন্তত তার ভেতর দিয়ে তাঁর কর্ম, জীবন, আদর্শ, প্রত্যয়, নিষ্ঠা যতটুকু বেরিয়ে আসে তাইতো একটি মহৎ মানুষের জীবন ইতিহাসের উপাদান হিসেবে কাজ করবে। আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর নামটা প্রথম শুনি আমার পিতৃতুল্য শিক্ষক জনাব মনসুর আহমদ-এর কাছে যখন আমি চাকরি ব্যপদেশে স্থায়ীভাবে খুলনায় চলে আসি সেই ৬৯-এর তুমুল গণআন্দোলনের মধ্যে। ফেরদাউস ভাই তখন মোজাফফর ন্যাপের প্রথম সারির নেতা হিসেবে খুলনার আন্দোলনের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ও কর্মী। আমার শিক্ষক ভাষাসৈনিক জনাব মনসুর আহমদ বাগেরহাটের ভাষা আন্দোলনের অগ্রপথিক কর্মী, যার পরিণতিতে তাঁকে কারাবাস করতে হয়েছিল, পরবর্তীতে তিনিও রাজনীতিগতভাবে প্রগতিশীল আন্দোলনের কর্মী ও নেতা হিসেবে মোজাফফর ন্যাপের বাগেরহাটের নেতা। আমি খুলনা এলে তিনি ফেরদাউস ভাই-এর সাথে পরিচিত হতে বলেন এবং যথারীতি ফেরদাউস ভাই-এর সাথে বয়সের বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পরিচয় ঘটে, আর সে পরিচয় ক্রমান্বয়ে এক সময়ে বসবাসের কারণে পারিবারিক রূপ নেয়।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে খুলনাতে যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল সেই ভাষা আন্দোলনে আবু মহম্মদ ফেরদাউস অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিক আদর্শ এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে। এ্যাডভোকেট আব্দুল হালিমের ভাষায় বলা যায় : 'পাকছার জমিনে হিন্দুর ভাষা বাংলার কোন রকম আবদার সহ্য করা হবে না। দেশের কোথাও যাতে কোন রূপ আন্দোলন দানা বাঁধতে না পারে এ মর্মে ঢাকা থেকে কড়া নির্দেশ পাঠানো হয়। খুলনার এসপি মহীউদ্দীন সাহেব বাছা বাছা কয়েকজন ছাত্রনেতাদের ডেকে বসলেন তার অফিসে। ছাত্রদের মধ্যে তাহমীদ উদ্দীন, জিল্লুর রহমান, মমিন উদ্দীন আহমেদ ও এস এম আমজাদ হোসেন এবং মুসলিম লীগের যুবনেতা আবু মহম্মদ ফেরদাউস, প্রভৃতি উপস্থিত হলেন। হিন্দু ও কমিউনিস্ট ছাত্রদের ইচ্ছা করেই ডাকা হয়নি। মহীউদ্দিন সাহেব ছাত্রনেতাদের বুঝালেন, সদ্য স্বাধীন শিশু পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য হিন্দুরা বিশেষ করে কমিউনিস্টরা এসব ধ্বংসাত্মক কাজে নেমেছে, ওরা তোমাদের ভুল বুঝাচ্ছে। তোমরা এসব পথ ছাড়ো।' (খুলনার ভাষা আন্দোলন : আব্দুল হালিম, ১৯৮৫, পৃঃ ৪–৫)

বস্তুত মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারায় পাকিস্তান রাষ্ট্র কেবল মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠা করার পরপরই পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাভাষী মানুষগুলোকে বাংলা ভাষা ভুলিয়ে রাতারাতি মুসলমান করার যে পাঁয়তারা চালিয়েছিল এবং বাঙালি মুসলিম লীগ নেতারাও সেই দলে নেচে উঠেছিলেন–সেই মুসলিম লীগের যুবনেতা আবু মহম্মদ ফেরদাউস তাঁর ব্যক্তিক আদর্শ এবং বাঙালিত্ব বোধে রাজনৈতিক আদর্শকে হেলায় তুচ্ছ করে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯৪৮ পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে যে ভাষা আন্দোলন পরিপূর্ণ রূপ পায়, খুলনায় সেই আন্দোলনে যাঁরা প্রথম কাতারে

লড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আবু মহম্মদ ফেরদাউস ছিলেন অন্যতম অগ্রণী নেতা।

১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যখন রাজপথে রক্ত ঢেলে দেয়, সে খবর খুলনায় পৌঁছায় ২২শে ফেব্রুয়ারি। ঢাকা থেকে সরকার ঢাকায় গুলি হওয়া ও কিছু ছাত্র-জনতার মৃত্যুজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে জেলা কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়। ওই সংবাদ আসে ওয়ারলেসের মাধ্যমে এবং একজন ওয়ারলেস কর্মীর মাধ্যমে খুলনা শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এ সংবাদ পাওয়ার পর যুবনেতা ও কর্মী আবু মহম্মদ ফেরদাউস, এস এম এ জলিল প্রমুখ প্রগতিশীল ছাত্রনেতা আঃ গফুরের আস্তানায় হাজির হয়ে ভাষা আন্দোলনে গফুর সাহেবের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন। ওদের দেখাদেখি দল ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। বিশেষ করে মুসলিম ছাত্রলীগ তথা মুসলিম লীগের একজন নামকরা প্রতিষ্ঠিত যুবনেতা আবু মহম্মদ ফেরদাউস এসে আন্দোলনের গতিকে সজীব করে তোলেন (পুরাঘটিত বর্তমান : মুহাম্মদ আব্দুল হালিম, ১৯৮৬, পৃঃ ১৯–২০)। কেবল আন্দোলনকে সজীব করাই নয় তাকে পূর্ণমাত্রায় গতিশীল করে তোলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ বিকেলে প্রাক্তন গান্ধী পার্ক তৎকালীন জিন্না পার্কে বিশাল জনসভা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ওই জনসভাই ছিল খুলনায় ক্ষমতাশীল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য বৃহত্তর জনসভা। সে সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রগতিশীল ছাত্রনেতা আব্দুল গফুর আর প্রধান বক্তা ছিলেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস। ওই দিন রাতে ঢাকা থেকে খবর আসে জেলায় ও মহকুমায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ভাষা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার। খুলনাতে যে এগার জনকে নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তার প্রথম নম্বর সদস্য ছিলেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস–আমাদের ফেরদাউস ভাই। '২৫শে ফেব্রুয়ারি খুলনা শহরে হরতাল পালিত হয় এবং বিকেলে গান্ধী পার্কে যে বিশাল জনসভা হয়, তাতে বক্তৃতা করেন–আব্দুল গফুর, আবু মহম্মদ ফেরদাউস, আলতাফ খান প্রমুখ।' (প্রাগুক্ত : মুহাম্মদ আব্দুল হালিম, পৃঃ ২২)

ভাষা আন্দোলন একটু থিতিয়ে এলে, সরকার আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়। তার সাথে মুসলিম লীগ কর্মীরা যোগ দিয়ে ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের হয়রানি করতে শুরু করে এবং ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করে, তার প্রথম আসামী ছিলেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস। কিন্তু যে ঘটনাটিকে অবলম্বন করে এই দেশদ্রোহিতার ফৌজদারি মামলা করা হয়, সেই ঘটনার আগে আবু মহম্মদ ফেরদাউস যুব লীগের সভায় যোগ দেয়ার জন্যে 'ওরিয়েন্ট এয়ার ওয়েজ'-এ ঢাকায় যাওয়া এবং তার টিকেট তাঁর কাছে থাকার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে তিনি জামিন পান। অতঃপর মুসলিম লীগ বাহিনীর শায়েস্তা করার শেষ অস্ত্র ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ তাঁকে মুসলিম লীগের গুণ্ডাবাহিনী হকিস্টিক দিয়ে শ্রীশনগর গেটের কাছে রাস্তায় ফেলে রাখে। প্রায় মাসাধিক কাল তিনি হাসপাতালে ছিলেন। সুস্থ হবার পর আর সন্ধ্যার পর বাইরে বের হতেন না।

ওই প্রহৃত হবার ঘটনার পর তিনি মুসলিম লীগ থেকে প্রায় সরে যান এবং ১৯৫৪ সালে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে ফেরদাউস ভাই যুক্তফ্রন্টে যোগ দেন এবং ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) গঠিত হলে ফেরদাউস

ভাই ন্যাপে যোগ দেন এবং খুলনার অপর একজন সুকৃতিবান ব্যক্তি ভাষাসৈনিক আবুল কালাম সামসুদ্দিন সুনুভাইও ন্যাপে যোগ দেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অতঃপর ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ন্যাপ বিভক্ত হলে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপে যোগ না দিয়ে ফেরদাউস ভাই, সুনু ভাই এরা মোজাফফর ন্যাপে যোগ দেন এবং জীবদ্দশা পর্যন্ত দল পরিবর্তন করেননি। আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত ক্ষমতালোভ এবং প্রতিনিয়ত আদর্শ বদলের রাজনীতি। কিন্তু ফেরদাউস ভাই কখনোই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনে মোজাফফর ন্যাপ যে অংশগ্রহণ করেছিল খুলনার আন্দোলনে ফেরদাউস ভাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। খুলনায় যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল–ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) তিনটি দল থেকে তিন জন করে সদস্য নিয়ে–এই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনে ফেরদাউস ভাই-এর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

১৯৭১ পরবর্তী সময়ে মোজাফফর ন্যাপের রাজনৈতিক তৎপরতা স্তিমিত হয়ে এলেও ফেরদাউস ভাই কোনো প্রলোভনে বা কোনো মোহ বা লোভে দলত্যাগ করেননি। একবার কুঁড়েঘর মার্কা নিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনও করেছিলেন। কিন্তু তিনি সব সময়ে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন মুক্তিকামী গণআন্দোলনের সপক্ষে। যেখানেই আন্দোলন গণমানুষের দাবির সপক্ষে সেখানেই ফেরদাউস ভাই। অর্থ, সম্পদ, পদমর্যাদা কোনো কিছুর প্রতি তাঁর মোহ ছিল না, একেবারেই সাধারণ জীবন যাপন করে গেছেন নিজেকে অক্লেশে মানুষের জন্যে। শেষের দিকে এসে দেহ রোগজীর্ণ হয়ে পড়েছিল, ডায়াবেটিস আক্রান্ত হয়ে ক্ষীণবল হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু খুলনার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের মিছিলে তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির সভাপতি হিসেবে এই জীর্ণ দেহে কী লড়াইটা না করে গেলেন। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, রূপসা সেতু নির্মাণ আন্দোলন, খুলনার মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তিনি অকুতোভয় লড়াকু সৈনিকের মতো লড়ে গেলেন মৃত্যু পর্যন্ত।

মানুষ একদিন চলে যায়, তাঁর সুকৃতি, তাঁর কর্ম , জনদরদ এবং নির্মোহ সততা তাঁকে ইতিহাসে রূপান্তরিত করে, আর সেই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা একটা জাতিকে পথ দেখান। আবু মহম্মদ ফেরদাউস আজ ইতিহাস, তাঁর জীবনের সুকৃতির ইতিহাস খুলনাবাসীকে তথা সারা জাতিকে আগামীর গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পথ দেখাবে। সেখানেই আসন পাতা আবু মহম্মদ ফেরদাউসের। আমার মতো একজন অকিঞ্চিৎকর ব্যক্তি তাকে নিয়ে দু-চার কথা লিখলাম কি লিখলাম না তাতে কিছু এসে যায় না, সে বেঁচে থাকবে খুলনার মানুষের হৃদয়ে–আগামী খুলনার ইতিহাসে।

সুশান্ত সরকার : শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক

মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান

স্মরণীয় এক মানুষ

১৩ই ডিসেম্বর ২০০৬, ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৩ বুধবার সকালে যখন আমি কলেজে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির কর্মী খালেক শিকদার আমাকে মোবাইল ফোনে জানাল যে ফেরদাউস ভাই অর্থাৎ আবু মহম্মদ ফেরদাউস আর নেই, ভোর ৫.৩০ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। খবরটা শুনে ভীষণভাবে ব্যথিত হয়েছিলাম। কেননা তাঁর মৃত্যুতে আমরা এই বঞ্চিত খুলনার মানুষ আমাদের এক অভিভাবককে হারালাম। আর সেই সঙ্গে কিছু সময়ের জন্য ফিরে গেলাম বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের প্রথম দিকে যখন আমি দৌলতপুর ব্রজলাল (বি এল) কলেজের ছাত্র। আমাদের বি এল কলেজ তখন বেসরকারি কলেজ এবং সেই সময়ে এটিই ছিল খুলনা অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার প্রধানতম শিক্ষা নিকেতন। ওই সময়ের সব কথা মনে না থাকলেও ফেরদাউস ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ের ঘটনা আজও স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। তৎকালীন সময়ে খুলনার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ফেরদাউস ভাইয়ের নাম আমি অনেক আগে থেকেই শুনেছিলাম। এখন ঠিক মনে নেই ওই সময়ে কে একজন আমাকে খবর দিয়েছিলেন যে ফেরদাউস ভাই আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। এ কথা শুনে কেবল অবাকই হইনি বরং অনেক কিছুই ভেবেছিলাম যে অত বড় এক মানুষ, আমাকে কেন দেখা করতে বললেন! আমি অনেক ভেবে দু'দিন পর কলেজ থেকে ফিরে বিকেল বেলায় তৃপ্তিনিলয়ে (খুলনা থানার পশ্চিম দিকে তৎকালীন সময়ের খুব পরিচিত ও জমজমাট রেস্তোরাঁ) গেলাম ফেরদাউস ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখি চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলে চুটিয়ে দেশ-বিদেশের রাজনীতির আলোচনা চলছে বিভিন্ন টেবিলে। এর মধ্যে ফেরদাউস ভাইকে দেখে তাঁর কাছে গিয়ে আমি সালাম দিয়ে আমার পরিচয় দিলাম। তখনই তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে তৃপ্তিনিলয় থেকে বেরিয়ে এলেন এবং এম নূরুল ইসলামকেও (দাদু ভাই) সঙ্গে নিলেন। এরপর আমাদের নিয়ে গেলেন পাশেই তাঁর ইস্টার্ন প্রেস অফিসে (অতীতের ডেরা হোটেল)। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা আমার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নিলেন এবং অনেক কথাই বললেন। সব কথা আজ আর মনে নেই তবে মূল কথা ছিল সেই সময়ের দেশের রাজনীতি, ছাত্ররাজনীতি ও স্থানীয় সমস্যা বিষয়ক। আমি খুবই মনোযোগ সহকারে ফেরদাউস ভাই ও দাদু ভাইয়ের কথা শুনলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি ধর্মবিবর্জিত বামপন্থি রাজনীতি (তখনকার সময়ের ধারণা) পছন্দ করতাম না বলেই তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারিনি। তবে দার্শনিক ভলতেয়ারের ভাষায় বলব, 'আমি তোমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতে পারি কিন্তু জীবন দিয়ে হলেও তোমার কথা বলার অধিকারকে রক্ষা করব'। তাই সমাজ ও মানুষের কল্যাণে

তাঁদের শোষণমুক্ত রাজনীতির দর্শন ও চিন্তাধারাকে আজও আমি সম্মান করি।

এরপর বহুবার বহুভাবে ফেরদাউস ভাইয়ের সান্নিধ্য লাভ করেছি। তাঁকে যতই দেখেছি ততই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়েছে। কেননা তাঁকে আমি দেখেছি খুব যুক্তিবাদী এক মানুষ হিসেবে। কখনও অন্যকে অসম্মান করে কথা বলতে শুনিনি। তাঁর একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকলেও দলমতনির্বিশেষে সবার সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি ছিল এবং সকলকেই তিনি সম্ভবমতো সাহায্য করতেন। একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মানবিক দিকটি ছিল খুব প্রবল। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি এক রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি। বি এল কলেজে ছাত্র থাকা অবস্থাতেই মুসলিম ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বৃটিশ শাসনামলের পরাধীন ভারতকে মুক্ত করতে স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি অংশ নেন। প্রথম জীবনে এক যুগ তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করে ১৯৫৩ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রী দলে যোগ দেন এবং এ দলের খুলনার নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। পরবর্তীতে মার্কসবাদ ও রুশ অর্থনীতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কমিউনিজম-এর আদর্শ গ্রহণ করেন। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবে কমিউনিস্ট বলশেভিকদের বিজয় অর্জিত হয় এবং পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে চীন বিপ্লবের পর কমিউনিস্টদের শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। এমনিভাবে দেশে দেশে কমিউনিজমের প্রসার ঘটতে থাকে। স্তালিনের মৃত্যুর পর কমিউনিস্ট বিশ্বে বিপর্যয় শুরু হয়। ১৯৬৫—৬৬ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভের আমলে রাশিয়া ও চীনের মধ্যে কমিউনিজমের মূলনীতি নিয়ে ভীষণ মতানৈক্য দেখা দেয়ায় চূড়ান্ত পর্যায়ে কমিউনিস্ট শিবিরে বিভাজন হয়ে যায়।

আমাদের দেশে তৎকালীন সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হয়। পরবর্তীতে আদর্শগত কারণে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কমিউনিস্ট শিবিরে বিভাজন (চীনপন্থি ও রাশিয়াপন্থি) দেখা দিলে আমাদের দেশেও তার ঢেউ এসে লাগে যার ফলশ্রুতিতে সেই সময়ে আমাদের দেশে বাম রাজনীতিতেও বিভক্তি সৃষ্টি হয়। ফলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিও (ন্যাপ) দ্বিখণ্ডিত হয়। একটি রুশপন্থি অপরটি চীনপন্থি। আমাদের দেশে চীনপন্থি ন্যাপের নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আর রুশপন্থি ন্যাপের নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ। খুলনায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাপে তৎকালীন নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এ্যাডঃ আব্দুল জব্বার, এম নূরুল ইসলাম (দাদু ভাই), এস এম এ জলিল, মাহমুদ আলম খান মুকু, গাজী শহীদুল্লাহ প্রমুখ। ফেরদাউস ভাই রুশপন্থি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে থাকেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবদুল গফুর, এ কে সামসুদ্দিন (সুনু), আব্দুর রব, দীন মোহাম্মদ প্রমুখ। তাঁর গৌরবোজ্জ্বল রাজনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে ন্যাপ (রুশপন্থি) রাজনীতির সঙ্গে থেকে খুলনায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বেও ছিলেন। কালের প্রবাহে অনেক কিছু বদলালেও তিনি বদলাননি। ক্ষমতার রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না বলেই সুযোগের সন্ধানে কখনও দল বদলের কথা কল্পনাতেও

আনেননি। এক কথায় বলা যায় তিনি সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ভাবনার উর্ধ্বে ছিলেন আর সে কারণেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসে কখনও ক্ষমতায় গিয়ে কোনো পদ গ্রহণ করেননি।

ফেরদাউস ভাই সারাজীবনই সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন। কখনও প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন আবার কখনও পরোক্ষভাবে আন্দোলনে থেকেছেন। এই সংগ্রামী মানুষটি আমাদের '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান এই মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনসংগ্রামের ফলেই তো অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। জন্ম নিয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

দেশ কেবল স্বাধীন হলেই তো হবে না। দেশকে তো গড়তে হবে, উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তবেই তো সার্থক হবে, অর্থবহ হবে আমাদের স্বাধীনতা। তাই তিনি দেশ গড়ার কাজে অবদান রেখেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ফেরদাউস ভাই খুলনাকে খুব ভালোবাসতেন তাই তাঁর সারাজীবনের কর্মস্থল ছিল খুলনা। খুলনার ইতিহাস খুব প্রাচীন না হলেও নির্দ্বিধায় বলা যায় এর ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস। প্রকৃতির অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ খুলনা দেশ ও জাতিকে অকাতরে দিয়েছে অনেক কিন্তু বার বার বঞ্চিত হয়েছে। কোনো সরকারের আমলেই খুলনা পায়নি তার ন্যায্য পাওনা।

তাইতো ফেরদাউস ভাই জীবনের শেষ প্রান্তে এসে খুলনার প্রতি সকল বঞ্চনা দূর করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সোচ্চার হয়েছিলেন। এ কথা দিবালোকের মতোই সত্য যে, স্বাধীনতার পর দেশের দক্ষিণাঞ্চল এই খুলনায় হয়নি তেমন কিছুই, উন্নয়নের কোনো স্পর্শই পড়েনি কোনো আমলে। খুলনার জন্যে ছিল কেবল গালভরা কিছু কথা–খুলনা বিভাগীয় শহর, খুলনা শিল্পনগরী, খুলনা বন্দরনগরী, খুলনা বাণিজ্যনগরী ইত্যাদি। সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে খুলনা 'বিভাগ নামের মোড়কে একটি উপজেলার মতো শহর', 'শিল্পের ধ্বংসস্তূপের উপর তথাকথিত শিল্পনগরী', 'জাহাজবিহীন কিছু নৌকা আর লঞ্চের বন্দরনগরী' ছাড়া কিছুই নয়। আবার 'খুলনা' মহানগরীর নামে এমন মহাপ্রহসন আর কোথাও আছে কি-না আমার জানা নেই। খুলনার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে খুলনার অর্থনীতি হয়ে পড়েছে বিধ্বস্ত, চক্রান্তের বেড়াজালে মংলা পোর্টটি বিলুপ্তির প্রহর গুনছে, আজও খুলনায় আসেনি গ্যাস পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ বিভ্রাট জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে প্রতিনিয়ত তবু বিদ্যুৎ সংকট উত্তরণের কোনোই উদ্যোগ নেই, বিশুদ্ধ পানির সংকট রয়েছে, খুলনা-ঢাকা মহাসড়কে পদ্মায় স্বপ্নের মাওয়া ব্রিজ এখনও স্বপ্নই রয়ে গেছে যা প্রমাণ করে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সঙ্গে খুলনার যোগাযোগের বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষিত, খুলনায় নেই কোনো বিমানবন্দর, অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, খুলনা রেলওয়ে স্টেশনের করুণ অবস্থা তবুও সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেই, হাসপাতালের দুরবস্থা দেখলে মনে হয় খুলনার মানুষ এখনও সুচিকিৎসা লাভের যোগ্যতা অর্জন করেনি, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গরূপে গড়ার কোনো পরিকল্পনাই পরিলক্ষিত হয় না, শিক্ষাঙ্গনগুলোও দুর্দশাগ্রস্ত, বাংলাদেশ টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি থাকলেও আজও সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোনো দৃষ্টি নেই, তাতে মনে হয় খুলনার মানুষ

সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার অযোগ্য, মশাদের স্বর্গরাজ্য এই খুলনা তবু এর প্রতিকারের কোনো উদ্যোগ নেই। এমতাবস্থায় নিজেদের অধিকার আদায়ে খুলনার প্রতিটি মানুষের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা যেন সকলেই অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলাম। বিগত সময়ে খুলনার অনেক নেতাই সরকারের উচ্চ পদে ছিলেন কিন্তু খুলনার অধিকার আদায়ের প্রশ্নে পাওয়া যায়নি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের আপোসহীন কোনো নেতা। তাই দলমতনির্বিশেষে সবার গ্রহণযোগ্য এক মানুষ হিসেবে ফেরদাউস ভাই স্বাধীনতা লাভের ১৮ বছর পর ১৯৮৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে অবহেলিত ও বঞ্চিত খুলনার অধিকার আদায়ের জন্যে আন্দোলন করতে গড়ে তুললেন এক সংগঠন–'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। আমি মনে করি এটাই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, কেন যেন আমরা খুলনার মানুষ এক হয়ে এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমাদের পাওনাটুকুও চাইতে পারিনি। কিন্তু ফেরদাউস ভাই বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠন করে আমাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এটি খুলনার অগ্রযাত্রায় একটি মাইলফলক।

পরিশেষে বলব মিষ্টভাষী সহজ ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ ফেরদাউস ভাই ছিলেন অসাধারণ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাইতো তিনি খুলনা উন্নয়নের আন্দোলনে অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন আর পেয়েছিলেন সবার সমর্থন। যখন খুলনা একটু একটু করে পেতে শুরু করল তখনই তাঁকে আমরা হারালাম। আজ তাই তাঁর শূন্যতা আমাদেরকে ভীষণভাবে ব্যথিত করছে। যেকোনো মূল্যে তাঁর এই সৃষ্ট ঐক্যকে ধরে রেখে আমাদের সামনের পথে এগুতে হবে অর্থাৎ খুলনার মানুষের একটি মাত্র অঙ্গীকার হতে হবে–খুলনা গড়তে আমরা এক ও অভিন্ন। আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপোসহীনভাবে খুলনার উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে সফল হব এই প্রত্যাশাই করি।

মোহাম্মদ মাজহারুল হান্নান : অধ্যক্ষ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ,
খুলনা ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শেখ গাউস মিয়া

একজন সংগ্রামী মানুষের কথা বলছি

খুলনাবাসীর গর্ব করার মতো একজন মানুষ ছিলেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। সে লড়াই-ই তিনি করে গেছেন সারাজীবন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল খুলনার ফুলতলা উপজেলার আটরা গ্রামে। পিতা মোঃ একরাম উদ্দিন আহমদ, মাতা মেহেরউন্নিসা খাতুন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত শিক্ষানুরাগী মানুষ। সরকারি চাকরি করতেন। পদ স্কুল ইন্সপেক্টর। পিতার চাকরিসূত্রে ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে মাতুলালয়ে ১৯২৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। ওই সময় ঢাকা শহরে তাঁদের বাসা ছিল নারিন্দায়। তাঁর পড়াশুনার সূত্রপাত হয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। এরপর পিতার বদলির কারণে তাঁরা চলে আসেন বরিশালে। ১৯৪১ সালে বরিশাল জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। বি এল কলেজ থেকে আইএস-সি পরীক্ষা দেন ১৯৪৩ সালে। সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়ার কারণে তাঁর আর পড়াশুনা এগোয়নি। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন একজন রাজনীতি সচেতন মানুষ। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। ১৯৪১ সালে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয় মুসলিম লীগে যোগদানের মধ্য দিয়ে। বিভাগপূর্ব যুগে মুসলিম লীগ ছিল মুসলমানদের সবচেয়ে প্রিয় সংগঠন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতারাও তখন মুসলিম লীগ করতেন। নিজস্ব পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মুসলিম লীগের পতাকাতলে মুসলমানরা তখন ঐক্যবদ্ধ। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৭, এ ছয় বছর তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তখন তিনি ছিলেন মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী। এ সময় মুসলিম ছাত্রলীগ খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তখন তাঁর সাথে এ দল করতেন খুলনার তৈয়েবুর রহমান (মিঠাখালী), তৈয়েবুর রহমান (মোল্লাহাট), আবুল হাশেম, আফিল উদ্দিন, আফছার উদ্দিন প্রমুখ। দু'তৈয়েবুর রহমানের একজন ছিলেন খুলনা জেলা কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং অন্যজন ছিলেন সেক্রেটারি। তখন খুলনা মুসলিম লীগের প্রধান নেতা খান এ সবুর। অন্যান্য ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁরাও সবুরের সাথে বিভিন্ন স্থানে মিটিং করে বেড়াতেন।

দেশবিভাগের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম লীগ অতি দ্রুত তার জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার মুসলমানেরা শোষণমুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল তা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। তখন সারাদেশের মতো এখানেও মুসলিম লীগের মধ্যে দুটি উপদলের অস্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে। এক দলের নেতৃত্বে ছিলেন খান এ সবুর। তাঁর সাথে ছিলেন এস এম এ মজিদ, খান সাহেব সুলতান আহমদ, ডাঃ আবুল

কাসেম, হাজী মোতাহার উদ্দিন প্রমুখ। এরা মূলত ছিলেন নাজিমুদ্দীন গ্রুপে। যারা তখন সোহরাওয়ার্দীকে অনুসরণ করছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ মোস্তাগাওছল হক, সরদার নকিবউদ্দিন, আফিল উদ্দিন, এ এইচ এম আলী হাফেজ, এ এফ এম আব্দুল জলীল প্রমুখ। আবু মহম্মদ ফেরদাউস ছিলেন দ্বিতীয় দলে। এরা ছিলেন অপেক্ষাকৃত উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। এক পর্যায়ে এ দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। সবুরের অনুসারীরা আফিল উদ্দিনকে পিটিয়ে আহত করে।

১৯৪৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর সাম্যবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত কিছু ব্যক্তির উদ্যোগে গঠিত হয় নতুন দল গণতান্ত্রিক যুবলীগ। এতে যে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয় তাতে ছিলেন খুলনার শেখ আব্দুল আজিজ। খুলনায় এ দলের কমিটি গঠনের জন্য আসেন বরিশালের মোঃ এবাদুল্লাহ। তিনি ছিলেন আবু মহম্মদ ফেরদাউসের সহপাঠী। খুলনায় কমিটি গঠিত হয় এবং আব্দুল জব্বার ও আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়। তবে সংগঠনটি বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। মুসলিম লীগ সরকার এদের ভারতের চর বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। তারপর নবপ্রতিষ্ঠিত দলের সদস্যরা কলকাতায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় যুব সম্মেলনে যোগ দেয়ায় সরকার আরও ক্ষেপে যায়। এতে দলটির দ্রুত বিলুপ্তি ঘটে।

১৯৫২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গণতন্ত্রী দল গঠন এ দেশের রাজনীতির ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিছু কিছু বামপন্থি নেতার উদ্যোগে এ দল গঠিত হয়। দেশবিভাগের পর পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট নেতৃত্বের হিন্দুদের অধিকাংশই দেশত্যাগ করায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা পূরণই ছিল এ দল গঠনের উদ্দেশ্য। পূর্ববাংলায় এর সভাপতি ও সম্পাদক হন যথাক্রমে হাজী মোঃ দানেশ ও মাহমুদ আলী। খুলনাতেও এর শাখা স্থাপিত হয়। শহীদ এ্যাডঃ আব্দুল জব্বারকে করা হয় গণতন্ত্রী দলের খুলনা শাখার সভাপতি। সম্পাদক হন এম এ গফুর। আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে করা হয় এর সহ-সভাপতি। তাঁদের সাথে সদস্য হিসেবে ছিলেন এম নূরুল ইসলাম, দেবেন দাস, এস এম এ জলিল প্রমুখ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে কাজ করে গণতন্ত্রী দল। এ নির্বাচন উপলক্ষে যুক্তফ্রন্টের তিন প্রধান নেতা মওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এ এলাকা সফর করেন। আবু মহম্মদ ফেরদাউসরা তাঁদের সাথে থেকে প্রচারাভিযানে অংশ নিতে থাকেন। যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে যাকে রাজনৈতিক ইতিহাসে 'ব্যালট বাক্স বিপ্লব' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। খুলনায় গণতন্ত্রী দলের টিকেটে অমুসলিম আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন দেবেন দাস। সারাদেশে গণতন্ত্রী দল যে ১৩টি আসন পায় এটি ছিল তার মধ্যে একটি।

তাঁরা ভাষা আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫২ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি খুলনায় এম এ গফুরকে আহ্বায়ক করে যে ভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় তার সদস্য ছিলেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস। অন্যরা ছিলেন এম নূরুল ইসলাম, এস এম এ জলিল, এ কে সামসুদ্দিন, মিজানুর রহিম প্রমুখ। ভাষার দাবিতে ওই সময় খুলনায় যে আন্দোলন হয় তা পরিচালনা করার কৃতিত্ব মূলত এদের প্রাপ্য। ছাত্রজনতা মিটিং করে,

মিছিল করে, গুলির সামনে দাঁড়ায়, নির্যাতন সহ্য করে, কারাগারে যায়। সন্ত্রাসীদের হাতে আবু মহম্মদ ফেরদাউসকেও আহত হতে হয়। এস এম এ জলিল ও আবুল কালাম সামসুদ্দিনও নিগ্রহের পাত্র হন। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি–ন্যাপ গঠিত হলে গণতন্ত্রী দল তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। খুলনাতেও গণতন্ত্রী দল ন্যাপের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। গণতন্ত্রী দলের অফিস ছিল এ পি সি স্কুল থেকে ধর্মসভার রাস্তায় ঢুকে ২নং বাড়িটায়। ওই বাড়িটাই তখন হয়ে যায় খুলনায় ন্যাপের অফিস। এম এ গফুর ন্যাপের সেক্রেটারি হন, আব্দুল জব্বারকে করা হয় সভাপতি। আবু মহম্মদ ফেরদাউস হন সহ-সভাপতি। খুলনায় ন্যাপকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে এদের অবদান ছিল অসামান্য। ১৯৬৭ সালে ন্যাপ বিভক্ত হয়ে গেলে তিনি মোজাফফর ন্যাপে যোগ দেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এর খুলনা জেলা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন।

তাঁর আর এক পরিচয় তিনি একজন সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা। উনসত্তরের গণআন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরপর আসে ৭০-এর নির্বাচন, বাংলায় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে যার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ অঞ্চলে একটা স্বাধীন দেশের স্বপ্ন জনগণের চোখের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আবু মহম্মদ ফেরদাউস নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। ২৫শে মার্চ গণহত্যা শুরু হয়ে গেলে খুলনাতেও তার প্রভাব পড়ে। রাজনীতিবিদরা জীবন বাঁচাতে আত্মগোপন করতে থাকেন। আবু মহম্মদ ফেরদাউস রূপসা নদী পার হয়ে বাগেরহাটের সদর থানার সুগন্ধী গ্রামে চলে যান। আশ্রয় নেন হালদার বাড়িতে। সেখানে কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার পর রাজাকাররা তাঁর সন্ধান পেয়ে যায়। তারা তাঁকে ধরার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। তখন তাঁরা ভারতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি এবং পিরোজপুরের এ্যাডঃ আলী হায়দার দু'জনে চিতলমারী থেকে নৌকায় তেরখাদা হয়ে বড়দিয়ার ভেতর দিয়ে বনগাঁ থেকে ১১ মাইল দক্ষিণের বর্ডার দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁরা কলকাতায় ওঠেন খুলনার আর এক বামপন্থি নেতা কমরেড রতন সেনের আশ্রয়ে। তাঁরা সিআইটি রোডের লেনিন স্কুলে অবস্থান করতে থাকেন। ওই সময় ২৪ পরগনার সোদপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের ভার অর্পিত হয়ে তাঁর ওপর। তাঁরা অন্যান্য বামপন্থি নেতাদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে শরণার্থীদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতেন। এ দলের নেতৃত্ব দিতেন কমরেড রতন সেন। বিজয় অর্জন পর্যন্ত তাঁদের এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে অবশ্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এভাবে তিনি সারাজীবন নানা ধরনের আন্দোলন সংগ্রামের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। সবশেষে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি অসামান্য অবদানের মধ্য দিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। যাদের অবদানের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন দেশ, নিজস্ব পতাকা তিনি সেই সূর্যসৈনিকদের একজন।

দেশ স্বাধীনের পর বয়সের কারণে রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেলেও এ আন্দোলন সংগ্রাম থেকে নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিতে পারেননি। একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাননি। শেষ জীবনে তিনি খুলনাসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

১৯৮৯ সালে বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাঁর সংগ্রামের আর এক অধ্যায়। দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর ধরে তিনি এ সংগ্রামী সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। পেয়েছেন রুমা স্মৃতি পদক, তৈয়েবুর রহমান লাইব্রেরি পদক, উন্নয়ন কমিটি পদক প্রভৃতি। সর্বোপরি তিনি পেয়েছেন এ অঞ্চলের মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা। এ কর্মময় জীবনের অবসান ঘটল ২০০৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায়।

তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। সূর্য শুধু অস্ত যায়, নেভে না। তিনি পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে পারেন তবে স্মৃতি থেকে নয়।

ড. শেখ গাউস মিয়া : শিক্ষাবিদ ও গবেষক

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণ : আবু মহম্মদ ফেরদাউস

'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'–দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য আত্মোৎসর্গের সেই যুগ কবেই শেষ হয়ে গেছে। দেশপ্রেম, মানবপ্রেম, মানবিকতা শব্দগুলি নিছকই এখন শব্দের তুবড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। শব্দগুলিকে আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি আমরা। আছে। মুখে আছে, বচনে আছে, মঞ্চে ভাষণে আছে, লেখায় প্রচারে আছে; চেতনায়, বোধে, জীবনের কোথাও এদের কোন প্রয়োগ নেই। আত্মপ্রেমে মশগুল হয়ে আছি আমরা। নার্সিসাসের গল্পটা আমরা বোধ হয় ভুলে গেছি। রাজনীতির উৎস, উপাদান দেশ এবং দেশের জনগণ। দেশ এবং দেশের মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ থেকেই রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠে। দেশপ্রেম, মানবপ্রেমের পরিবর্তে আত্মপ্রেম, অবৈধ অর্জনের স্পৃহা, ক্ষমতার লোভ আর দাপট বেমালুম ভুলিয়ে দিয়েছে রাজনীতিতে আমাদের অতীত ঐতিহ্য আর আত্মত্যাগের কথা। বিত্ত, বৈভব তুচ্ছ করে, জীবনের মায়া ত্যাগ করে নির্যাতিত, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের পাশে এসে যাঁরা দাঁড়িয়েছেন, লড়াই করেছেন, তাঁদের অবদানের কথা মন থেকে মুছে ফেলেছি আমরা। প্রাচীন মানেই এখন পুরোনো, নড়বড়ে, সেকেলে। সব ভুলে তাই উদ্দাম আধুনিকতার প্রবল জোয়ারে ভেসে চলেছি আমরা। এই আধুনিকতা আমাদের জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে সূক্ষ্ম, সুচারু, পরিশীলিত জীবনবোধের সব উপাদান।

কেউ হয়তো বলতে পারেন 'নিঃশেষে প্রাণ দান' করা ছিল একটা বিশেষ সময়ের দাবি। সময় বদলে গেছে। পাল্টে গেছে অনেক কিছু। বদলে গেলেও সময়ের কিছু দাবি থেকেই যায়। স্বাধীনতা পেলেও অর্থনৈতিক মুক্তি আমরা পাইনি। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, দুর্নীতি আজও আমাদের চারিদিক থেকে বেঁধে রেখেছে। সাতচল্লিশের পর যেমন, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের পরও এদেশের মানুষ দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা, প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ, অর্থহীন হয়ে গেছে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুরভিসন্ধির কারণে। সাধারণ মানুষ প্রাণ দিয়ে, সর্বস্ব দিয়ে ইতিহাস তৈরি করেছে।

রাজনীতির মানুষ নই আমি একথা যখন বলি আমি জানি আমি ঠিক বলি না। রাজনীতি, অর্থনীতি চেতনে, অবচেতনে, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে আমাদের। ইচ্ছে করলেও তার থেকে বাইরে যাবার ক্ষমতা নেই আমার। আমরা যারা সাতচল্লিশ কিংবা তার পরে জন্মেছি, দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধের বীভৎসতা, যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা, সব হারানোর মানসিক অবসাদ এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস একেবারে অল্পবয়স থেকে যৎসামান্য পড়েছি (পড়ার আগ্রহটা অবশ্যই বাবার তাগিদে), তারা মনের ক্যামেরায় একটা ছবি আজও ধরে রেখেছি। সেটা ওই নিঃশেষে প্রাণ উৎসর্গ

করতে পারা মানুষের ছবি। মনের মধ্যে একটা বিশ্বাস গেঁথে গেছে। আত্মবলিদানের প্রতিজ্ঞা আর প্রস্তুতি যার আছে রাজনীতি করার অধিকার কেবল তারই আছে। এইতো সেদিন আমরা কিশোর ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানের (ফাঁসির) শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করলাম। প্রীতিলতা ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। আদর্শ সংগ্রামী দৃষ্টান্তের অভাব নেই। এদেশেরই কত জমিদারপুত্র আরাম-আয়েশ, বিত্ত, বৈভব তুচ্ছ করে বিত্তহীন, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সময় বদলে গেছে বলে নেতারা এখন ঠাণ্ডা ঘরে আরাম কেদারায় বসে ওপর থেকে নিচতলার মানুষের জন্য জুতসই, মনভোলানো বাক্য বর্ষণ করে দেশনেতার দায়িত্ব পালন করেন। পরিচয় না হলেও কলকাতা গিয়ে একবার লেনিন স্কুলে প্রয়াত রণেশ দাশগুপ্তর ঘরসংসার দেখার সুযোগ হয়েছিল। তাঁকে দেখে নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছিল। আমাদের কাছের মানুষ প্রয়াত রাজনীতিবিদ রতন সেনের জীবনযাপনের দিনলিপির সাথে অনেকেই পরিচিত। দারিদ্র্য, দুর্নীতি, দুরাচারে আপাদমস্তক ডুবে থাকা এদেশে আজ কোন ত্যাগী নেতা নেই। ক্ষমতালোভী কিছু মানুষের কাছে এদেশের মানুষ জিম্মি হয়ে আছে। পারিষদ আর চাটুকারবেষ্টিত আত্মগর্বে স্ফীত রাজনীতিকদের দেখলে ঘৃণা হয়। মেধাশূন্য, ক্ষমতালোভী, অধঃপতিত ব্যক্তিচরিত্রের অধিকারী, অবৈধ উপায়ে এক প্রজন্মে অর্জিত অর্থে বনেদি বনে যাওয়া রাজনীতিক দেখতে দেখতে ঘৃণায়, ধিক্কারে মন ভরে যায়। আমাদের রাজনীতি, সমাজকাঠামোর নড়বড়ে ছবিটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। আটত্রিশ বছর পর আজও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার কথা বলতে বলতে গলা ভেঙে যায়।

রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন শুরু হয়েছে একাত্তরের পর থেকেই। সংবিধানের চারটি স্তম্ভ দুর্বল হতে হতে প্রায় ভেঙে পড়েছে। শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িকতা আর সন্ত্রাসের রাজনীতি। ক্ষমতায় যাবার জন্য অস্ত্র, অর্থ আর ধর্মকে নির্বিচারে ব্যবহার করা হচ্ছে। নোংরা রাজনীতির ঘেরাটোপে আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, এর থেকে আশু মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। একমাত্র আশা এ দেশের তরুণ সমাজ। ইতিহাসের চাকা হয়তো তারাই একদিন ঘুরিয়ে দিতে পারবে এই আশা আর বিশ্বাস নিয়েই আছি।

কিছুটা প্রাসঙ্গিকভাবেই কথাগুলি এসে গেল খুলনার সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদ আবু মহম্মদ ফেরদাউস প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে। কোন রাজনীতিবিদকে নিয়ে এটাই আমার প্রথম লেখা। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে যোগাযোগ না থাকায় খুলনার মানুষ হয়েও স্থানীয় রাজনীতিবিদদের সম্বন্ধে খুব কমই জানতাম। কয়েকটি নামের সাথে শুধু পরিচিত ছিলাম। বিষ্ণু চ্যাটার্জী, রতন সেন, এ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার, আবু মহম্মদ ফেরদাউস। কলেজে পড়ার সময় আরও একজন মানুষকে দেখেছিলাম। অধ্যাপক খালেদ রশীদ (গুরু)। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। পাবনার মানুষ। কর্মসূত্রে খুলনায় এসেছিলেন। জড়িয়ে গিয়েছিলেন খুলনার কর্মকাণ্ডের সাথে। একপর্যায়ে খুলনার সাংস্কৃতিক সংগঠন সন্দীপনেরও হাল ধরেছিলেন তিনি। কর্মজীবন, তাঁর সমগ্র জীবন তিনি উৎসর্গ করেছিলেন খুলনার মানুষের জন্য। শুনেছি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে খুলনা অঞ্চলেরই কোন এক জায়গায় যুদ্ধরত অবস্থায়

পাক বাহিনীর হাতে তিনি নিহত হন। তিনি যে রাজনীতির মানুষ কখনোই বুঝতে পারিনি। মনের ক্যামেরায় যেসব আদর্শ মানুষের ছবি ধরা ছিল তার মধ্যে তাঁকে অনায়াসেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাঁকে নিয়ে লেখার একটা তাগিদ মাঝেমধ্যেই অনুভব করি। যথেষ্ট তথ্যের অভাবে লেখা থেকে নিবৃত্ত হতে হয়।

খুলনার যে ক'জন রাজনীতিকের নাম উল্লেখ করলাম তাঁদের সবাই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অথবা আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। একমাত্র আবু মহম্মদ ফেরদাউসই পঞ্চাশ বছর ডায়াবেটিসের মতো দুরারোগ্য ব্যাধি শরীরে বহন করেও খুলনাবাসীর সেবা করে গেছেন। তাঁর পরিণতি তাঁর সহযোদ্ধাদের মতো হয়তো একই রকম হতে পারতো যদি না তিনি একাত্তরে পালিয়ে ভারতে চলে যেতেন। ভারতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

যে পরিবারে আবু মহম্মদ ফেরদাউস জন্মেছিলেন সেখানে শিক্ষা, রাজনীতি দুইই ছিল। ছিল অলাভজনক বই-এর ব্যবসা, প্রেস। এই সবকিছুর সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। নিজে পড়তে পছন্দ করতেন। দেশভাগের আগে কলেজে অধ্যয়নকালে মুসলিম ছাত্র লীগ এবং মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। যে অবাস্তব সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছিল বাঙালি মুসলিম প্রায় সকলেই তখন ছিলেন তার সমর্থক। আবু মহম্মদ ফেরদাউস হয়তো পরবর্তীকালে এই তত্ত্বের অসারতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সাথে তিনি তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।

একটা ছবি আজও আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে। খুব ছোট তখন। বাবার সাথে প্রতিদিন বিকেলে বেড়াতে যেতাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাঁ হাতে ভিক্টোরিয়া ইনফ্যান্ট স্কুল, ডান দিকে ফায়ার ব্রিগেড (কল্যাণ কুটীর, যার কোন চিহ্ন আজ আর নেই) রেখে যশোর রোডে পড়ে বাঁয়ে একটু এগিয়ে গেলেই সাদা কংক্রিটের রাস্তা, রাস্তার দু'পাশে সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠ। আমরা বলতাম ছোট মাঠ, বড় মাঠ। বিকেলে আমাদের গন্তব্য ছিল দু'পাশে খোলা মাঠের মাঝখানে কংক্রিটের রাস্তা ধরে হেঁটে সোজা জেলখানা ঘাটে যাওয়া। ডান দিকের মাঠে লাল ইটের সুন্দর ছোট একতলা বাড়ি। সার্কিট হাউস। সেটার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে ইমারত করা হয়েছে এখন। শ্রীহীন হয়ে পড়েছে সার্কিট হাউস। পাকিস্তান তখন নবীন রাষ্ট্র। জেলখানা ঘাটে না গিয়ে বাবা সেদিন মিটিং শুনতে সার্কিট হাউসের মাঠে যাবে। যথারীতি মিটিং-এও আমরা দুই ভাই-বোন বাবার সাথী হয়েছি। তখন যত্রতত্র বোমাবাজির ভয় ছিল না। মাঠে অনেক লোকের সমাগম। সার্কিট হাউসের দিকে পেছন করে মঞ্চ বাঁধা হয়েছে। মাঠে ঢুকতেই দেখি রাস্তা দিয়ে একটি মিছিল স্লোগান দিতে দিতে আসছে। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। স্লোগানটি আজও আমার কানে বাজে। মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে একজন। বাবাকে জিজ্ঞাসা করে পরে জেনেছিলাম মিছিলের নেতৃত্ব যে দিচ্ছিল তার নাম নিজাম। সে একজন অবাঙালি নামকরা বিহারি গুণ্ডা। কোন রাজনীতিবিদ নয়। সেটা সম্ভবত মুসলিম লীগের মিটিং ছিল। রাজনীতি অবচেতনে সেই থেকেই বোধ হয় আমার কাছে পরিত্যাজ্য একটি বিষয় হয়ে উঠেছিল।

সদ্য জন্ম নেওয়া পাকিস্তান তখন এদেশের সব মুসলিমের পরম আকাঙ্ক্ষার ধন।

সাম্রাজ্যবাদকে হঠিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির আবাহন। দ্বিজাতিতত্ত্বের অসারতা সাতচল্লিশে দেশভাগের শুরু থেকেই প্রমাণিত হতে শুরু করেছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের সর্বশেষ উপহার ভারত উপমহাদেশ র‌্যাডক্লিফ সাহেবের হাতের এক টানে খণ্ড খণ্ড হল। তার মাশুল এই উপমহাদেশের মানুষ আজও তিলে তিলে দিয়ে যাচ্ছে। মোহভঙ্গ হতে দেরি হয়নি এ দেশের মানুষের। স্বৈরতন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে শাসন, শোষণ, নির্যাতন, কেড়ে নেওয়া সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, –বাঙালি জাতিসত্তার বিলুপ্তি ঘটানোর পরিকল্পিত চক্রান্ত চলছিল। শোষণ, নিপীড়নে নির্যাতিত হতে হতে এদেশের মানুষ ফুঁসে উঠেছিল। মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস তাঁর বোধ এবং বিশ্বাস থেকে বুঝতে পেরেছিলেন বিভক্তি আর বিভাজনের পথ পরিহার করে সম্প্রীতি, সংহতি, ঐক্য আর মিলনের পথে না এলে জনমানুষের কাছাকাছি আসা যাবে না। মুসলিম লীগ দিয়ে শুরু করলেও থিতু হয়েছিলেন অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (ন্যাপ)। আমৃত্যু তিনি ন্যাপের খুলনা জেলা কমিটির সভাপতি ছিলেন। পত্র-পত্রিকা এবং বই পড়া, খেলাধুলার প্রতি অনুরাগ (নিজস্ব ফুটবল টীম গঠন করা) এবং নাট্যনিকেতনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করা–মানুষ হিসেবে তাঁর বিচিত্র শখ এবং শৌখিন স্বভাবের পরিচয় দেয়। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৃত্তের মধ্যে নিজেকে তিনি বেঁধে রাখেননি। ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজেকে, বিস্তৃত করেছেন কর্মের জগৎ। রাজনীতিকে তিনি সমাজসেবায় উন্নীত করেছিলেন। খুলনার উন্নয়ন, খুলনার মানুষের সমস্যার সমাধানে তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। ক্ষমতার রাজনীতি থেকে তিনি দূরে ছিলেন। লোভ, ক্ষমতাদখল, অবৈধ অর্জন, আস্ফালন, ভয়ভীতি দেখিয়ে অর্থ, অস্ত্র, ধর্ম দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করাই হল আজ আমাদের রাজনীতি। ব্যতিক্রমী যাঁরা তাঁরা সংখ্যায় এতো স্বল্প যে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিড়ে তাঁরা হারিয়ে যান।

মানবজন্ম পদ্মপাতায় এককোঁটা শিশির বিন্দুর মতো। আমি নিজে মনে করি জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে সংক্ষিপ্ত যে সময়টুকু–সময়ের স্রোতে যার অস্তিত্ব একটি বুদবুদের সমানও নয়, দুর্লভ সেই সময়টুকুকে এমন কিছু কাজে ভরিয়ে রাখতে যা আমার জীবদ্দশায় আমাকে তৃপ্তি দেবে, আনন্দ দেবে, অপরাধবোধে ভোগাবে না। তৃপ্তিদায়ী, আনন্দদায়ী সেই কাজ সকলকে নিয়ে, সবার জন্য, একার আনন্দের জন্য নয়। সবার কল্যাণ এবং আনন্দের জন্য।

'চলে যাওয়া মানে হারিয়ে যাওয়া নয়'–হয়তো কথার কথা। সাধারণের চাইতে উর্ধ্বে যাঁরা, যাঁরা ব্যতিক্রমী, তাঁরা তাঁদের কর্মের মধ্যেই বেঁচে থাকেন। সময় যেমন নিষ্ঠুর, সময়ই আবার সব থেকে বড় বিচারক। একদিন যিনি শ্রম, সাধনা, ত্যাগ, আর নিষ্ঠা দিয়ে জনমানুষের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, বিস্মৃত অতীত থেকে সময়ই একদিন তাঁকে তুলে এনে ইতিহাসের পাতায় তাঁর নির্দিষ্ট আসনটি নির্ণয় করে দেবে।

প্রয়াত আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় : শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক; সভাপতি, উদীচী খুলনা

আনোয়ারুল কাদির

উল্টো স্রোতের যাত্রী : রাজনীতিবিদ আবু মহম্মদ ফেরদাউস

তাঁর হাঁটার এক চমৎকার ভঙ্গিমা ছিল। দূর থেকেই চেনা যেত যে, আবু মহম্মদ ফেরদাউস আসছেন। অতি সাধারণ পোশাক। হয় পাজামা পাঞ্জাবি, নয়তো পাজামার সাথে বুক আঁটা শার্ট। ঋজু, একহারা শরীর, দীপ্ত মুখাবয়ব; একটা চোখের কোনার দিককার ত্বক একটুখানি ঝুলে থাকা ফেরদাউস ভাইকে অনেকের মধ্য থেকে বের করে আনা একটুও কষ্টসাধ্য ছিল না।

রাজনীতির পোকা মাথায় ছিল তরুণ বয়স থেকেই। সবে বৃটিশ রাজশক্তি উপমহাদেশ ত্যাগ করে গেছে পাকিস্তান নামের এক অস্বাভাবিক প্রতিবন্ধী রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে। কেমন হবে এ রাষ্ট্র, ধারণা ছিল না সাধারণ মানুষের। কিন্তু শুরুটাই ছিল কেমন যেন গোলমেলে। এমনিতেই তো তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে এ রাষ্ট্রের জন্ম। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের নিয়ে পাকিস্তানের জন্ম হলেও অদ্ভুত যে বিষয়টি তা হলো জাতির পিতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জীবনাচারে কোনো মুসলমানিত্বই ছিল না। বলা হয়ে থাকে, 'আছাড় খেয়েও তিনি পশ্চিমমুখো হয়ে পড়েননি কখনও'। এই জিন্নাহ সাহেব প্রথম গভর্নর জেনারেল হয়েই ঘোষণা দিলেন, এ রাষ্ট্র শুধু মুসলমানের নয়, শুধু হিন্দুর নয়। মিলিত হিন্দু-মুসলমানের দেশ পাকিস্তান। কিন্তু হলে কী হবে, হিন্দুরা চলে যেতে থাকল মাতৃভূমি ছেড়ে। আর তাদের জায়গা পূরণ করতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাঙালি মুসলমান আসা শুরু করল তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে। আর একই সাথে ঢুকতে থাকল বিরাটসংখ্যক বিহারি মুসলমান–উর্দূ যাদের ভাষা। তো, দ্বন্দ্বটা শুরু হলো এই ভাষা নিয়েই। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যেই না ঘোষণা করলেন যে, উর্দূ এবং শুধু উর্দূই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, তখনই পাকিস্তান রাষ্ট্রের মাজেজা বুঝতে আর বাঙালিদের কষ্ট হয়নি। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভালোমতো ধাক্কা খেয়েই ফিরে গেলেন করাচী। তার মুখের ওপর যখন প্রতিবাদের উচ্চকণ্ঠ ধ্বনি ছুঁড়ে ফেলা হলো তখন তার আর হয়তো বুঝতে কষ্ট হয়নি সামনের পথ বেশ বন্ধুরই বটে। তবে সৌভাগ্য তার, সম্মানের অবশিষ্ট কিছুটা সাথে নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন তিনি। তবে, রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যে বিতর্কের জন্ম দিয়ে যান তা ধিকিধিকি জ্বলতে জ্বলতে পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ফেটে পড়ে আবার।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর যাত্রা শুরু এ ভাষা আন্দোলনকে ঘিরেই। রাষ্ট্রভাষা নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হলে পর আবু মহম্মদ ফেরদাউস তাঁর রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা পেয়ে যান। খুলনার রক্ষণশীল, সাম্প্রদায়িক শক্তির সর্দার খান আব্দুস সবুরের সাথে লড়াই-এর মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনীতির অভিযাত্রা। তখন হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দলে দলে খুলনা ত্যাগের ফলে এখানকার রাজনৈতিক নেতৃত্বে যে

শূন্যতার সৃষ্টি হয় সে স্থানে অধিষ্ঠিত হন মুসলিম লীগের খান আবদুস সবুর। হিন্দুদের ব্যবসা, বাড়ি, কৃষি জমির এক বড় অংশের মালিকানা কেমন করে জানি তাঁর কর্তৃত্বে চলে আসে। সে সময়ে খুলনার মানুষ সবুর খান-এর প্রতি বেশ মোহাবিষ্ট ছিল। অনেকের মধ্যে একটা ধারণা জন্মে যায়, সবুর খানের চেষ্টাতেই খুলনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতবিভক্তির পর প্রথম তিন দিন খুলনায় ভারতের পতাকা উড়ছিল। সবুর খান তখন কলকাতায়। পরে যখন ঘোষিত হয় যে, খুলনা পাকিস্তানের মধ্যে পড়েছে তখন এখানকার রাজনৈতিক দৃশ্যপট সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানরা ছিল উদ্বেলিত, উৎফুল্ল। এ সময় কীভাবে যেন এটা রটে যায় যে, সবুর খানই চেষ্টাচরিত্তির করে এ অসাধ্য সাধন করেছেন। কিন্তু তখনকার ইতিহাসে এর কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। খান আব্দুস সবুর সে সময় এমন কোনো বড় মাপের নেতা ছিলেন না যে বাউন্ডারি কমিশনকে প্রভাবিত করতে পারতেন। সে সময়কার ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, আদৌ পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অংশ হবে কিনা তাতেও সংশয় ছিল। তখন শরৎ বসু-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে স্বাধীন যুক্তবাংলা গঠনের আন্দোলন চলছিল। বাংলা অঞ্চলের মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসও এ ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। এমনকি মুসলিম লীগ-এর সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত করার ব্যাপারে খুব যে উৎসাহী ছিলেন তা নয় বরং এর বদলে পাকিস্তানের পশ্চিম খণ্ডের ভৌগোলিক অবয়ব স্ফীত করতেই আগ্রহী ছিলেন তিনিসহ মুসলিম লীগের পশ্চিমা নেতৃবর্গ। ওদিকে শিখ সম্প্রদায় নিজস্ব আবাসভূমি দাবি করার প্রেক্ষিতে পাঞ্জাবে মুসলিম-শিখ উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। বাংলায়ও হিন্দু-মুসলিম বৈরিতা বাড়ানোর জন্য রাজনৈতিক ইন্ধন দেয়া শুরু হয় যা এ উভয় অঞ্চলে দাঙ্গায় রূপ লাভ করে, ফলে পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বৃটিশ রাজশক্তি। ১৯৪৭ সালের ২৩শে এপ্রিল জিন্নাহ এবং মাউন্টব্যাটেনের মধ্যে আলোচনায় বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করার বিষয় যখন আলোচনা হয় তখন উভয়েই একমত হন যে, পাঞ্জাবকে ভাগ করা জরুরি হবে কিন্তু বাংলাকে ভাগ না করলেও চলবে, তবে এক্ষেত্রে বাংলা একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। জিন্নাহর ভাষায় : '....I should be delighted, what is the use of Bengal without Calcutta? They had much better remain united and independent. I am sure they would be on friendly terms with Pakistan.' (উদ্ধৃত : বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ,২য় খণ্ড, কামরুদ্দীন আহমদ, পৃষ্ঠা ৮৩)

যাহোক, বাংলাকে বিভক্ত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যখন এসে গেল এবং কলকাতা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো, চব্বিশ পরগনার লাগোয়া জেলা হিসেবে খুলনাকেও যখন ভারতের মানচিত্রের মধ্যে দেখানো হলো তখন 'পার্টিশন ট্রাইবুনালে' খুলনার পক্ষে এ কে ফজলুল হক মানচিত্র ও দালিলিক কাগজপত্র ব্যবহার করে যুক্তি স্থাপন করেন। এ সময় পাকিস্তানের পক্ষে উত্তর প্রদেশের এডভোকেট ওয়াসিম নিযুক্ত ছিলেন, আইনজীবী হামিদুল হক চৌধুরী ছিলেন। ফলে শেষমেশ খুলনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। মোট কথা বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ আইনি লড়াই, বাউন্ডারি কমিশন, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদভিত্তিক সীমানা

চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যুক্তি প্রদর্শনের লড়াই। খান আবদুস সবুরের এখানে অংশগ্রহণের কোনোও সুযোগই ছিল না। খান এ সবুর খুলনাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছেন এমন কোনো দালিলিক বা ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণও নেই। কিন্তু খুলনা যখন চূড়ান্তভাবে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলো তখন তিনি কলকাতা থেকে 'বীরবেশে' খুলনায় আগমন করেন এবং তখনই চাউর হয়ে যায় যে তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টাতে এটা ঘটেছে। তাঁকে ঘিরে এমনি ধরনের ঘোর বা ইলিউশন যখন কাজ করছিল সে সময়ে বিপরীত স্রোতের অভিযাত্রী যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম আবু মহম্মদ ফেরদাউস। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে আবদুল গফুর-এর নেতৃত্বে খুলনায় যে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় আবু মহম্মদ ফেরদাউস তার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই ভাষা প্রশ্নসহ অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে এ দেশের শাসকদের প্রতি মোহ কাটতে থাকে দ্রুত। চুয়ান্নর নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি এবং অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভ্রূণ সৃষ্টিকালে সারা পূর্ববাংলায় যে রাজনৈতিক দিক পরিবর্তনের সূচনা হয়, সারা বাংলার স্বাধীনচেতা প্রগতিকামী মানুষ যে একাট্টা হয়ে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগুতে থাকে তাতে অন্যতম সৈনিক হিসেবে শামিল ছিলেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস। পুরো ষাট-এর দশক জুড়ে আইয়ুববিরোধী নানা মাত্রিকতার আন্দোলনে তিনি প্রথম কাতারেই ছিলেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির রাজনীতির সাথে জড়িত থেকে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রগতিশীল রাজনীতির নেতৃত্ব দেন।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ-এর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। ষাট-এর দশকে তৎকালীন পাকিস্তান তথা পূর্ববাংলার রাজনীতিতে টালমাটাল ঢেউ ছিল। আইয়ুব আমল। জেনারেল আইয়ুব খান তাঁর ইচ্ছামতো রাজনৈতিক অঙ্গনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছিলেন। মুসলিম লীগকে ভেঙে দু'টুকরো করেন। চাটুকারদের নিয়ে গঠন করেন কনভেনশন মুসলিম লীগ। মৌলিক গণতন্ত্র নামের বিশেষ এক ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এ সময়ে পূর্ববাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত দ্রুত গুণগত পরিবর্তন আসতে থাকে। ১৯৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৫-তে সংঘটিত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং ১৯৬৬'র ছয়দফা আন্দোলন পূর্ববাংলার বাম ও মধ্যবাম রাজনীতিকে অনেক কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং দৃশ্যত বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তি সম্প্রসারিত ও দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে। মওলানা ভাসানী ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির দুটো অংশের নেতৃত্বে থাকলেও পূর্ববাংলার মানুষকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে নিতে একত্রিতভাবে কাজ করতে থাকেন। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে যে গণআন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং আটষট্টি উনসত্তরে সারা দেশব্যাপী অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আকারে বিস্তৃত হতে থাকে তাতে খুলনা তথা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম কাণ্ডারি ছিলেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস।

মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয় ও মুজিবনগর সরকারের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলেও যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ সর্বদলীয় ও সার্বজনীন ছিল তাই জাতীয় সরকার গঠনের

দাবি উঠেছিল। তবুও নবীন রাষ্ট্রের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনের স্বার্থে অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ-এর নেতৃত্বাধীন ন্যাপ সরকারকে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যদিও মওলানা ভাসানী বিপরীত অবস্থান নেন। পরবর্তী ইতিহাস এটাই প্রমাণ করে যে, অধ্যাপক মোজাফফর-এর সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। ন্যাপ-এর লক্ষ্য ছিল অপুঁজিবাদী পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশবাসী বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য পরিবর্তন। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গণমানুষকে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় উজ্জীবিত করার রাজনৈতিক দায়িত্ব আবু মহম্মদ ফেরদাউসের ওপর বর্তায়। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশকে এ আদর্শ দ্বারা পরিচালিত করা রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল, রাষ্ট্রীয় মূল নীতিমালা অনুযায়ী সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনাকারী সরকারি দলের এ সম্পর্কিত অজ্ঞতা, দলের মধ্যে তীব্র আদর্শগত দ্বন্দ্ব, সমাজ ও অর্থনীতিবিষয়ক নানা বিপরীতমুখী ব্যবস্থা, বিশেষ করে পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রকে দিকচিহ্নহীন করে ফেলে। এ সময়ে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে সরকার পক্ষের ব্যক্তিপূজা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, সুকৌশলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে ধ্বংস করার জন্য 'মুজিববাদ' নামে সমান্তরাল আরেক ধারণাকে সামনে তুলে আনা হয়। তখন ন্যাপসহ অন্যান্য বামপ্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এটা বেশ বিব্রতকর হয়ে পড়ে। ন্যাপ-এর কর্মীদের তখন নিয়মিত রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ হতো। 'নতুন বাংলা' নামে সাপ্তাহিক মুখপত্র ছিল, তাতেও সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা থাকত। আবু মহম্মদ ফেরদাউসসহ তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় ন্যাপ নেতাদের শুধু সাংগঠনিক ক্ষেত্র নয় রাজনীতির তাত্ত্বিক বিষয়গুলো নিয়েও কর্মীদের সাথে ব্যাপক আলোচনা করতে হতো। আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর সমসাময়িক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে অত্যন্ত স্বচ্ছ ধারণা ছিল এবং সহজভাবে তিনি তা কর্মীদের কাছে বিশ্লেষণ করতেন । কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক অবস্থাটা এমন ছিল যে, সরকারের বিরোধিতা হয়তো কর্মীদের চাঙ্গা করতে সহায়ক ছিল, কিন্তু সার্বিকভাবে এতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ত। কারণ তখন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতাকারী শক্তি ঘাপটি মেরে বসেছিল চূড়ান্ত আঘাত করতে মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায়। আওয়ামী লীগের মধ্যেও প্রতিক্রিয়াশীল চরম ডানপন্থি গ্রুপ ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল এবং এসব শক্তির স্বার্থ এক জায়গায় এসে মিলে যাওয়ায় রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এরা অত্যন্ত সুকৌশলে ন্যাপসহ অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির সাথে বঙ্গবন্ধুর সরকারের দূরত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম হয় এবং এ বিচ্ছিন্নতা পঁচাত্তরের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটাতে সহায়তা করে।

পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পূর্ণ উল্টো ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। এক কথায় নতুন আঙ্গিকে পুরনো পাকিস্তানই ফিরে আসে আবার। সোভিয়েত নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ-এর মৃত্যু এবং তৎপরবর্তীকালে সোভিয়েত নেতৃত্বে পুঁজিবান্ধব রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিষ্ঠান আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও প্রভাব ফেলে। এতদিনকার দুই অক্ষশক্তির বিশ্ব ক্রমে এক অক্ষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসা এবং নব্বই দশকের শুরুতেই সোভিয়েত শক্তির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়।

আবু মহম্মদ ফেরদাউসদের রাজনীতিতে ভাটার টান লাগে। রাজনীতিতে ন্যাপ-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। শীর্ষস্থানীয় অনেক নেতা দলত্যাগ করেন। বিশেষ করে চৌকস কয়েকজন রাজনৈতিক সংগঠকের ন্যাপ ছেড়ে যাওয়া এ দলের ভবিষ্যৎকে সত্যিই অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দেয়। আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর এ সময় দল পরিবর্তন করে রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। জীবনের পড়ন্ত সময়ে যেহেতু এককভাবে আবার ঘুরে দাঁড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই কৌশলগত দিক দিয়ে সুবিধাবাদীদের কাতারে শামিল হওয়াটা সে সময়ের প্রেক্ষাপটে খুব 'অসঙ্গত' ছিল না। তখন এ অঞ্চলে তিনি সবচেয়ে সুপরিচিত ও গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। নিজের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ গড়বার জন্য এ মূলধনটি ব্যবহার করে তিনি আরও এগুতে পারতেন, গাড়িতে পতাকা ওড়াতে পারতেন। কিন্তু আবু মহম্মদ ফেরদাউস এখানে অনন্য। তবে জীবনসায়াহ্নে এসেও আবু মহম্মদ ফেরদাউস থেমে থাকেননি। ভাটার টানে স্রোতের গতি যেমন বেশি থাকে তেমনি তিনিও তাঁর জীবনের শেষ সময়টাতে অবিশ্বাস্য পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে খুলনার উন্নয়ন সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির প্রধান ছিলেন আয়ুষ্কালের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

বয়সের নিক্তিতে পরিণত সময়েই চলে গেছেন তিনি। কিন্তু মনে হয় আরও কিছুকাল থেকে গেলে ভালো হতো। কিছু কিছু ক্ষণজন্মা মানুষের ক্ষেত্রে এটাই হয়। মনে হয় অনেক আয়ুষ্মান হয়ে থাকুন তিনি আমাদের মাঝে। বহু কিছু তাঁর করার বাকি।

আনোয়ারুল কাদির : শিক্ষাবিদ ও কলাম লেখক

মাখন লাল দে

আমার দাদা চলে গেলেন

আমার দাদা আবু মহম্মদ ফেরদাউস ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬ সাল, ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪১৩ সন বুধবার ভোর ৫টায় খুলনা শহরের পশ্চিম বানিয়াখামারের নিজ বাড়িতে সকলের মায়া ত্যাগ করে চিরতরে চলে গেলেন। শ্রীনিবাসসহ তাঁর বাড়ি গিয়ে নশ্বর দেহ দেখলাম এবং মনে যে ব্যথা অনুভব করলাম তা বলার ভাষা আমার নেই। একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন আমার মনের অবস্থা। শেষ জীবনে এসে যেটুকু আমার আশা, ভরসা ও সান্ত্বনা ছিল তাও চিরতরে হারালাম। জীবনে অনেককে অনেকভাবেই পেয়েছি কিন্তু দাদার মতো তেমন আর কাউকে পাইনি। দাদার সাথে সম্পর্ক আমার দীর্ঘদিনের। আলোচনা হতো রাজনৈতিক, পারিবারিক, সাংসারিক, পারিপার্শ্বিক ইত্যাদি বিষয়ে। একান্ত চিত্তে ঘরোয়াভাবে আমার অজানা যেসব কথা আলোচনা করেছেন বা যেসব তথ্য আমাকে দিতেন তা আর কারো কাছে বলতেন কি-না সন্দেহ আছে আমার।

আমার দাদাকে পাবার মূলসূত্র আমার গুরু শ্রদ্ধেয় সুনীল সেনগুপ্ত (কমরেড রতন সেন) –আমার মাস্টার মশাই। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে মাস্টার মশাই পাকিস্তানের কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে প্রথম আসেন আমাদের আজগড়া হাই স্কুলে। আমরা তখন ছাত্র। তিনি ছিলেন বহুমাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী। যেকোনো ছাত্রকে দেখেশুনেই বুঝতেন সে কেমন এবং তার দ্বারা কী কাজ হতে পারে, কেমনভাবে। তৎকালীন সময়ে বামপন্থিদের তেমন পরিচিতি ছিল না। কমিউনিস্ট সম্বন্ধে অনেকের ধারণাও ছিল না। এ সংক্রান্ত কোনো প্রচারও ছিল না। এমনকি প্রকাশ্যে কোনো বইপত্র পাওয়া যেত না বা কথাবার্তাও হতো না। লোকে এর নাম শুনলে ভয় পেত। বিভিন্ন কারণে ধীরে ধীরে আমি তাঁর খুবই নিকটে এসে যাই।

ঠিক এমনই একদিন ১৯৫৪ সালের পরে ছাত্রাবস্থায় মাস্টার মশাই একটা চিঠি দিয়ে আমাকে পাঠান শ্রীশনগরে দাদার (আবু মহম্মদ ফেরদাউস) কাছে। দাদাকে চিঠিটা দেয়ার পরে তিনি আমার সাথে সর্বপ্রথমে যে স্নেহ ও আন্তরিকতা নিয়ে ব্যবহার করলেন তা কোনো দিনই ভুলবার নয়। মনে হলো আমি তাঁর খুবই আপন এবং পূর্বপরিচিত। এখানেই দেখলাম দাদার সঙ্গে মাস্টার মশাইয়ের সামাজিকতায় কত পার্থক্য। মাস্টার মশাই ছিলেন অসামাজিক, গোপন রাজনীতি, লেখা ও প্রতিনিয়ত খবর শোনা ছাড়া আর তেমন কিছুই পছন্দ করতেন না। আর দাদা ছিলেন রাজনীতিবিদ, সামাজিক, সংগঠক, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী জানা-অজানা সকলের খোঁজখবর নেওয়া, বিপদে-আপদে সাধ্যমতো তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি। দাদার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত একান্ত আলোচনায় মাঝেমধ্যে এ কথাটাই বলতাম দাদাকে যে, মাস্টার মশায়ের মতো আমার

জীবনে তেমন আর কাউকে দেখিনি। আমি অত্যন্ত বিশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও যেন মাঝেমধ্যে তিনি আমার উপর রুক্ষ ভাষায় খড়্গহস্ত হতেন। এসব কথা বললে দাদা প্রায়ই বলতেন, রতনদা আমাদের সকলের মতো সাংসারিক, পারিবারিক, সামাজিকভাবে গঠিত হননি। মাস্টার মশায়ের আত্মগোপনে বা প্রকাশ্যে থাকা অবস্থায় যে আমিই একমাত্র তাঁর বিশ্বস্ত যোগাযোগকারী ছিলাম হয়তো সে জন্যই দাদা আমাকে বেশি ভালো জানতেন। মাস্টার মশাইয়ের জন্য ধর্মসভা ন্যাপ অফিসে যেতাম, মডার্ন বুক ডিপোতে যেতাম, ইস্টার্ন প্রেসে যেয়ে বসে থাকতাম প্রতিনিয়ত এবং কাজ শেষে মাস্টার মশাইকে নিয়ে বাড়ি যেতাম রাতে। কোনো কোনো দিন রাত ১০টা /১১টা বাজত। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় নদী পার হয়ে সাইকেলের সামনে বসিয়েই নিয়ে যেতাম তৎকালীন পাক আমলে। শুভাকাঙ্ক্ষী-হিতাকাঙ্ক্ষী, আপদে-বিপদে যাদের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করতাম বা আশ্রয়-প্রশ্রয় পেতাম তাঁরা একে একে সবাই চলে গেলেন।

আমার বিয়ে ঠিক হলে দাদা এবং রব ভাই আমাকে নিয়ে বিয়ে দিয়ে আনলেন। শ্বশুরকুলের আত্মীয়-স্বজনকে দাদা চিনতেন ও জানতেন। যাহোক সবাইকে হারালেও আমার শেষ সম্বল আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মনের কথা ব্যক্ত করার জায়গা ছিল দাদাই। রাজনৈতিকভাবে দাদার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হলেই গোপনভাবে দাদাকে সাথে করে নদী পার করে অন্যত্র নিয়ে রেখেও এসেছি একাধিকবার। দাদার শেষ জীবনে আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম ও সময় কাটাতাম এবং এই অশেষ সময় ইতিপূর্বে আর পাইনি। সঙ্গ ছাড়া তিনি থাকতে পারতেন না। তাঁর পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, জায়গাজমি, আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদি ব্যাপারে আমার সাথে যত আলোচনা হতো তা হয়তো আর কারো সাথে হয়নি বা হতো না, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার যেতে দেরি হলে বা দু'একদিন না গেলে অনেক কিছুই বলতেন। যা জীবনে আর কেউ হয়তো বলবে না। আমি দাদাকে বলতাম ঠাকুর আপনাকে যেন সেঞ্চুরি করান। কারণ অনেক কিছুই দেখেশুনে যেতে পারবেন। তিনি বলতেন আমি আর দেখতে চাই না। এও বলতাম কোনো মতে শীতটা কাটলেই আপনার জন্য ভালো, চিন্তার আর কিছু থাকবে না।

যার সাথে প্রতিনিয়ত দেখাসাক্ষাৎ করতাম তিনি যে হঠাৎ চলে গেলেন তা এখনও যেন মনে হয় না আমার। দাদা ও বৌদিকে অনেক বুঝিয়ে অসুখের কারণে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছি চিকিৎসার জন্য, অবশ্য সেখানে গিয়েই বৌদির ক্যান্সার ধরা পড়ল। দাদাকে কত কথাই না বলতাম, পাক আমলে বা স্বাধীনের পরে আপনার কাছে বসে সব শুনতাম, দেখতাম, ভাবতাম, অনুভব করতাম আপনার কাজকর্ম, কথাবার্তা ইত্যাদি। কিন্তু কিছুই বলতাম না।

সবাই চলে যাবে জানি কিন্তু আমার জীবনে দাদার অভাব আর পূরণ হবে না। কমবেশি অনেককে চিনি জানি, এখনও অনেকে আছেন কিন্তু দাদার মতো আর কাউকে পাই না। দাদার সাথে দেখাসাক্ষাৎ আলোচনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তাছাড়া মাঝেমধ্যে ৭১-এর প্রামাণ্য চিত্র দুজনে দেখা হতো।

দাদার কথা বলে বা লিখে শেষ করবার নয়। আমার জীবনে তাঁর শূন্যতা আর পূরণ

হবার নয়। কী পেয়েছিলাম আর কী হারালাম তা বলার ভাষা আমার নেই। তবুও যেতে হবে সবাইকে, দুদিন আগে আর পরে। অসাধারণ তাঁর দূরদর্শিতা যা অনেকের মধ্যে দেখা যায় না। মার্কসবাদী, লেনিনবাদী এবং অতীত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতীক এখানে আর আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি চাইছিলাম দাদা যেন আরও কিছুকাল বেঁচে থাকেন কিন্তু দুর্ভাগ্য তা আর হলো না। চিরসত্য বাস্তব জেনেও মায়ার বশবর্তী হয়ে ভুলতে পারি না।

পরিশেষে করুণাময়ের কাছে একান্তভাবে কামনা ও বাসনা এবং প্রার্থনা করি দাদার আত্মাকে ঈশ্বর যেন স্বর্গবাসী করেন।

মাখন লাল দে : আবু মহম্মদ ফেরদাউসের ভাবশিষ্য

সরদার আব্দুস সাত্তার

ফেরদাউস ভাইকে যেমন দেখেছি

আবু মহম্মদ ফেরদাউস একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি প্রতিষ্ঠান। আমি স্কুল জীবন থেকেই ফেরদাউস ভাইয়ের সাথে পরিচিত ছিলাম ছাত্র ইউনিয়ন করার সুবাদে। তিনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা ছিলেন আর আমরা যারা ছাত্র ইউনিয়নের সাথে সম্পর্কিত ছিলাম তারা ছিলাম ন্যাপ-এর ছাত্র সংগঠনের কর্মী। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সম্পর্ক ছিল আত্মিক।

ফেরদাউস ভাইয়ের একটি প্রিন্টিং প্রেস ছিল। তিনি বইয়ের ব্যবসা করতেন। তাঁর একটা লাইব্রেরি ছিল। লাইব্রেরিতে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও চীন রাশিয়া দক্ষিণ আমেরিকার বিপ্লবীদের জীবনী ও গল্পকাহিনী সম্পর্কিত বই পাওয়া যেত। আমরা ফেরদাউস ভাইয়ের লাইব্রেরি থেকে মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সেতুং, চে গুয়েভারা,ফিদেল ক্যাস্ট্রো, গাদ্দাফির বই কিনতাম। সবচেয়ে মজার বিষয় ছিল ফেরদাউস ভাইয়ের লাইব্রেরি থেকে বই কিনলে পিকিং রিভিউ, সোভিয়েত নারী, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিভিন্ন ধরনের ম্যাগাজিন পাওয়া যেত বিনা পয়সায়। দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন, ম্যাক্সিম গোর্কির মা, অগ্নিদিনের কাহিনী, আখের স্বাদ নোনতা, ছোটদের রাজনীতি, ছোটদের অর্থনীতি, যে গল্পের শেষ নেই, জর্জ টমসনের ধর্ম ও সমাজ, সুপ্রকাশ রায়ের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বদরুদ্দীন উমরের পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাঙলাদেশের কৃষক, আঃ হক সাহেবের ইতিহাসের রায় সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বই পাওয়া যেত ফেরদাউস ভাইয়ের লাইব্রেরিতে যা অন্য বইয়ের দোকানে বা লাইব্রেরিতে পাওয়া যেত না। আরো মজার ব্যাপার ছিল। ছাত্র ইউনিয়নের পোস্টার, লিফলেট, একুশের ম্যাগাজিন সবই ফেরদাউস ভাইয়ের প্রেস থেকে ছাপা হতো। তিনি কখনও না বলতেন না। আর আমরা কখনও পুরো টাকা দিয়েছি বলে মনে হয় না। ১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়ন ভাগ হলেও আমাদের সাথে তাঁর সম্পর্কের কোনো অবনতি কোনোদিন হয়নি। ধর্মসভা রোডে ছিল ন্যাপের অফিস। ছাত্র ইউনিয়নের অফিস ক্লে রোডের পার্শ্বে ছিল। রাশিয়ায় ক্রুশ্চেভ ক্ষমতা গ্রহণের পর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভক্ত হলে ন্যাপ, কমুনিস্ট পার্টি ভাগ হওয়ার আগেই ছাত্র ইউনিয়ন ভাগ হয়ে গেল। ফেরদাউস ভাই অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ ও ওয়ালি খানের ন্যাপের খুলনার নেতা হলেন। সঙ্গে ন্যাপের খুলনা জেলা সম্পাদক আব্দুল গফুর। আর এ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার, মাহমুদ আলম খান মুকু ভাই, এ্যাডঃ নুরুল ইসলাম নান্নু, নুরুল ইসলাম দাদু, গাজী শহীদুল্লাহ, এ্যাডঃ এস রাজ্জাক আলি, গোলাম সাঈদ মোক্তার প্রমুখ ভাসানী ন্যাপের নেতা হলেন। ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপের অফিস চলে গেল ফেরদাউস ভাইদের দখলে। গফুর ভাই অবশ্য পরে মোজাফফর

ন্যাপ ছেড়ে আওয়ামী লীগে গিয়ে পাইকগাছা থেকে এমএনএ হয়েছিলেন।

ফেরদাউস ভাই একসময় সার্বক্ষণিক রাজনীতি করতেন। তিনি কখনও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য দল ত্যাগ করেননি বা আদর্শচ্যুত হননি। তিনি মনেপ্রাণে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। ১৯৫২ সালে তিনি খুলনায় ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

এ ছাড়া ফেরদাউস ভাই আইয়ুববিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেফতার হন। ছাত্র ইউনিয়নের নেতা হিসেবে আমরা কারাগারে গিয়ে ফেরদাউস ভাইয়ের অনেক গল্প শুনেছিলাম। তিনি জেলখানায় গিয়ে কয়েদিদের খাবারের অনিয়ম, নিম্ন মানের খাবার প্রদান ও বিছানাপত্র অপরিষ্কার রাখার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। ফেরদাউস ভাইসহ অন্যান্য নেতারা জেলখানায় থাকতেই জেলখানার কম্বল ও কক্ষগুলো পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হয় এবং খাদ্য-খাবারের মান উন্নত করা হয়। পরবর্তীকালে অন্যান্যদের সাথে ফেরদাউস ভাই অনারারি কারা পরিদর্শক হয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আমরা যারা নেতা ছিলাম আমরা তখন দিনে আন্দোলন করলেও রাতে ন্যাপ অফিসে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মিলিত হতাম। অনেক সময় তৃপ্তিনিলয়ে দেখা করতে হতো। জব্বার সাহেব ও ফেরদাউস ভাই তৃপ্তিনিলয়ে থাকতেন।

তৃপ্তিনিলয়ে গেলে ফেরদাউস ভাই আমাদের চা-সিঙাড়া খাওয়াতেন। জব্বার সাহেব বসতেন প্রবেশপথের ডানপাশে একটা হাতা ছাড়া চেয়ারে আর ফেরদাউস ভাই বসতেন একটু ভিতরে বাঁ দিকে। ছাত্রনেতারা বিশেষ করে যারা ছাত্র ইউনিয়ন করতেন তাদের আড্ডাখানা ছিল এই তৃপ্তিনিলয়। পরে মতিয়া গ্রুপ বসত সন্ধ্যা রেস্টুরেন্টে আর ছাত্রলীগ বসত সরকার সুইটসে।

১৯৬৯ সালে একদিন আমরা মিছিল করে যাচ্ছি, মিছিল ফেরিঘাট পৌঁছালে কতিপয় বিহারি মিছিলে হামলা করে। এতে একজন ছাত্রনেতা আহত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন আমরা দৌলতপুর খালিশপুর থেকে মিছিল নিয়ে ফেরিঘাট গিয়ে বিহারিদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করে আগুন ধরিয়ে দিই। আমরা আগুন দিতে দিতে ডাকবাংলা মোড় পর্যন্ত যাই। আমাদের হাতে মশাল ও লাঠি। ডাকবাংলা মোড়ে তাকিয়ে দেখি জব্বার সাহেব, ফেরদাউস ভাই, নূরুল ইসলাম দাদু ভাই বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওনারা আমাদের দেখে লাঠি নিয়ে তেড়ে এলেন। আমার এখনও মনে পড়ে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে ফেরদাউস ভাই-এর জ্বালাও পোড়াও বন্ধ করার আহ্বান জানানোর কথা। তিনি বললেন এভাবে জ্বালাও পোড়াও করলে বড় বাজার লুট হয়ে যাবে।

আমরা মাইকে ঘোষণা দিলাম ভাংচুর ও জ্বালাও পোড়াও থামাতে। এর মধ্যে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। আমরা দৌলতপুর অভিমুখে আবার রওনা দিলাম মিছিল নিয়ে। সেদিন যদি ফেরদাউস ভাই ও অন্যান্য ন্যাপ নেতারা না ঠেকাতেন তবে বড় বাজার লুট হয়ে যেত। পরে জব্বার সাহেব, মুকু ভাই, ফেরদাউস ভাই, দাদু ভাই শান্তি কমিটি গঠন করে আবাঙালি নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। যাতে ভবিষ্যতে বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয় সে জন্য খালিশপুর ঈদগাহ ময়দানে জনসভা করেন। ওই জনসভায় এ্যাডঃ আঃ জব্বার, ফেরদাউস ভাই ও আমি বক্তৃতা করি।

১৯৬৪ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় এ্যাডঃ আবদুল জব্বার, ফেরদাউস ভাই খালিশপুর হিন্দু এলাকায় সভা-সমাবেশ করেন। আমাদের দিয়ে কমিটি করে পাহারার ব্যবস্থা করেন। হিন্দু এলাকায় ফেরদাউস ভাই ও জব্বার সাহেব খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। খদ্দরের পানজাবি আর চাদর গায়ে দিয়ে তারা দু'জন রাতে আসতেন আমরা ঠিকমতো পাহারা দিচ্ছি কিনা দেখতে। আজ জব্বার সাহেব নেই, ফেরদাউস ভাই নেই কিন্তু তাদের মহৎ প্রাণের মানবিক মূল্যবোধ আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

খুলনার প্রবীণ ন্যাপ নেতাদের ইন্তেকালের পর ফেরদাউস ভাই কেমন যেন একলা হয়ে যান। তাছাড়া একশ্রেণীর নীতিহীন রাজনীতিকদের অপতৎপরতায় রাজনৈতিক অঙ্গন কলুষিত হয়ে ওঠে। জনসেবার পরিবর্তে রাজনীতি ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে থাকে। রাজনীতি জনসেবার মহান ব্রত না হয়ে একশ্রেণীর রাজনীতিকের কাছে পেশা হিসেবে দেখা দেয়। রতন সেন-এর মতো ত্যাগী নেতাকে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচিত হতে লাগল, মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতিকদের নীতিহীন কার্যকলাপে মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য স্বাধীনতাবিরোধীদের পক্ষ অবলম্বন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের বিপর্যয়, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার স্থলে বাজার অর্থনীতির নামে পুঁজিবাদের উত্থান ইত্যাদি কারণে ফেরদাউস ভাই রাজনীতি থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে আসেন। কিন্তু তিনি জনগণের থেকে কখনও দূরে থাকেন নি। তিনি খুলনা তথা এই অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে আন্দোলন শুরু করেন। সিটি কর্পোরেশন নাগরিক জীবনের উন্নতি না করে হঠাৎ করে পৌর ট্যাক্স বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করলে ফেরদাউস ভাই প্রাক্তন ছাত্রনেতা, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সমাজসেবী, কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরাও যোগদান করে। শেষ পর্যন্ত খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ব্যানারে আন্দোলন তীব্রতর হলে সিটি কর্পোরেশন বাধ্য হয় পৌরকর বৃদ্ধির কার্যক্রম থেকে ফিরে আসতে। এতে সিটি কর্পোরেশনের করদাতারা বর্ধিত কর প্রদানের হাত থেকে রক্ষা পায়।

স্বাধীনতার পূর্বে এই অঞ্চলে অনেক শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। খুলনাকে শিল্প ও বন্দর নগরী বলা হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, স্বাধীনতার পর খুলনার প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে আস্তে আস্তে এই অঞ্চলের শিল্পকারখানাগুলোতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে টেক্সটাইল মিল, নিউজপ্রিন্ট মিল, দৌলতপুর জুট মিলসহ বহু রিরোলিং মিল, তেল কল, ম্যাচ ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যায়।

ফেরদাউস ভাইয়ের নেতৃত্বে খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ব্যানারে খুলনায় শিল্প বাঁচাও আন্দোলন শুরু হয়। খুলনায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, খুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, রূপসা ব্রিজ, মংলা বন্দরের উন্নয়ন ও নাব্যতা রক্ষা, মাওয়ায় ব্রিজ নির্মাণ ও আকরাম পয়েন্টে ডিপ সিপোর্ট নির্মাণসহ খুলনা অঞ্চলের আর্থসামাজিক ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের আন্দোলনে সব সময় ফেরদাউস ভাইকে অগ্রসেনানী হিসেবে পেয়েছি আমরা।

বয়সের ভারে তিনি যখন প্রায় চলার শক্তি হারাতে বসেছিলেন তখনও তিনি ঘরে বসে

থাকেননি। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত খুলনার উন্নয়নে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে আন্দোলন করে গেছেন। তিনি বলতেন রাজনীতিকরা পচে গেছে। তাই রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। কেবল কালো টাকা আর পেশিশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেই হবে না, তিনি বলতেন ঠিকমতো যারা কর-খাজনা, বিদ্যুৎ বিল ও টেলিফোন বিল পরিশোধ করে না, যারা কালোবাজারি মজুতদারি করে অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছে, যারা কর্মচারিদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দেয় না, যারা মানুষ ঠকিয়ে অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছে তারা কালো টাকার মালিকদের চেয়েও খারাপ। তিনি রাজনীতিতে ভালো লোকদের স্বাগত জানাতেন। তিনি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন।

ফেরদাউস ভাই একজন নির্ভেজাল ভালো লোক ছিলেন। তাই দলমতনির্বিশেষে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কে কোন দলের, কে কোন আদর্শে বিশ্বাস করেন এটা কোনোদিন ফেরদাউস ভাই জিজ্ঞেস করতেন না। এ কারণেই খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটিতে সকল দলের লোক ছিল। সাহিত্য সংসদ বয়রা, খুলনা ২০০৪ সালে তাঁকে প্রবীণ সমাজসেবক হিসেবে সম্মাননা প্রদান করে সম্মানিত করে। সংবর্ধনার জবাবে ফেরদাউস ভাই বলেছিলেন, আমি যা কিছু করি সেটা সম্পূর্ণ মনের তাগিদে করি। সংবর্ধনা পাওয়ার জন্য করি না। কিন্তু সাহিত্য সংসদ আমাকে সংবর্ধনা দিয়ে আমাকে আরো বাঁচার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিল। তিনি অবশ্য এরপর যতদিন বেঁচেছেন খুলনার উন্নয়নের দাবি থেকে কখনও বিচ্যুত হননি। রূপসা ব্রিজ প্রতিষ্ঠা তার আন্দোলনেরই ফসল। যতদিন খুলনা ব্রিজ থাকবে ততদিন খুলনার মানুষ শ্রদ্ধার সাথে ফেরদাউস ভাইকে স্মরণ করবে কারণ ফেরদাউস ভাইয়ের মৃত্যু নেই।

সরদার আবদুস সাত্তার : সাংবাদিক

শেখ আব্দুল কাইয়ুম

স্মৃতিতে ফেরদাউস ভাই

অবহেলিত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে চিরভাস্বর হয়ে আছেন মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউস। খুলনার মানুষ তাঁকে ফেরদাউস ভাই বলে ডাকতেন। ছাত্ররাজনীতি করার কারণে আমার সাথে তাঁর পরিচয় ৬০-এর দশকে। খুলনা থানার মোড়ে 'তৃপ্তিনিলয়' নামে একটি রেস্তোরাঁ ছিল। প্রগতিশীল রাজনীতিবিদদের আড্ডার স্থান ছিল এই তৃপ্তিনিলয়। সেই সময়কার রাজনীতিবিদ ও ছাত্রনেতৃবৃন্দ তাদের দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পূর্ণতা আনতে পারতেন না যদি কিনা সকালে-বিকালে একবার 'তৃপ্তিনিলয়ে' বসে রাজনীতি বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিতে না পারতেন। নেতারা এখানে বসে এক কাপ চা দু-তিন জনে ভাগ করে খেতেন।

সেখানেই দেখতাম শহীদ এ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার, আবু মহম্মদ ফেরদাউস, এম এ আজিজ, এম নুরুল ইসলাম (দাদুভাই), এম এ রব, সামসুদ্দিন সুনু, শান্তি ঘোষ, এম এ গফুর, রতন সেন, এম এ বারী, ছাত্রনেতাদের মধ্যে এরফান উল্লাহ খান, সৈয়দ ইছা, কাজী ওয়াহিদুজ্জামান, অচিন্ত্য কুমার ভৌমিক, জামিরুল ইসলাম, গাজী সিরাজ, আকরাম হোসেন, লিয়াকত আলী, কৃষ্ণা দাস, রণজিৎ দত্ত, এ টি এম খালিদ, শেখ শাহজামাল, শেখ কামরুজ্জামান টুকু, আলী তারেক, নজরুল ইসলাম, আবুল খয়রাত, বিনয় ভূষণ চ্যাটার্জী, জাহাঙ্গীর, এ রশিদ, হেকমত আলী ভূঁইয়াসহ আরও অনেক নেতৃবৃন্দ।

সাংবাদিকদের মধ্যে মাহমুদ আলম খান, আশরাফউদ্দিন মকবুল, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, লুৎফর রহমান জাহাঙ্গীর, মনিরুল হুদা, আবু সাদেক, সৈয়দ সাদ আলী, ওয়াজেদ আলী, নাসিরুদ্দিন এবং আরও অনেকে 'তৃপ্তিনিলয়' এর চায়ের টেবিলে রাজনীতির ঝড় তুলে তবেই বাড়ি ফিরতেন।

ফেরদাউস ভাই-এর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার কারণ ছিল খুলনা থেকে প্রকাশিত 'দেশের ডাক'-এর সম্পাদক লুৎফর রহমান জাহাঙ্গীর-এর শ্যালক বিধায়। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে আমাকেও শালাবাবু বলতেন। ফেরদাউস ভাই-এর ছোট ভাই প্রফেসর মুজিবর রহমান ছিলেন লুৎফর রহমান জাহাঙ্গীরের সহপাঠী। লুৎফর রহমান জাহাঙ্গীরের সাথে ফেরদাউস ভাইদের একটি পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। লুৎফর রহমান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত 'দেশের ডাক' পত্রিকাটি মাঝে মাঝে ইস্টার্ন প্রেস থেকে ছাপানো হতো। ১৯৫২ সালে উল্লাসিনী সিনেমা হলের কাছে টিনশেডের একটি বড় ঘরে প্রথম যাত্রা শুরু করে ইস্টার্ন প্রেস। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে থানার মোড়ে নিজেদের জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়। ইস্টার্ন প্রেসের মালিক ছিলেন ফেরদাউস ভাই আর তাঁর ভাই আমজাদ হোসেন ও এ এফ এম শামসুর রহমান। মাঝে মাঝে প্রেসে যেতে হতো। পত্রিকার প্রুফও দেখতে হতো।

সেখান থেকে আমার সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। প্রেসে যতক্ষণ থাকতাম ফেরদাউস ভাই চা-সিঙ্গাড়া না খাইয়ে ছাড়তেন না। সেটাও 'তৃপ্তিনিলয়' থেকে আনা হতো।

সেই সময় থেকে লক্ষ করেছি বাম-প্রগতিশীল চিন্তার ধারক প্রতিবাদী এই বিদ্রোহী মানুষটাকে। খুব ধীর-স্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ফেরদাউস ভাই। ন্যাপ রাজনীতির সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে তিনি খুলনা ন্যাপের সভাপতি হন। ৬ দফা, ১১ দফা ও অসহযোগ আন্দোলনে খুলনার ছাত্রনেতৃবৃন্দকে অভিভাবকের মতো আগলে রাখতেন। দলমতনির্বিশেষে ফেরদাউস ভাই ছিলেন সকলের অত্যন্ত আপনজন।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অবহেলিত জনপদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এই অঞ্চলের মানুষগুলোকে 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াস চালিয়েছেন। ১৯৮৯ সালে তাঁরই নেতৃত্বে গঠিত 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র আহ্বায়ক পরবর্তীতে আমৃত্যু এই সংগঠনটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

ডান-বাম প্রগতিশীল সকল রাজনীতিবিদদের একটি প্লাটফরমে এনে খুলনার বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ করে রাখা কী কঠিন কাজ সেটা আমরা ফেরদাউস ভাইকে দিয়ে উপলব্ধি করেছি। ভিন্ন মত ও পথের রাজনীতির বিশ্বাসের দল ও নেতাদের এক মঞ্চে উপস্থিত করিয়ে খুলনার দাবি ঐক্যবদ্ধভাবে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র আন্দোলনের ফসল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা মেডিকেল কলেজ, রূপসা ব্রিজ-এর বাস্তবায়ন। তারই ধারাবাহিকতায় নিবুনিবু করে চলা এই প্রতিষ্ঠানটি তার আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। বিমানবন্দরের জায়গা অধিগ্রহণ হয়েছে। পর্যাপ্ত বরাদ্দ না পাওয়ায় বর্তমানে কাজ বন্ধ। পদ্মা সেতু নির্মাণ হবে হয়তো। রেলপথসহ সেতু না হলে এই সেতুর গুরুত্ব কোথায়? মংলা বন্দরের আধুনিকায়ন কবে হবে কে জানে? এখনও পর্যন্ত বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ড্রেজার কিনতে পারেনি। নিউজপ্রিন্ট মিলসহ জুট মিলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিল্পনগরী খুলনা আজ মৃতপুরী। আমরা দেখেছি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়ানো হলে ফেরদাউস ভাই-এর নেতৃত্বে খুলনার মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়েছিল। ফলে খুলনার মানুষকে বর্ধিত কর গুনতে হয়নি।

দীর্ঘদিন ফেরদাউস ভাই অসুস্থ ছিলেন। তবুও থেমে থাকেনি খুলনার মানুষের আন্দোলন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁর বাসায় উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করে নিয়মিত দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন। খুলনাবাসী সে কারণেই তাকে স্মরণ করে। মাঝে মাঝে এই সংগঠনটি বিভিন্ন কর্মসূচি, মানববন্ধন, র‍্যালি, স্মারকলিপি প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পালন করে। এ সকল কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে বারংবার ফেরদাউস ভাইয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। মনে হয় কোথায় যেন নেতৃত্বের শূন্যতা। আমরা জানি না এই সংগঠনটি এই শূন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারবে কি-না।

অসাম্প্রদায়িক চেতনসম্পন্ন, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রগতিশীল চিন্তার মানুষগুলো বিদায় নিচ্ছেন। এই অভাব পূর্ণ করবার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে।

রোজী রহমান

আবু মহম্মদ ফেরদাউস : আমার চোখে

আবু মহম্মদ ফেরদাউস শুধুমাত্র একটি নামেই যার পরিপূর্ণ পরিচয়, আড়ম্বরহীন বাহুল্যবর্জিত জীবনযাত্রার অন্তরালে এক বিশাল মানুষ। অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে লালিত হয়েছিল এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত অতিশয় নম্র এবং ভদ্র ও মৃদুভাষী মানুষ আমি আমার জীবনে খুবই কম দেখেছি। তিনি যে মেহনতি মানুষের রাজনীতি করতেন, যে আদর্শকে তিনি অন্তরে ধারণ করেছিলেন সেই আদর্শকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। প্রচারবিমুখ মানুষটি বঞ্চিত ও অবহেলিত খুলনাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিগুলো আদায়ের লক্ষ্যে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে একই প্লাটফর্মে সমবেত করেছিলেন। সেই প্লাটফর্মটি 'খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। এক সময় এই সংগঠনের নাম এবং আবু মহম্মদ ফেরদাউস নাম সমার্থক হয়ে উঠেছিল। খুলনাবাসীর উন্নয়নের জন্য মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউস নিঃস্বার্থভাবে অনলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কোনোরকম সমালোচনা বা বিতর্ক ছাড়াই মৃত্যু পর্যন্ত এই সংগঠনের মূল প্রেরণাশক্তি ছিলেন তিনি নিজে। এই দীর্ঘ জীবনে রাজনীতির অঙ্গনে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গেই বিচরণ করেছেন। এই নির্লোভ, নিরহংকার মানুষটি নিজের আদর্শে অটল থেকে কোনো চাপের কাছেই কখনও মাথা নত করেননি। তিনি রাজনীতিজীবী নয় রাজনীতিবিদ হিসেবেই নিজের একটি স্থান করে নিয়েছিলেন। এই অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশে আবু মহম্মদ ফেরদাউসের মতো মানুষ খুবই বিরল। চারপাশের সকল বৈরিতাকে পরিহার করে নিজেকে একজন সঠিক মানুষ এবং সুনাগরিক হিসেবে সকল খুলনাবাসীর কাছ থেকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছেন। শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা এমন একটি বিষয় যা ব্যক্তিবিশেষ নিজের আচার-আচরণ এবং কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমে অর্জন করে নেয়। মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউস সেই দুরূহ এবং দুর্লভ সম্মান আদায় করে সকল খুলনাবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের এবং স্মরণীয় মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। ১৯২৪ সালে যে মানুষটির জন্ম হয়েছিল, দীর্ঘ ৮৩ বছরের জীবনে তিনি বিচিত্র ধারায় জীবনের পথপরিক্রমা করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে আবু মহম্মদ ফেরদাউস সাহেবের জীবন যতই সাধারণ হোক, অন্তরালে ছিলেন এক বৈচিত্র্যময় বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী। জীবন শুরু করেছিলেন ভিন্ন ধারার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মধ্যে দেশ ও সমাজ সম্পর্কে চেতনাবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল যার ফলশ্রুতিতেই তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সূতিকাগার থেকেই তিনি সকল আন্দোলন সংগ্রামের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। যদি ধরে নেয়া যায় ৪৭ সালের দেশ বিভাজনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের আপামর জনগণের মনের কোণে স্বাধীনতার নবীন সূর্যটি উঁকি

দিয়েছিল, তবে সেই আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারপর ৫২'র ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে ৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পার হয়ে ৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আবু মহম্মদ ফেরদাউস একজন সংগঠক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। জীবনের বিভিন্ন সময় তাঁর উপর নেমে এসেছে মৃত্যুর পরোয়ানা। নানাভাবে তাঁর জীবনের উপর এসেছে হুমকি। তাঁকে ছুরিকাহত করা বা তাঁর উপর বোমা হামলার ঘটনাও ঘটেছে। রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম করতে যেয়ে তাঁকে বহুবার জেলে যেতে হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতির মানুষটি কিন্তু ছিলেন দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। জীবনে কখনো তিনি কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেন নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ন্যাপ, আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিদলীয় ঐক্যজোটের একজন শীর্ষনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ ছাড়াও ৭৩ সালের নির্বাচনে খুলনা সদর আসনে তিনি নির্বাচন করেছিলেন। ফেরদাউস সাহেব এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি নির্বিকারভাবে সমালোচনা হজম করতেন। কথা শুনতেন বেশি কিন্তু বলতেন কম। আমি দেখেছি তাঁকে ৮৫-৮৬ সাল থেকে। খুব উত্তেজিত হয়ে তাঁকে কথা বলতে দেখিনি। সাজ-পোশাক চলনে-বলনে কোনো বাহুল্য নেই। অত্যন্ত মৃদু স্বরে নিজের মতামতটি তিনি দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতেন। অনেক মানুষের মধ্যেও তাঁর পোশাকটি তাঁকে চিনিয়ে দিত। অন্যের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য এনে দিত। জীবনের দীর্ঘ সময় বাম রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত থেকে আশির দশকের শেষে এসে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য গঠন করেন 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। এর মাধ্যমে তিনি খুলনাবাসীর দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে শুরু করেন আন্দোলন-সংগ্রাম। এসব দাবির মধ্যে প্রধান দুটি দাবি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও রূপসা সেতু যা আজ বাস্তবায়িত হয়েছে। খুলনাবাসীর পক্ষে এই দাবি বাস্তবায়নে উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সকল আন্দোলন, সকল কর্মসূচি, সংগ্রামের অন্তরালে প্রেরণা দিয়েছেন, শক্তি যুগিয়েছেন হালকা শরীরের ছোটখাট গঠনের কিন্তু বিশাল অন্তঃকরণের একজন নিঃস্বার্থ ত্যাগী মানুষ। আবু মহম্মদ ফেরদাউস কোনো প্রতিদানের আশা না করেই নিজের মেধা, মনন, শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করেছেন দক্ষিণাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলোর জন্য। দেশ ও মানুষের জন্য বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য তিনি যে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি শেষ দিকে অসুস্থতার কারণে উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় পরিষদের কোনো কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও তাঁর অনুপস্থিতিই যেন তাঁর কথা বেশি করে মনে করিয়ে দিত। সর্বত্রই তাঁর অভাব অনুভূত হতো। এহেন প্রচারবিমুখ মানুষটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একটু নাটকীয়ভাবে। আমার স্বামী মঞ্জুর-উর-রহমানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আশির দশক থেকে। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় তার প্রায় দশ বছর পরে। ১৯৮৫ থেকে ২০০২ পর্যন্ত আমি খুলনা সিটি কর্পোরেশনে কমিশনার থাকাকালীন বহুবার তাঁকে বিভিন্ন মিটিং-এ দেখেছি। তাছাড়া আড়ম্বরহীন বেশভূষা এবং অমায়িক আচরণের জন্য সহসাই তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। আমার স্বামী একদিন আমাকে বললেন যে, তুমি ফেরদাউস ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করবে, উনি

তোমাকে পছন্দ করেন। আমার জড়তার জন্য নিজে থেকে আলাপ করা হয়ে উঠছিল না। তখন সম্ভবত ৯৬ সাল। নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। খুলনা সিটি কর্পোরেশনে তোড়জোড় চলছে সব কমিশনারদের নিয়ে মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান সাহেব তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন এবং তাঁকে একটা স্মারকলিপি দেয়া হবে। সেখানে খুলনার নাগরিকদের পক্ষে কী কী দাবিদাওয়ার কথা থাকবে এসব নিয়ে খুলনার নেতৃবৃন্দের সাথে মেয়র সাহেবের অফিসকক্ষে প্রায়ই অনানুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা হতো। সে রকমেরই একটি দিনে কথাবার্তা হচ্ছে মেয়র মহোদয়ের অফিসে। আমরা কয়েকজন কমিশনার উপস্থিত। আলোচনা শেষ পর্যায়ে আমরা রুম থেকে বের হব, এমন সময় ফেরদাউস সাহেব আমাকে উদ্দেশ করে বললেন 'এই যে মিসেস রহমান, আপনার তো আমার সঙ্গে অনেক আগেই আলাপ করার কথা ছিল।' ওই একটি বাক্যে আমার জড়তা কেটে গেল। এরপর থেকে তিনি খুলনা উন্নয়ন পরিষদের অনেক কর্মসূচিতে আমাকে আহ্বান করেছেন। আমি সাধ্যমতো উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করেছি। সচরাচর রাজনীতিবিদদের যেসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে সেসব থেকে তাঁর অবস্থান ছিল বিপরীত মেরুতে। গণমানুষের জন্য কাজ করতে এসে পাওয়া না পাওয়ার হিসেব করেননি। এমনই একজন নিরহঙ্কার নির্বিরোধী মানুষ আজ আমাদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছেন। একদিন সবাইকেই এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয় প্রকৃতির নিয়মে। কিন্তু কোনো কোনো মানুষ চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেলেও তাঁদের অতীত কর্মকাণ্ড তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে আমাদের মনের মণিকোঠায়। মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউস তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব, যিনি হারিয়ে গিয়েও বেঁচে আছেন আমাদের মনে।

নিজেকে তিনি শুধুমাত্র একজন নিঃস্বার্থ এবং সফল রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেননি একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবেও তিনি পরিচিত ছিলেন। ব্যবসায়ী হিসেবে বিভিন্ন সময় তিনি পুস্তক ব্যবসায়ী সমিতি এবং বাস মালিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে বিচলিত করে তুলত আর তাই '৭৪ সালে যখন খাদ্যাভাব দেখা দেয় তখন তাঁর নেতৃত্বে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছিল। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি নিপীড়িত-শোষিত-বঞ্চিত জনগণের কথা বলেছেন এবং তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিরলসভাবে সচেষ্ট থেকেছেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি রুমা স্মৃতি পদক, তৈয়েবুর রহমান লাইব্রেরি পদক এবং উন্নয়ন কমিটির পদক লাভ করেন। খুলনা ইউনিভার্সিটি এবং রূপসা সেতু বাস্তবায়নে যে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল সেখানে মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউসের অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ ছাড়াও ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল, সুপেয় পানির জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, বিমানবন্দর স্থাপন ও পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহের দাবিতে খুলনাবাসীর সকল আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদের মৃত্যুতে খুলনার রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হলো। এই শূন্যতা কখনো পূরণ হবে কিনা ভবিষ্যৎ তার উত্তর দেবে। আজ আমাদের সকলের উপর দায় বর্তেছে, খুলনাবাসীর প্রাণের যেসব দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউস আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন আমরা যেন সেই দাবিগুলো

আদায়ের জন্য তাঁর পথ অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে একযোগে প্রচেষ্টা চালিয়ে সফলকাম হই। শোকসভা, আলোচনা, স্মৃতিচারণ যত কিছুর মাধ্যমে আমরা তাঁকে স্মরণ করি, শ্রদ্ধা জানাই, সবচেয়ে বড় সম্মান সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হবে তাঁর অনুসৃত পথ ধরে সমাজ ও দেশের জন্য কিছু করে যাওয়া। আবু মহম্মদ ফেরদাউস আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছেন, কিন্তু তিনি আছেন আমাদের সকল আন্দোলনে, সংগ্রামে, মিছিলের সম্মুখে। কখনও কখনও কোনো কোনো মানুষ মৃত্যুতেই শেষ হয়ে যান না, বেঁচে থাকেন তাঁর উত্তরসূরিদের মাঝে। তাই তিনি আছেন আমাদের মাঝে, থাকবেনও।

নয়নসমুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই

এবং মানুষ আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর ঠাঁই হৃদয়ে হয়ে রবে অমলিন।

রোজী রহমান : লেখক ও সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার, কেসিসি

আব্দুল্লাহ হোসেন (বাচ্চু)

আবু মহম্মদ ফেরদাউস স্মরণে

শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব এবং তারপর বার্ধক্য, জন্ম থেকে মৃত্যু জীবনের এই পরিণতি অনিবার্য। এর মধ্যে কিছু মানুষ কিছু মহাপ্রাণ তাঁদের কাজ দ্বারা মানুষের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকেন। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আবু মহম্মদ ফেরদাউস তাঁদেরই একজন।

১৯৬১ সালে আমার পিতৃবিয়োগ ঘটে। তখন আমরা নড়াইলে। একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমার পিতা নড়াইল-এ কর্মরত থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আমি তখন ক্লাস সেভেন-এ সবেমাত্র উঠেছি। কিশোরকাল, রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পের ফটিকের মতো অবস্থা তখন। আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মরহুম এ্যাডঃ আব্দুল হালিম ও এ্যাডঃ এ এফ এম আব্দুল জলীল আমার চাচা। দু'জনই খুলনা জজকোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত এবং দু'জনেরই খুলনা শহরে বসবাস। পিতার মৃত্যুর পর ঐ দু'চাচার স্নেহ ছায়ায় এবং অভিভাবকত্বে খুলনা শহরে বসবাস ও বেড়ে ওঠা। ন'চাচা এ এফ এম আব্দুল জলীল সাহেবের বাড়িতে আমার অবস্থান এবং খুলনা সেন্ট যোসেফস্ হাই স্কুলে ভর্তি হই। ন'চাচা এ এফ এম আব্দুল জলীল একজন প্রখ্যাত আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক ছিলেন।

সত্তরের দশকে খুলনা শহরের পরিধি এখনকার মতো এত বড় ছিল না, লোকসংখ্যাও এত বেশি ছিল না। মনে পড়ে তখন খুলনা বড় বাজারে সপ্তাহের প্রতি শনিবার-বুধবার হাট বসতো। চাচা জলীল সাহেব প্রতি শনিবার আমাকে এবং চাচার দুই ছেলে ও একজন বাড়ির কাজের লোককে নিয়ে হাটে বাজার-সওদা করতে আসতেন। পথে অনেকের সঙ্গে চাচার দেখাসাক্ষাৎ সালাম বিনিময় হতো। এর মধ্যে মনে পড়ে স্বনামধন্য কয়েকজন ব্যক্তির কথা। যাঁদের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে তাঁরা হলেন প্রয়াত এ্যাডঃ এস এম এ মজিদ, এ্যাডঃ আব্দুল জব্বার, আবু মহম্মদ ফেরদাউস প্রমুখ। খুলনা শহরের একটি পুরাতন সড়ক কে ডি ঘোষ রোড, প্রখ্যাত বিপ্লবী পরবর্তীতে ঋষি অরবিন্দ-এর পিতার নামে রাস্তাটির নামকরণ করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, কে ডি ঘোষ তৎকালীন খুলনার সিভিল সার্জন ছিলেন। কে ডি ঘোষ রোডের একাংশে বড়বাজার সংলগ্ন স্থানে তৎকালীন সময়ে শনি ও বুধবার হাট বসতো। মনে পড়ে ১৯৬১-১৯৬২-এর মাঝামাঝি সময়ে শনিবারের হাটে এসেছি। তখন কে ডি ঘোষ রোডের দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বে দুটি বইয়ের দোকান ছিল; দক্ষিণ পার্শ্বে মডার্ন বুক ডিপো নামে পরিচিত দোকানটিতে বসতেন শ্রদ্ধেয় আবু মহম্মদ ফেরদাউস। ওইখানেই আমি তাঁকে প্রথম দেখি। ফুলশার্ট-পাজামা পরিহিত ঋজু দেহ। আমাকে দেখিয়ে চাচা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার পিতৃবিয়োগের

কথা বললেন। তিনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন বেঁচে থাক। মানুষের মতো মানুষ হও। সেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ প্রয়াত আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর সঙ্গে। এর পর কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের দিকে ধাবিত এই জীবনপথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, দূর থেকে সালাম দিয়েছি এই পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়।

প্রয়াত আবু মহম্মদ ফেরদাউস তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই প্রগতিশীল রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ভাষা আন্দোলনে একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছিলেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় ১৯৫২ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বক্তৃতার পর কয়েকদিন মিছিল মিটিং ও ধর্মঘটের পর আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রভাষা কমিটি ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ একুশে ফেব্রুয়ারি সারা দেশে বাংলা ভাষা দাবির পক্ষে হরতাল ও মিটিং করবার আহ্বান জানায়। খুলনায় সে আবেদন পৌঁছায়, কিন্তু তৎকালীন নেতৃবর্গ কেউ এগিয়ে আসেন না। তৎকালীন ছাত্রনেতৃবৃন্দের মধ্যে জনাব এম এ গফুর, সাইদুর রহমান সাইদ, এ কে সামসুদ্দিন ওরফে সুনু, এম এ বারী প্রমুখ খুলনায় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। শহরব্যাপী পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে যায়, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন দৌলতপুর বি এল কলেজে ২১শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ছাত্রনেতা মিজানুর রহিম, জাহিদুল হক, নুরুল ইসলাম নান্নু, মালিক আতাহার প্রমুখের নেতৃত্বে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় কয়েকজন ছাত্র ও ব্যক্তির–সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এদের মৃত্যুর খবর খুলনা শহরে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আর এই সংবাদ পাবার পর যুবনেতা ও কর্মী আবু মহম্মদ ফেরদাউস, এস এম এ জলিল ও নুরুল ইসলাম গফুর সাহেবের আস্তানায় হাজির হন এবং আন্দোলনে গফুর সাহেবের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসেন। বিশেষ করে মুসলিম লীগের একজন নামকরা প্রতিষ্ঠিত যুবনেতা আবু মহম্মদ ফেরদাউস এসে আন্দোলনের গতি অনেক সজীব করে দেন। ভাষা আন্দোলনের অংশ হিসেবে তাঁদের নেতৃত্বে তৎকালীন খুলনায় মিটিং মিছিল, হরতাল ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এর পরের ইতিহাস অনেকের জানা, এর আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না।

জনাব আবু মহম্মদ ফেরদাউস আজীবন প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি রাজনীতিতে মোজাফফর ন্যাপের নেতা হিসেবে খুলনায় প্রতিটি বামপন্থি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৫১ সালের প্রথম দিকে তৎকালীন মুসলিম লীগের গুণ্ডাবাহিনী আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে হকিস্টিক দিয়ে মেরে রাস্তায় ফেলে রেখে দেয়। তিনি এক মাস হাসপাতালে থাকার পর সুস্থ হন। এ থেকে বোঝা যায় যে, জনাব আবু মহম্মদ ফেরদাউস তাঁর নীতি-আদর্শের জন্য জীবন বাজি রেখে সামনে এগিয়ে গিয়েছেন। কোনো রকম ভয়ভীতি তাঁকে এর থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। দীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য জীবন ছিল তাঁর। সব কথা এই স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। তবুও তাঁর জীবনসায়াহ্নে জনাব আবু মহম্মদ ফেরদাউস যে নীতি-আদর্শ ও সংগ্রামের পথ দেখিয়ে গেছেন তা কখনই ভুলবার নয়। খুলনা নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয়

কমিটির সভাপতি হিসেবে আমৃত্যু তিনি তাঁর দায়িত্ব, কর্তব্য সক্রিয় থেকে ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন। তা আমরা সকলেই চাক্ষুষ দেখেছি। ধূপ যেমন নিজেকে পুড়িয়ে সুগন্ধ ছড়ায়, পরিবেশকে সুন্দর ও নির্মল করে তেমনি এই মহান সংগ্রামী আদর্শবান ব্যক্তিত্ব জনাব আবু মহম্মদ ফেরদাউস সমাজের মানুষের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। এহেন ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম আমাদের চলার পথের পাথেয় হোক এই কামনা করি।

আব্দুল্লাহ হোসেন (বাচ্চু) : আইনজীবী ও নাগরিক নেতা

রুহুল আমিন সিদ্দিকি

আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে যেমন দেখেছি

আবু মহম্মদ ফেরদাউস সাধারণ ব্যক্তিত্বের মাঝে অসাধারণ একটি নাম। এই মহৎ ব্যক্তিটি কখনও নীতির কাছে মাথা নত করেননি। বহু রাজনৈতিক প্রলোভনকে উপেক্ষা করে সাধারণভাবে সাধারণের মাঝে থাকতে ভালোবাসতেন বলেই অন্যতম প্রধান রাজনীতিবিদ হয়েও ব্যক্তিজীবনে রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করেননি।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি–ন্যাপ বিভক্ত হয়ে ভাসানী ন্যাপ এবং মোজাফফর ন্যাপ গঠন হলে ন্যাপের এক অংশ মোজাফফর ন্যাপের খুলনা জেলার সভাপতির দায়িত্ব এসে বর্তায় তাঁর উপর। তিনি রাজনৈতিক অঙ্গনে দলের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকেও নীতির সাথে আপোস না করে যথারীতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে সম্মত হন এবং সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কিছু দিন বাগেরহাট এলাকায় থাকার পর একদিন দেশমাতৃকার প্রয়োজনে ভারতের উদ্দেশে পাড়ি জমান এবং মুক্তিসংগ্রামে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'–তাঁর একটি প্রিয় রবীন্দ্র সংগীতের কলিগুলো স্মরণ রেখেই এগিয়ে চলতেন।

জীবনসায়াহ্নে এসে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে অবহেলিত খুলনার উন্নয়নকল্পে 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র সভাপতির দায়িত্বে থেকে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

এই মহৎ ব্যক্তির সাথে আমার পরিচয় ঘটে ষাটের দশকে। তিনি অধিক সময় থানার মোড়ে নিজ লাইব্রেরি অথবা প্রেসে সময় ব্যয় করতেন। আমার বিচরণ ক্রীড়া অঙ্গনের সাথে সাংবাদিকতার হাতেখড়ি তখন। লেখালেখির সূত্র ধরেই মূলত পরিচয়। যেহেতু তিনি রাজনীতি করেন এবং এমন একটি দল করেন যে দলের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী জোগাড় করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল, তাই তিনি নিজেও অনেক সময় কর্মীর দায়িত্ব পালন করেছেন দেখেছি।

যেহেতু আমি চিনতাম সেহেতু একদিন বাড়ির কাজের বুয়ার মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করি তাঁর অবস্থা। জেনে আশ্বস্ত হয়েছি। কারণ তাঁরই এক সময়ের রাজনৈতিক সহকর্মী এ্যাডভোকেট আবদুল জব্বার সাহেবকে পাক বাহিনী হত্যা করেছে।

এই ব্যক্তির সান্নিধ্যে আবার আসা পড়ে খুলনার উন্নয়ন সংগ্রামে সম্পৃক্ত হয়ে। তখন তাঁকে অনেক কাছ থেকে অনেক কাছের মানুষ হিসেবে কাছে পেয়ে দেখেছি–একজন

সাধারণ মানুষ কত অসাধারণ হতে পারে। একজন অসাধারণ ব্যক্তির কোনো চাহিদা নেই। অথচ নীতির কাছে হার মানেননি কখনও। এখানেই তাঁর প্রতি মস্তক অবনত হয়ে আসে ভক্তি ও শ্রদ্ধায়।

রুহুল আমিন সিদ্দিকি : ক্রীড়া সংগঠক ও সাহিত্যিক

আশরাফ-উল-আলম টুটু

যিনি কখনোই গণবিচ্ছিন্ন ছিলেন না

আবু মহম্মদ ফেরদাউস সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গেলে, তাঁর জীবন পর্যালোচনা করতে গেলে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। তাঁর মতো সাহসী, একনিষ্ঠ, বহুমুখী-বহুব্যাপী মানুষ, অকপট মানুষ, খুলনাতে খুবই কম জন্মেছে। তিনি যা ভালো মনে করেছেন, তাই করেছেন, তাই করেছেন নিষ্ঠাভরে, দ্বিধাহীন চিত্তে। লোকনিন্দা তিনি কখনোই পরোয়া করেননি। আবার কোনো প্রলোভন, আপোস, সুবিধাবাদ তাঁকে তাঁর চিন্তা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস আমার সহপাঠী মহিউদ্দীনের দুলাভাই। তখন তাঁরা বাবু খান রোডে ভাড়া বাসায় থাকতেন। মহিউদ্দীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ফেরদাউস সাহেবের দুছেলে নান্নু ভাই ও লেনিনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিকভাবে আমি, লেনিন ও নান্নুভাই কাছাকাছি ছিলাম। মহিউদ্দীন ছাত্রলীগ করত। মহিউদ্দীনের নিকট থেকে ফেরদাউস সাহেব সম্পর্কে জানতে পারি। হয়তো ১৯৬৯-৭০ সালের দিকে। দেশে তখন টালমাটাল গণআন্দোলন। গোপন কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত। সর্বত্র মাও সে তুঙের লাল বইয়ের ছড়াছড়ি। নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ। পিকিঙ বেতার যাকে বলেছে 'ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ'। সে সময়ে আমাদের প্রতিদিন কাটত উন্মাদনায়। '১৯৭৫ সালে ভারতের বুকে লালফৌজ পদচারণা করবে' এ স্বপ্নে বিভোর।

১৯৭১-এর ২৬ মার্চ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শুরু। আমরা খুলনা মহানগরী থেকে জনা ১২ তরুণ-যুবক মহিউদ্দীনের গ্রামের বাড়ি শ্রীউলা হয়ে ভারতে গেলাম। মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলাম।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফেরদাউস সাহেবরা প্রকাশ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সংগঠিত করতে শুরু করেন। আর আমরা গোপনে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব' সংগঠিত করতে নিয়োজিত হলাম। ফলে আমাদের রাজনৈতিক দূরত্ব বেড়ে গেল। যদিও তখনকার প্রেক্ষাপটে ফেরদাউস সাহেবরা ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী, কিন্তু তাঁর দ্বারা আমাদের নিরাপত্তা কখনো বিঘ্নিত হয়নি। সে সময়ে তিনি শ্রীশনগরে থাকতেন। তাঁর বাসার সামনেই প্রায়শই একটা বাসায় আমাদের বৈঠকাদি হতো। কিন্তু তাঁকে দিয়ে আমাদের গোপনীয়তা ফাঁস হয়নি।

১৯৮২ সালে হুসাইন মহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখল করল। এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে গণআন্দোলন সংগঠিত হলো। গঠিত হলো ১৫ দলীয় মোর্চা, ৭ দলীয় মোর্চা। এর মধ্যে আবার গোপন বামফ্রন্ট। আমার রাজনৈতিক অবস্থান আমাকে ১৫ দলীয় মোর্চার অন্তর্ভুক্ত করল। এ মোর্চার অন্যতম জনমান্য নেতা ছিলেন ফেরদাউস

সাহেব। অন্যান্য অনেক কেন্দ্রীয় নেতার মতো তিনি শুধু পরামর্শ দিতেন না; সমস্ত বিক্ষোভ মিছিল, পথসভা, কর্মসূচিতে নিজে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করতেন। এরকম একটা বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিতে যেয়ে ১৯৮৬ সালে তিনি গ্রেফতার হন। তখন তাঁর বয়স হয়েছে, ডায়াবেটিসের রোগী। অত্যন্ত নিয়মবদ্ধ জীবনযাপন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জেলে আলাদা কোনো সুযোগ-সুবিধা নেননি। নীরবে সহ্য করেছেন সমস্ত কষ্ট। জেল থেকে বের হয়ে এসে আবার আগের মতোই সক্রিয়।

এরশাদবিরোধী গণআন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তিনি ছিলেন মুক্তচিন্তার অধিকারী। বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্য সত্ত্বেও, তার পরিধির মধ্যেই তিনি মুক্তভাবে সব কিছু বুঝতে চেষ্টা করতেন। রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে তাঁর উদারতা ছিল। কারো ভিতরে ইতিবাচক কোনো সম্ভাবনা দেখলে তিনি তাকে সহায়তা করতেন।

১৯৯০ সালে এরশাদের ক্ষমতাচ্যুতির সময় আমি সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ করি। ব্যক্তিগতভাবে বৈবাহিক সূত্রে তিনি আমার মামাশ্বশুর। আগে ডাকতাম 'ফেরদাউস ভাই' এখন ডাকি 'ফেরদাউস মামা'। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি এ সম্পর্ক পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন আমার অভিভাবক। বিভিন্ন বিষয়ে যখনই তাঁর পরামর্শ চেয়েছি, পেয়েছি।

১৯৯০-এর দশক থেকে বৈশ্বিক সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে, বিশ্বব্যাপী হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশেও তার প্রতিক্রিয়া পড়ে। নামকরা অনেক তাত্ত্বিক মার্কসবাদ ত্যাগ করলেন; ফেরদাউস সাহেবদের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ছোট হয়ে এলো। এ সময়েও আমি তাঁকে কখনো হতাশ হতে দেখিনি। আদর্শ ত্যাগ করার, দল ত্যাগ করার কোনো চিন্তা তাঁর মধ্যে দেখিনি। অনেক ক্ষমতাসীন দলের দরজা সম্মানজনকভাবেই তাঁর জন্য খোলা ছিল। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

তিনি ছিলেন একজন পরিশ্রমী পাঠক। ১৯৬৯ সালে লেনিনের কালেক্টেড ওয়ার্কস আমি সর্বপ্রথম তাঁর বাড়িতেই দেখি। নিয়মিত পড়াশুনার অভ্যাস তাঁর আমৃত্যুই ছিল। তাঁর হাতের লেখা ছিল খুবই সুন্দর।

ফেরদাউস সাহেবের পার্টি পরিধি ছোট হয়ে এলে তিনি অন্যদের মতো হতাশ বা গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি। বরং তিনি বিপরীতমুখী অত্যন্ত সাহসী এক পদক্ষেপ নিলেন। গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলেন 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'।

পুঁজিবাদী উন্নয়ন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে অসম এবং আমাদের বৃহত্তর খুলনা অঞ্চল সেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ উপেক্ষিত। শুধুমাত্র তাই নয়, কাঠামো সমন্বয় নীতি এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলনের প্রক্রিয়ায়, আমাদের অঞ্চলের মিল-কারখানাগুলো একে একে বন্ধ হয়ে যেতে থাকল; মাটি, ব্রিজ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপরিকাঠামোর উন্নয়ন উপেক্ষিত হতে থাকল; গ্যাস, জ্বালানি, পানীয় জল, বিদ্যুতের মতো জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোর সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নয়ন যখন পরিত্যক্ত

হতে লাগল তখন খুলনার উন্নয়নের দাবিতে অগ্রণী সংগঠক হিসেবে গড়ে তুললেন 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'।

বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র অবিসংবাদী সভাপতি হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বজনমান্য। তাঁর নেতৃত্ব ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রশ্নাতীত। খুলনার সকল মহলকে বরং বলা যায় বিভিন্ন বিপরীতমুখী রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিকে তিনি একসূত্রে আবদ্ধ রেখেছিলেন। তাঁদের সবাইকে তিনি সম্মিলিতভাবে চালিত করেছিলেন, খুলনার উন্নয়নের জন্য গণআন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে। ক্রমান্বয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন খুলনার জনগণের, উন্নয়নের মুখপাত্র। তাঁকে অস্বীকার করার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু এ থেকে তিনি কোনো ব্যক্তিগত সুবিধা নেননি। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য আজিজুর রহমানের সাথে কথা প্রসঙ্গে জেনেছি, মৃত্যুর কয়েক মাস আগে, ফেরদাউস সাহেবের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক আলাপচারিতায় নেপালের সাম্প্রতিক গণআন্দোলনে তাঁর আশাবাদ এবং মাওবাদীদের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। এ যেন ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিহীন এক পথিকের ক্রমাগত পথচলা, জীবনের বাঁক ছুঁয়ে চলা, লক্ষ্য যেখানে স্থির কিন্তু পথ আঁকাবাঁকা। যেখানে চলাই জীবন আর থেমে থাকাই হচ্ছে মৃত্যু, পরাজয়।

আশরাফ-উল-আলম টুটু : পরিবেশ ও উন্নয়ন কর্মী

[১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে অকাল প্রয়াণের আগে লেখক এই লেখাটি দেন]

ফিরোজ আহমেদ

মুক্তিযুদ্ধ এবং আবু মহম্মদ ফেরদাউস

বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ অর্জন হচ্ছে আমাদের গৌরবজনক মুক্তিযুদ্ধ। সদ্য প্রয়াত খুলনার সর্বজনশ্রদ্ধেয় আবু মহম্মদ ফেরদাউস ছিলেন সেই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট থানাধীন সোদপুর গ্রামে প্রাক-প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের যৌথ দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টির যৌথ গেরিলা বাহিনীর উক্ত ক্যাম্পের দায়িত্বে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা কমরেড রতন সেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উচ্চতর ট্রেনিং গ্রহণের পূর্বে ওই ক্যাম্পে অনেকের সঙ্গে আমিও কিছুদিন ছিলাম। ইছামতি নদীর পাড়ে একটি চিলেকোঠাসহ একতলা ভবনে ছিল ক্যাম্পটি। চিলেকোঠাতেই সস্ত্রীক ফেরদাউস সাহেব থাকতেন–আমরা সবাই নিচতলায়। যতদূর মনে পড়ে স ম লিয়াকত হোসেন, রফিক উদ্দীন বাবলু, জাহাঙ্গীর আহমেদ, মাওলাদ হোসেন, পনিরউদ্দিন, আনছার আলী এরা আমাদের ক্যাম্পে ছিলেন। সে সময়কার ছাত্র ইউনিয়ন নেতা এ টি এম খালিদ, নূরুজ্জামান বাচ্চু, রশিদ আহমেদ যারা ছিলেন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা–তাঁদের তখন প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁরা অন্য ক্যাম্পে থাকতেন এবং মাঝেমধ্যে আমাদের ক্যাম্পে বেড়াতে আসতেন। আমি কিছুদিন পর ওই ক্যাম্প ত্যাগ করে আসামের তেজপুর সেনানিবাস অধীন সেলোনিবাড়ি কমান্ডো ট্রেনিং সেন্টারে চলে যাই, পরবর্তীতে প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। ক্যাম্পটির মাইল খানেক দূরে টাকি গার্লস স্কুলে ছিল মেজর জলিলের ৯ নং সেক্টরের হেড কোয়ার্টার এবং তার কাছে টাকি জোড়া মন্দির অপারেশন ক্যাম্প। এ মুহূর্তে ওই ক্যাম্পে থাকাকালীন অসংখ্য স্মৃতি আমার চোখের সামনে।

সোদপুর ক্যাম্পে থাকাকালীন প্রতিদিন রাতে আমাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দিতেন কমরেড রতন সেন, আর 'ভিয়েতনামের গেরিলাযুদ্ধের কাহিনী' বই পড়ে আমাদের গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করতেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস। প্রাত্যহিক কাজের জন্য ক্যাম্পে অবস্থানরত আমরা সকলে তিনটি টিমে বিভক্ত ছিলাম, রান্নাবান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ক্যাম্প পাহারা। এই দায়িত্ব প্রতিদিন ভাগ করে দিতেন ফেরদাউস সাহেব। রেশন তোলা ও বাজারের দায়িত্ব ছিল পনির ভাইয়ের। একসঙ্গে খাওয়া, ঘুমোনো, ক্লাস করা এসব স্মৃতি আমৃত্যু মনে থাকবে। কত হবে আমার বয়স? ষোল, বড়জোর সতের। বাড়ির কথা মনে পড়লে মন খারাপ হতো, ফেরদাউস সাহেব নানা গল্প করে মনটি ভাল করে দিতেন। মুক্তিযুদ্ধ এবং ন্যাপের দলীয় কাজের জন্য মাঝেমধ্যে তিনি কলকাতায় যেতেন, ফিরে আসার সময় আমার জন্য নিয়ে আসতেন ছোট কোনো খাবার। ওই সময় কমিউনিস্ট পার্টি 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিল

(বর্তমানে পার্টি পত্রিকার নাম 'একতা') দাম ১০ পয়সা। ওই পত্রিকা সপ্তাহে বিক্রি করার জন্য ট্রেনে-ট্রেনে বা শরণার্থী শিবিরে ঘুরতাম। একবার পত্রিকা বিক্রি করতে গিয়ে গভীর রাতে ক্যাম্পে ফিরে রতন সেনের বকুনির হাত থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন। আমার প্রতি এই পিতৃস্নেহের কারণ ছিল তাঁর পুত্র লেনিন (ড. সাজ্জাদ জহির) আমার বাল্যবন্ধু, একসঙ্গেই আমরা জোসেফ স্কুল ও ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে পড়েছি। শৈশবে বন্ধুর বাবা হিসেবে তাঁকে চিনতাম, দূর থেকে দেখতাম। সরাসরি পরিচয় হয় উনসত্তর সালে তাঁর ইস্টার্ন প্রেসের ছাদে ছাত্র ইউনিয়নের এক সভাতে। তখন তিনি ন্যাপের শীর্ষ নেতা। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে এ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একজন প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রোজ্জ্বল। ওই ক্যাম্পে থাকাকালীন বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে ঘুরে ঘুরে প্রচার করে ছাত্র-তরুণদের উদ্বুদ্ধ করে তিনি আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসতেন। এ রকম বহু তরুণ তাঁর কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের সঙ্গে তাঁর ছিল সখ্য। ফলে নানাভাবে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মোজাফফরের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ গড়ার কাজে—ত্রাণ কর্মকাণ্ডে, দলীয় ও প্রশাসনের দুর্নীতি রোধে খুলনাতে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট (আওয়ামী লীগ-ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি) নেতা হিসেবে তিনি অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। খুলনায় সমস্ত দলমতের লোককে একত্রিত করে খুলনার প্রতি বৈষম্য দূর করার জন্য তিনি আমৃত্যু শ্রম দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় হতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কখনও স্তিমিত হয়নি। মৃত্যুর পর মুক্তিযুদ্ধের এই মহান সংগঠক রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাননি সত্য কিন্তু ইতিহাসে তাঁর অবদান একদিন অবশ্যই স্বীকৃতি পাবে।

ফিরোজ আহমেদ : আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও সাবেক ছাত্রনেতা

কুদরত-ই-খুদা

আবু মহম্মদ ফেরদাউস এবং উন্নয়ন-আন্দোলন

বৃহত্তর খুলনার উন্নয়ন-আন্দোলনে যে কয়েকজন ব্যক্তির অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করতে হয় তাদের মধ্যে অন্যতম আবু মহম্মদ ফেরদাউস। আবু মহম্মদ ফেরদাউস আজ আমাদের থেকে অসীম দূরত্বে সৃষ্টির অমোঘ নিয়মে অপ্রতিরোধ্য এক জগতের বাসিন্দা। কিছুদিন আগেও শ্রদ্ধেয় এই মহান ব্যক্তিটি আমাদের স্মৃতিতে নয়, ছিলেন স্পর্শে। এখন তিনি আমাদের কাছে শুধুই স্মৃতি, আমাদের অনুপ্রেরণা। দীর্ঘ কর্মময় জীবনে এই মহান ব্যক্তি ছিলেন সততা, নিষ্ঠা এবং আদর্শ ব্যক্তিত্বের সমুজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ রাজনৈতিক কর্মী, ভাষাসৈনিক এবং মুক্তিযোদ্ধা। সর্বোপরি ১৯৮৯ সালে তৎকালীন সিটি কর্পোরেশনের বর্ধিত কর প্রত্যাহারের আন্দোলন থেকে অঙ্কুরিত বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির প্রাণপুরুষ এবং প্রতিষ্ঠা থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এ সংগঠনের সভাপতি।

১৯৮৯ সালে তৎকালীন পৌর কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক নগরবাসীর কাছ থেকে বর্ধিত কর আদায়ের প্রতিবাদে খুলনা শহরে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল আবু মহম্মদ ফেরদাউস ছিলেন তার অন্যতম সংগঠক। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৮৯ সালের ২০ জুলাই খুলনার বিশিষ্ট নাগরিকদের উপস্থিতিতে, খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সভায় মরহুম এ এইচ দেলদার আহমদকে আহ্বায়ক করে তিনি সে দিন 'বর্ধিত পৌরকর প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করেছিলেন এবং বর্ধিত পৌরকর বাতিলের দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। জনগণের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে মাত্র এক মাস পাঁচ দিনের মধ্যেই ২৪ আগস্ট '৮৯ তারিখে পৌর কর্পোরেশনের মেয়র বাধ্য হয়েছিলেন খুলনাবাসীর দাবির প্রতি সমর্থন জানাতে এবং বর্ধিত পৌরকর বাতিল করতে। সেদিনের এ আন্দোলনে খুলনা শহরের প্রায় ১৭ হাজার বাড়ির মালিক অতিমাত্রায় বর্ধিত কর প্রদানের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

১৯৭১ সালে এ দেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিল পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল লক্ষ্য ছিল এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যেখানে শোষণ থাকবে না, বঞ্চনা থাকবে না। যে রাষ্ট্র হবে কর্মসংস্থানের, যে রাষ্ট্র হবে সম-উন্নয়নের। জনগণের মতামতই যেখানে সর্বোচ্চ প্রাধান্য পাবে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীনতার পর জনগণের সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বরং দেশে একটি স্বৈরশাসন চেপে বসেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড, পর্যায়ক্রমে খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদের অপশাসন, জিয়াউর রহমানের

হত্যাকাণ্ড, এরশাদের স্বৈরশাসনসহ আরো অনেক ঘটনার ভিতর দিয়ে এ দেশের রাজনীতিতে সৃষ্টি হলো ক্ষমতা দখলের একটি অসুস্থ লড়াই। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বৃদ্ধি পেল আঞ্চলিকতার মনোভাব। নতুন আঙ্গিকে শুরু হলো এক ধরনের স্বজনপ্রীতি এবং অঞ্চলভেদে বৈষম্য নীতি। এর প্রথম শিকার হলো এ অঞ্চলের মানুষ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হলো এতদঞ্চলের শিল্পকলকারখানা।

বৃটিশ শাসন আমল থেকেই খুলনা অঞ্চল ছিল ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ খুলনা জেলার সাথেই রয়েছে দেশের ২২টি জেলার সরাসরি নদী সংযোগ। এ অঞ্চলেই রয়েছে প্রাকৃতিক সমুদ্রবন্দর মংলা। এ অঞ্চলেই রয়েছে পৃথিবীর বিখ্যাত জীববৈচিত্র্যের সুন্দরবন এবং দুটি স্থলবন্দর–সাতক্ষীরার ভোমরা ও যশোরের বেনাপোল। এসব গুরুত্ব বিবেচনায় তখন থেকেই বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন কলকারখানা, বস্ত্রশিল্প, লবণশিল্প, ঔষধশিল্প, পর্যায়ক্রমে পাটকল, হার্ডবোর্ড মিল, নিউজপ্রিন্ট মিল, শিপইয়ার্ডসহ অনেক ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে তখন মানুষ এখানে আসতো কর্মসংস্থানের জন্য। স্বাধীনতা পরবর্তী সেই খুলনা অঞ্চল গুরুত্বহীন হতে হতে আজ কর্মশূন্যতার একটি শহরে পরিণত হয়েছে।

১৯৮৯ সালে বর্ধিত পৌরকর প্রতিরোধ আন্দোলনের পর আবু মহম্মদ ফেরদাউস উপলব্ধি করলেন দীর্ঘদিন যাবৎ খুলনা অঞ্চলের প্রতি রাষ্ট্র এবং সরকারের যে অবহেলা এবং যেভাবে এ অঞ্চলকে অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চনা করা হচ্ছে এর থেকে মুক্তি পেতে হলে দলমতনির্বিশেষে, সকল মানুষের অংশগ্রহণে একটি ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। সেই চেতনা থেকেই ১৯৮৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির জন্ম হলো। ওই সভায় আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে সভাপতি, মরহুম মোহাম্মদ আলী, এম নুরুল ইসলাম, কাজী আব্দুস সালামকে সহ-সভাপতি, মরহুম এ কে সামসুদ্দিন (সুনু ভাই)-কে সদস্য-সচিব এবং হাফেজ আব্দুল করিমকে কোষাধ্যক্ষ করে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে বাগেরহাট জেলার এডঃ সামসুল হক, সাতক্ষীরা জেলার সাবেক গণপরিষদ সদস্য মরহুম স ম আলাউদ্দিনকে সহ-সভাপতি করে 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি' নামকরণ করা হয়। বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি এ অঞ্চলের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সর্বপ্রথম ১৮টি দাবি ঘোষণা করে। সেগুলো হচ্ছে–

০১। ক) অবিলম্বে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপদান করা।

খ) সিটি, সুন্দরবন এবং আলিয়া মাদ্রাসাকে সরকারি কলেজে উন্নীত করা।

০২। খুলনার বন্ধঘোষিত মেডিকেল কলেজ পুনরায় চালু করা।

০৩। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করা।

০৪। ক) নগরীতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।

খ) গ্রামাঞ্চলে খাবার পানির জন্য নলকূপ খনন করা।

০৫। ক) মংলা বন্দর সংলগ্ন নদীতে জমাকৃত পলি অপসারণ করা এবং স্থায়ীভাবে ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা করা।

খ) মংলাকে আধুনিক বন্দরে রূপান্তরিত করা।
গ) মংলার সাথে খুলনার রেল সংযোগ স্থাপন করা।

০৬। রূপসা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ করা।
০৭। শহর রক্ষা বাঁধ ও রুজভেল্ট জেটি নির্মাণ করা।
০৮। খুলনা-মাওয়া সড়ক নির্মাণ কাজ শেষ করা।
০৯। রূপসা-বাগেরহাট রেললাইন চালু করা।
১০। বিল ডাকাতিয়ার জলাবদ্ধতা দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা করা।
১১। খুলনায় বিমানবন্দর নির্মাণ করা।
১২। অন্যান্য কর্পোরেশনের অনুরূপ খুলনা পৌর কর্পোরেশনের অনুদান ৫০ কোটি টাকা অনুমোদন করা।
১৩। ক) হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ, মেরিন কোর্ট, শিপিং অফিস ও প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল কোর্ট স্থাপন করা।
খ) খুলনায় ক্যাডেট কলেজ ও মেরিন একাডেমি স্থাপন করা।
১৪। রেশনিং এলাকায় বসবাসকারীদের রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করা এবং নিয়মিত রেশন সরবরাহ করা।
১৫। বিভাগীয় সদরের সাথে জেলাসমূহের যোগাযোগ উন্নয়ন এবং উপজেলার সাথে জেলার সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন করা।
১৬। ক) বাগেরহাট-সাতক্ষীরার উন্নয়ন এবং এ অঞ্চলের শিল্প সম্ভাবনা যাচাই করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
খ) বাগেরহাট-সাতক্ষীরা এবং সুন্দরবনের সাগরতীরে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা।
গ) সাতক্ষীরায় মৎস্য প্রজনন ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা।
ঘ) বাগেরহাট-সাতক্ষীরা অঞ্চলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করা।
১৭। বিদ্যুৎ ঘাটতি কমানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।
১৮। খুলনায় কেন্দ্রীয় মসজিদ, কেন্দ্রীয় পার্ক, পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন, রেললাইনসহ রূপসা ব্রিজ, ইপিজেড স্থাপন করা। (এই দফার মধ্যে কয়েকটি দাবিকে একত্র করা হয়েছে)

সংগঠনের জন্ম থেকে বিগত দিনের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে এর মধ্যে অনেকগুলো দাবি ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিছু কিছু দাবি আজও বাস্তবায়ন হয়নি।

৯০ দশকে যখন খালিশপুর অঞ্চলে জুট মিল, নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড মিল একে একে বন্ধ হবার উপক্রম হলো, তখন জুটমিলগুলো চালু রাখার অন্যতম আর একটি দাবি উন্নয়ন- আন্দোলনের সাথে যুক্ত হলো। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গ্যাস সরবরাহের দাবি, আবু নাসের হাসপাতাল চালুর দাবি, মাওয়ায় পদ্মা সেতু নির্মাণের দাবি, আকরাম পয়েন্টে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের দাবি, খুলনায় ওয়াসা স্থাপনের দাবি, রেলওয়ের অব্যবহৃত জমিতে পরিকল্পিত উন্নয়নের দাবি, খুলনায় আইটি ভিলেজ স্থাপনের দাবি, ভোমরা বর্ডারের অবকাঠামো উন্নয়নের দাবি, বিভাগীয় স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইট লাগানোর

দাবিসহ আরো অনেক দাবি উন্নয়ন আন্দোলনের দাবি হিসেবে সংযোজিত হলো। এগুলোই এখন খুলনা উন্নয়নের অন্যতম দাবি হিসেবে চিহ্নিত।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস প্রতিটি আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছেন। তিনি কমিটির সকল নেতা-কর্মীদের সাথে নিয়ে দৃঢ়তার সাথে অনশন, অবরোধ, মিছিল, হরতাল, আবার কখনো কখনো সরকার ও প্রশাসনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দাবিসমূহ আদায়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় ২০০৩ সালে ২৭ আগস্ট পাটকল বন্ধের প্রতিবাদে উন্নয়ন কমিটি হরতাল আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। সেদিন হরতাল করতে গিয়ে উন্নয়ন কমিটির মহাসচিব শেখ আশরাফ-উজ-জামানসহ অনেকে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় মাওয়ায় পদ্মা সেতু নির্মাণের দাবিতে মাওয়ায় পদ্মা নদীর পাড়ে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। ২০০৫ সালে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অধিকাংশ জেলার লক্ষাধিক লোকের সমাবেশই সেদিন মাওয়ায় পদ্মা সেতুর গুরুত্ব কতটুকু তা তৎকালীন সরকারকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিল। সেদিনের সেই সমাবেশের ফলে মাওয়ায় পদ্মা সেতু নির্মাণ আজ সফলতার রূপ পেতে যাচ্ছে।

রূপসা নদীতে সেতু নির্মাণের সর্বপ্রথম দাবি উঠেছিল ১৯৫৪ সালে। এরপর দীর্ঘ পরিক্রমায় এর কোনো অগ্রগতি হয়নি। বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠনের পর আবু মহম্মদ ফেরদাউস রূপসা সেতু নির্মাণের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ১৯৯০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ও ৩ আগস্ট এবং ১৯৯২ সালের ৩ জুন খুলনায় হরতাল কর্মসূচি দিয়েছিলেন। ১৯৯০ সালের ৩ মার্চ এবং ৩১ মে হাদিস পার্কে অনশন করা হয়েছিল। একই বছরে ২৬ মার্চ ঢাকায় গণঅনশন ও প্রেস-কনফারেন্স করা হয়েছিল। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে মিছিল, স্মারকলিপি প্রদান, প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ এসবও ছিল ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ। ২১ মে ২০০৫ দীর্ঘ ১৫ বছর আন্দোলনের ফসল আমাদের স্বপ্নের রূপসা সেতুর উদ্বোধন করলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এর ভিতর দিয়ে বিজয় হলো উন্নয়ন আন্দোলনের আর একটি দাবির। উন্মোচিত হলো এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নেবার আর একটি নতুন সম্ভাবনা।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস এ অঞ্চলের উন্নয়নের প্রশ্নে ছিলেন আপোসহীন এবং সোচ্চার এক কর্মী। স্থানীয় অনেক সমস্যার সমাধানে তিনি সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে থেকেছেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেখানেই নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন, যেখানে বঞ্চনার প্রশ্ন সেখানেই ছুটে গিয়েছেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস। তিনি খুলনায় বিদ্যুতের লোডশেডিং-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন, রূপসা ঘাটে টোল আদায়ের নামে নিরীহ জনগণের হয়রানি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, বাংলাদেশ ম্যাচ ফ্যাক্টরি বন্ধ হওয়ার প্রতিবাদে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো, বিল ডাকাতিয়ার সংগ্রামী মানুষদের বাঁধ কাটা আন্দোলনে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহস দেয়া, খুলনা হার্ডবোর্ড মিল পানির দামে বিক্রি করার অপপ্রয়াস রুখে দিতে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানো, সরকারি বি এল কলেজে নতুন নতুন কোর্স চালুর দাবিতে ছাত্রদের সমর্থন করা, কেডিএ-র বিভিন্ন কাজে সহায়তা করা, শহর প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণে জটিলতা সৃষ্টি হলে তৎকালীন পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সিটি

কর্পোরেশনের মেয়রের সাথে বৈঠক করে সমস্যার সমাধান করা সহ স্থানীয় অনেক সমস্যার সমাধানে তিনি কখনও ব্যক্তিগতভাবে, কখনও সাংগঠনিকভাবে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস আমাদের মাঝে নেই। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন আপোসহীন উন্নয়ন কর্মীকে হারিয়েছি। একজন আদর্শ নেতাকে হারিয়েছি। তিনিই এ অঞ্চলের মানুষদের সম-উন্নয়ন এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছেন। তিনি আন্দোলন করে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন যে–অধিকার সবসময় আপনা-আপনি আসে না, কখনো কখনো আন্দোলন করে আদায় করে নিতে হয়। বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে আবু মহম্মদ ফেরদাউস যে আলোর মশাল আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তা আমাদেরকে সমুন্নত রাখতে হবে। উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া, উন্নয়ন-আন্দোলন তার সাথে সমানভাবে কার্যকর থাকতে হবে। বিগত দিনের উন্নয়ন-আন্দোলন এ অঞ্চলের মানুষের মনে যে আস্থার সৃষ্টি করেছে, তা আমাদের টিকিয়ে রাখতে হবে।

কুদরত-ই-খুদা : আইনজীবী ও উন্নয়ন-আন্দোলন সংগঠক

সৈয়দ আলী হাকিম

খুলনার চেতনা : আবু মহম্মদ ফেরদাউস

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে খুলনা শহর এলাকার জনপদের বিস্তৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে আর তখন থেকেই এলাকার মানুষের নানামুখী সমস্যা, অধিকার পূরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মানুষের বিবিধ সমস্যা ও অধিকার পূরণের জন্য এ অঞ্চলের যে সকল নিবেদিত প্রাণ মানুষ নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আবু মহম্মদ ফেরদাউস অন্যতম।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস ১৯২৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। খুলনার ফুলতলা উপজেলার আটরা তাঁর পিতার বাড়ি। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, বরিশাল জিলা স্কুল প্রভৃতি স্কুল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়া শেষ করে ভর্তি হন খুলনা বি এল কলেজে। এই কলেজ থেকে ১৯৪৩ সালে শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্ম ও রাজনৈতিক জীবনে সম্পৃক্ত হন। অবশ্য তিনি বি এল কলেজে পড়াশুনা করার সময়ই মুসলিম ছাত্রলীগের সাথে সক্রিয়ভাবে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আবু মহম্মদ ফেরদাউস মুসলিম স্বার্থসংশ্লিষ্ট লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রেখে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৪৬ সালে গোটা ভারতের বিভিন্ন অংশে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তিনি তার চরম বিরোধিতা করেন। ১৯৪৬ সালে খুলনায় কংগ্রেসের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার অভিযানে জনাব নওশের আলী এলে তাকে বাধা দেয়া হয়। এতে করে রোকন উদ্দিন, আফিল উদ্দিন ও আবু মহম্মদ ফেরদাউসসহ কয়েকজন আহত হন। ১৯৪৭ সালের ঐতিহাসিক জুন ঘোষণায় বড়লাট লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন খুলনাকে পাকিস্তান বহির্ভূত রাখলে খুলনার মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ জনাব এস এম এ মজিদ, এ্যাডঃ দেলদার আহমদ, আব্দুল হক চৌধুরী, সৈয়দ মোস্তাগাওছল হক, এ এফ এম আব্দুল জলীল, সরদার নকীব উদ্দিন, আব্দুল হামিদ, এ বি এম রোকন উদ্দিন, আফছার উদ্দিন, আফিল উদ্দিন, আবুল হাসেম প্রমুখের সাথে আবু মহম্মদ ফেরদাউস তার প্রতিবাদ করেন এবং বেলভেডিয়ার হাউসে স্থাপিত সালিশী আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নেন। এ্যাডভোকেট জনাব আব্দুল মজিদ (এখনও জীবিত) সাহেবের মৌলভীপাড়ার বাসভবনে বসে সৈয়দ আব্দুল হালিম সাহেব বিশ পাতার এক খসড়া আবেদনপত্র লেখেন এবং আবু মহম্মদ ফেরদাউস সেচ বিভাগের অংকন বিশারদদের সহায়তায় মুসলিম প্রধান অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করে ওই আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করে দেন। আইনজীবী হামিদুল হক চৌধুরী আদালতে তা পেশ করেন। এই মামলার শুনানিতে খুলনার অনেক আইনজীবীর সাথে শেরেবাংলা ও তার সহকারী এ এম সায়েম (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি) অংশ নেন। কলকাতায়

এ আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন জনাব খান এ সবুর। ১৭ই আগস্ট খুলনা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবু মহম্মদ ফেরদাউসের এই অবদান খুলনাবাসী কোনো দিন ভুলবে না।

১৯৫২ সালে আমাদের অহংকার–আমাদের ভাষা আন্দোলন। এই ভাষা আন্দোলনে আবু মহম্মদ ফেরদাউস সাহেবের ছিল অসামান্য অবদান। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সারা দেশব্যাপী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে হরতাল, মিছিল সমাবেশের কর্মসূচি ছিল। ঢাকায় গুলি চলে, ২৩ ফেব্রুয়ারি বর্তমান শহীদ হাদিস পার্কে এর প্রতিবাদে অন্যান্যদের সাথে আবু মহম্মদ ফেরদাউসও বক্তব্য রাখেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি খুলনায় সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। হাদিস পার্কের জনসভায় আবু মহম্মদ ফেরদাউস বক্তব্য রাখেন। তিনি খুলনা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। আবু মহম্মদ ফেরদাউসের বিরুদ্ধে সে সময় রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয়, একপর্যায়ে তাকে তৎকালীন সরকার পক্ষের লোকেরা পিটিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে। আবু মহম্মদ ফেরদাউস বাংলাদেশের অন্যতম ভাষাসৈনিক।

১৯৪৮ সালের পর থেকে আবু মহম্মদ ফেরদাউস মুসলিম লীগ ত্যাগ করে বাম রাজনীতির ধারার সাথে যুক্ত হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্টের পক্ষ অবলম্বন করেন। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির খুলনার সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হলে তিনি খুলনা জেলা শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় আবু মহম্মদ ফেরদাউস খুলনায় আট দলের সমন্বয়ে গঠিত ডেমোক্র্যাটিক একশন কমিটি-এর অন্যতম সদস্য হিসেবে আন্দোলন করেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে কয়েকবার কারাবরণও করতে হয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আবু মহম্মদ ফেরদাউস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করা, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা, নিজে প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সবই তিনি করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ কর্মবীর থেমে থাকেননি। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে তিনি সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। খুলনা অঞ্চলে পুস্তক ব্যবসার উন্নয়নে তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। বাস মালিক সমিতি, রাইস মিল মালিক সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সাথেও তিনি একাত্ম হয়ে রাজপথে নেমেছিলেন। শুধু দেশীয় নয় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়েও আবু মহম্মদ ফেরদাউস সাহেবের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যেত।

সর্বাপেক্ষা যে কারণে মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে খুলনাবাসীর মনের মণিকোঠায় চিরস্মরণীয় করে রাখবে তা হলো ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে তাঁর ভূমিকা। বৃহত্তর খুলনা তথা বাংলাদেশের দক্ষিণ-

পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা, বঞ্চনা, অগ্রগতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এ অঞ্চলের আর দশ জন সচেতন মানুষের সাথে তাকেও আন্দোলন সংগ্রামে দেখা গেছে। বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ১৮/১৯ দফা দাবি আদায়ের নানামুখী কর্মসূচিতে তিনি সার্বক্ষণিক কাজ করেছেন। বার্ধক্যজনিত নানাবিধ অসুখ-বিসুখ শরীরে নিয়ে খুলনাবাসীর আন্দোলনে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। আর এসব কারণেই আবু মহম্মদ ফেরদাউস হয়ে উঠেছিলেন খুলনাবাসীর চেতনার প্রতীক, ঐক্যের প্রতীক। দলমত- নির্বিশেষে খুলনার সকল মানুষ তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

খুলনার এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর ৮৩ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে খুলনা পশ্চিম বানিয়াখামার মেইন রোডের নিজ বাসভবনে ভোর ৫টার দিকে ইন্তেকাল করেন (ইন্না.......রাজেউন)। মহান আল্লাহর কাছে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করি।

সৈয়দ আলী হামিদ : কবি ও শিক্ষক

এস এম সোহরাব হোসেন

আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে যেভাবে দেখেছি

মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে আমার স্বল্প সময়ের আলাপচারিতায় যেভাবে দেখেছি তার কিছু বর্ণনা তুলে ধরলাম। আমি লেখাপড়া ও খেলাধুলা অসমাপ্ত রেখেই ১৯৯১ সালের জুন মাসে ফার্নিচার-এর ব্যবসা শুরু করি। ১৯৯৬ সালে বানিয়াখামারের মুসলমানপাড়ায় বিবাহের সূত্র ধরে ফেরদাউস সাহেবের সাথে পরিচয় ঘটে। তিনি তখন কয়েকবার আমার দোকানে এসেছেন এবং আমি তাঁর বাসায় বেড়াতে গিয়েছি। যাওয়া-আসার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বাড়ির কিছু আসবাবপত্র মেরামত ও সরবরাহ করার সৌভাগ্য হয়েছে বিধায় তাঁর কথা ও নীতিতে আমি দারুণভাবে খুশি হই। তিনি যে কথা ও কাজে এক ও অদ্বিতীয় তার প্রমাণ আমি নিজে। আস্তে আস্তে তাঁর কর্ম, দায়িত্ববোধ ও সাংগঠনিক দক্ষতার কথা আমি লোকমুখে শুনি। তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শিতা আমাকে আরো বিমোহিত করে। তখন আমি আরও জানতে পারি যে, উনি খুব সৎ, ন্যায়বান, নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা এবং ওনার হাতে অনেক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তারই একটি বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি।

আসবাবপত্র ব্যবসা শুরুর পর আমি ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০০ সালে পোল্ট্রি ও ফিস ফিড ব্যবসা শুরু করি এবং খুলনা পোল্ট্রি ও ফিস ফিড দোকান মালিক সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করি। ২০০২ সালের ৩১ অক্টোবর পোল্ট্রি সমিতির সকল পর্যায়ের সদস্যবৃন্দ প্রথম নির্বাচনে আমাকে সেক্রেটারি পদে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানালে মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর শরণাপন্ন হই। তাঁর বুদ্ধি ও পরামর্শে নির্বাচনে অংশগ্রহণে মনস্থির করে সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুতি নেই। অনেকের সাহায্য সহযোগিতা ও তাঁর অনুপ্রেরণায় আমিসহ আমার নেতৃত্বে থাকা পরিষদের সকল কর্মকর্তা বিপুল ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হই। মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউস ওই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানালে পরক্ষণে পায়ের ধুলো ও দোয়া নিতে তাঁর বাসায় গেলে নিজ হাতে মিষ্টি খাওয়ান এবং বলেন : শুধু পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন করলে চলবে না, সাথে সাথে খুলনার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাঁর ওই দিনের আদেশ-নির্দেশ জানি না কতটুকু পূরণ করতে পেরেছি। তবে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। ওই দিনের কথা আজও আমাকে উদ্বেলিত ও আলোড়িত করে। তাঁর আহ্বান ও উন্নয়ন কমিটির তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় তাঁর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সদস্য পদ গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কমিটির কর্মসূচিতে আমি নিজেকে সম্পৃক্ত করে আজীবন সদস্য পদ লাভ করি এবং অনেক দিন পর ২০০৭-২০০৮ বর্ষে উন্নয়ন কমিটির কার্যকরী পরিষদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মরহুম আবু

মহম্মদ ফেরদাউস সাহেবের অসমাপ্ত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করার চেষ্টা করছি।

গত ৩০ জানুয়ারি '০৫ খুলনা পোল্ট্রি ও ফিস ফিড দোকান মালিক সমিতির ২য় নির্বাচনে আমি আবারও সেক্রেটারি জেনারেল পদে প্রার্থী হই। তখন ফেরদাউস সাহেব শারীরিকভাবে খুবই দুর্বল ও অসুস্থ ছিলেন। প্রায় সময় খুলনার বাইরে অর্থাৎ পরিবারের সদস্যবৃন্দ ঢাকায় থাকার কারণে ঢাকায় ছিলেন। আমি ফোনে কয়েকদিন চেষ্টার পর সাক্ষাৎ পেলাম। দোয়া-উপদেশ চাইলে তিনি বলেছিলেন, 'সোহরাব তুমি ভালো কাজ করেছ' একটি অপরিচিত ও অবহেলিত পোল্ট্রি ও ডেইরি শিল্পকে তোমার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অচেনা সংগঠনের মাধ্যমে খুলনাসহ সমগ্র দেশে পরিচিত করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছ। আমি মনেপ্রাণে দোয়া করি তুমি আবার বিজয়ী হবেই ইনশাল্লাহ। তাঁর দোয়ায় ও সকলের সহযোগিতা ও আল্লাহর ইশারায় পুনরায় আমিসহ আমার পরিষদের কর্মকর্তাগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এখন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে আসছি। মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউস সাহেবের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলাপ ও স্মৃতি আমাকে অনুপ্রাণিত করে। তার মধ্যে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করব। গত ২০০৪ সালের ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কমিটির জাতীয় সম্মেলন ওসমানী মিলনায়তন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ এ্যাসোসিয়েশনের খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী নির্বাচিত করা হয় এবং সম্মাননা প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। সম্মেলনে আমি বক্তৃতাও করি। উক্ত সংবাদ তিনি টেলিভিশনে দেখে আমাকে ফোন দিয়ে জানান, সোহরাব তুমি খুলনার মুখ উজ্জ্বল করেছ। আমি তোমাকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখে খুবই খুশি হয়েছি। তোমাকে যোগ্য স্থানে যারা মনোনীত করেছে তারা ঠিক কাজটিই করেছে। তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ! এই বলে এ দিনের কথা শেষ করলেন। আরেক দিনের কিছু কথা বলেই আমার লেখাটি শেষ করব।

সময় ও তারিখ সঠিক মনে নেই। তবে একটি পড়ন্ত বিকেলে হঠাৎ আমার দোকানের সামনে একটি রিক্সায় করে এলেন। আমাদের সকলের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, স্পষ্টভাষী, দূরদর্শিতায় পারঙ্গম, বর্ষীয়ান নেতা মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউস সাহেব। কুশলাদি বিনিময়ের মধ্যেই তিনি আমাকে বললেন, 'সোহরাব চা-নাস্তা আন' 'তোমার সাথে কিছু জরুরি কথা বলব'। আমি যথারীতি তাঁকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করি এবং তিনি বলতে থাকেন তাঁর সংগ্রামী জীবনের অনেক অজানা কথা। দেশের সাধারণ মানুষ কীভাবে মুক্তি পাবে? কী করা উচিত, সরকার কী করছে, আমাদের কী কী করা উচিত। ধর্মবর্ণনির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা। উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠার ইতিকথাসহ অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি আলোচনা করলেন এবং আমার মতামত চাইলেন। আমি বললাম আমার কোনো মতামত নেই, তবে অনেক কিছু জানলাম যা হয়তো আগামী চলার পথে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজে দিবে।

আমার চলার পথে সামান্যতম সময়ের পরিচয়ে সহানুভূতি, বুদ্ধি-পরামর্শ, উপদেশ,

মহানুভবতা, উদারতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা দেখে আমি বিমোহিত হয়ে আদর্শের মূর্ত প্রতীক হিসেবে আজও জানি। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। তাঁকে পরম করুণাময় আল্লাহ বেহেশতবাসী করুক এই কামনা করি। তাঁর লালিত স্বপ্নের পুণ্যভূমি খুলনার সার্বিক উন্নয়ন বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠিত মুখপাত্র সংগঠন বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তির দিকে যতই অগ্রসর হবে মরহুম আবু মহম্মদ ফেরদাউসের আত্মা ততই শান্তি পাবে।

এস এম সোহরাব হোসেন : ব্যবসায়ী নেতা

ইসমাইল হোসেন

আবু মহম্মদ ফেরদাউস : জীবনস্মৃতি ও কিছু কথা

১৯২৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি শনিবার মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে মাতুলালয়ে আবু মহম্মদ ফেরদাউস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস খুলনার ফুলতলা উপজেলার আটরা গ্রামে। পিতা মরহুম একরাম উদ্দিন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলিম সমাজের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। মাতা মরহুমা মেহেরুন্নেছা ছিলেন গৃহিণী। চাকুরিজীবী বাবার এক সময়ের কর্মস্থল ঢাকায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯৪১ সালে বরিশাল জিলা স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন।

১৯৪২ সালে খুলনা বি এল কলেজে আইএস-সি অধ্যয়নরত অবস্থায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গা তাঁকে প্রতিবাদী করে তোলে এবং তিনি মুসলিম ছাত্রলীগে যোগদানের মধ্য দিয়ে সরাসরি ছাত্র রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। ১৯৪৩ সালে মুসলিম ছাত্রলীগের খুলনা জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পান। ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে খুলনায় প্রথম যে আন্দোলন হয়েছিল তার সঙ্গে ছিলেন আবু মহম্মদ ফেরদাউস। তিনি খুলনা জেলা ভাষা-সংগ্রাম কমিটির সদস্য ছিলেন। তখন নগরীর আহসান আহমেদ রোডে আজাদ গ্রন্থাগার কার্যালয়ে এক রুদ্ধদ্বার সভায় পাইকগাছা নিবাসী আব্দুল গফুরকে আহ্বায়ক করে ভাষা-সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়।

১৯৫৭ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি–ন্যাপ গঠনের পর থেকে আবু মহম্মদ ফেরদাউস ন্যাপের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ-এর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের খুলনা জেলা শাখার সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৭ সালে ন্যাপ বিভক্ত হলে তিনি মোজাফফর আহমেদ-এর নেতৃত্বাধীন ন্যাপের খুলনা জেলা কমিটির সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর তিনি ন্যাপের কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। ৬০-এর দশকে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আইয়ুববিরোধী ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে তাঁর ভূমিকা ছিল অসাধারণ।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ৭১-এর মার্চের পর আত্মগোপন অবস্থায় তিনি বাগেরহাটের চিতলমারী থেকে ভারতে চলে যান। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরে আসেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা সদর-২ আসনে ন্যাপের প্রার্থী হিসেবে কুঁড়েঘর প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত একই আদর্শে অবিচল থেকে তিনি তাঁর মেধা এবং শ্রম দেশ ও মানুষের সেবায় নিবেদন করেছেন। অসম্ভব দেশপ্রেম ও মানবতাবোধে উজ্জীবিত হয়ে অধিকার আদায়ে জীবনভর রাজপথই ছিল তাঁর সঙ্গের সাথী। সততা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং দায়বদ্ধতার কারণে অসুস্থতা ও বার্ধক্য তাঁকে ঘরের চার দেয়ালের ভেতর আটকে রাখতে পারেনি। জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি খুলনার স্থানীয় সমস্যা তথা অনুন্নয়ন তাঁকে ব্যথিত করে তোলে। তাই খুলনার স্থানীয় সমস্যা নিরসনে ১৯৮৯ সালে তিনি বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠন করে নিরলস আন্দোলন করে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বর্ধিত পৌরকর প্রত্যাহার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, খুলনা রূপসা ব্রিজ, বিমানবন্দর স্থাপন ইত্যাদি খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির আন্দোলনের অন্যতম সাফল্য। তিনি খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির আজীবন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে ৮০ দশকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার কারণে বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে। শিকার হতে হয়েছে পুলিশি হয়রানির। শত ব্যস্ততার মাঝেও থেমে থাকেনি তাঁর পত্র-পত্রিকা, দেশ-বিদেশের বই পড়ার অভ্যাস। তাঁর সংগ্রহের দুর্লভ সব বই-এর ভাণ্ডার যেন একটা সৃজনশীল লাইব্রেরি। লেখালেখির অভ্যাস না থাকলেও ভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ছাত্র সমিতির ১৯৮৭ সালের একটি প্রকাশনায় ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করে 'ভুলি নাই' শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর সংস্পর্শে যে না এসেছে সে তাঁর জ্ঞানের ব্যাপ্তি সম্পর্কে বুঝবে না।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ যখন গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রইকা মতবাদ দিয়েছিলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ভাঙনের মুখে তখন তিনি বলেছিলেন 'গর্বাচেভকে নো এবং ক্যাস্ট্রোকে ইয়েস বলো'। সমাজ পরিবর্তনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তিনি আঞ্চলিক ভাষায় প্রায়ই বলতেন, 'এই সমাজের নৈচে-খোল পাল্টানো ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই'। বিপ্লবী চে গুয়েভারাকে তিনি তাঁর জীবনের আদর্শ মানুষ হিসেবে মনে করতেন।

খুলনার প্রথম অটোমেটিক রাইস মিল, প্রথম আন্তর্জাতিক মানের হোটেল রূপসা, বাস ও বই-এর ব্যবসা, ইস্টার্ন প্রেস ইত্যাদি ব্যবসার মাধ্যমে রাজনীতির পাশাপাশি সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বেশ কয়েক বছর পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতির খুলনা জেলার সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি আশির দশকে খুলনা নাট্য নিকেতনের সভাপতি ছিলেন। প্রথম দিকে তাঁর উপর মুসলিম লীগের আক্রোশ, হামলা, মামলা তাঁকে দারুণভাবে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত করে। সে সময়ে মুসলিম লীগের গুণ্ডারা কয়েকবার সশস্ত্র হামলা চালিয়ে তাঁকে মারাত্মকভাবে আহত করে। এসব চড়াই-উতরাই-এর পরও রাজনীতি, দেশ ও মানুষের সেবা করা ছিল তাঁর ধ্যান ও ব্রত।

এই সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, চার মেয়ে ছাড়াও অসংখ্য কর্মী,

সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। আবু মহম্মদ ফেরদাউস ১৯৬৪ সালে জাপান, ১৯৭৫ সালে নিজে এবং ১৯৮৬ সালে সস্ত্রীক মস্কো সফর করেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানবমুক্তির সংগ্রামে নতুন প্রজন্ম যুগে যুগে এগিয়ে আসবে, চিরঅম্লান হয়ে থাকবে আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর নাম ও স্মৃতি।

ইসমাইল হোসেন : সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটি

গৌরাঙ্গ নন্দী

একজন সংগ্রামী মানুষ : আবু মহম্মদ ফেরদাউস

ছাত্রজীবন যখন শেখার সময়, তখুনি তিনি অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের কথা শিখেছিলেন। শুধু শেখেননি, নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন। ছাত্রজীবন থেকেই নিজেকে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলেন। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ধারা বজায় রেখেছিলেন। শেষের দিকে সঙ্গত কারণেই বয়সের ভারে তিনি বেশ কাবু হয়ে পড়েন। তাই বলে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামের কথা ভুলে যাননি। এই মানুষটি আর কেউ নন, খুলনাবাসীর কাছে অতিপরিচিত নাম আবু মহম্মদ ফেরদাউস।

খুলনা শহরের অদূরে আটরা এলাকায় তাঁদের পৈতৃক বাড়ি। তবে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন মাতুলালয়ে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামে। দিনটি ছিল শনিবার। ১৯২৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। পিতা একরামউদ্দীনের বদলির চাকুরির সুবাদে লেখাপড়া করেছেন দেশের নানা শহরে। স্কুল জীবন কেটেছে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও বরিশাল জিলা স্কুলে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর ভর্তি হন দৌলতপুর বি এল কলেজে। তখুনি শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জীবন। নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও সাংগঠনিক দক্ষতার গুণে অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম ছাত্রলীগের জেলা স্তরের প্রথম সারির নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। খুবই ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন পাকিস্তান আন্দোলন, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রতিবেশী ও বন্ধুদের দেশত্যাগ, প্রতিবেশী দেশ থেকে দলে দলে শরণার্থীদের জড়ো হওয়া প্রভৃতি।

লেখাপড়ার পাঠ শেষ করে ১৯৪৩ সালে আবু মহম্মদ ফেরদাউস পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তবে রাজনীতি থেকে পিছিয়ে আসেননি। যুক্ত হন মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সাতচল্লিশের দেশভাগ তথা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে আমাদের আজকের বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর তিনি মুসলিম লীগের সবুর খান বিরোধী গ্রুপে যোগ দেন। খুলনার ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠক হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর জীবনের অন্যতম একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে খুলনার প্রথম মিছিলে নেতৃত্ব দেয়া। ১৯৪৮ সালে এই আন্দোলনটি দানা বেঁধে ওঠে। এ সময়ে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলার পুলিশ সুপার এক সভা আহ্বান করেন। এতে মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস সমন্বিতভাবে একটি যৌথ ইশতেহার উপস্থাপন করে। এই ইশতেহারটি প্রণয়নে তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এটি দেখে এসপি মহিউদ্দিন বেশ ক্ষেপে ওঠেন। ওই রাতেই শহরে তাঁর শ্রীশনগরের বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি চালানো হয়। ছ'ঘণ্টা ধরে পুলিশ বাড়িটির প্রতিটি জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে। বাড়িতে না থাকায় আবু মহম্মদ ফেরদাউস রক্ষা পেয়ে

যান। তবে পুলিশ তাঁর ডায়েরি ছাড়াও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নিয়ে যায়। বায়ান্নর ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার রাজপথ ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত হলে এর প্রতিকার-প্রতিবাদে খুলনার মানুষকে সংগঠিত করতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তখন তাঁদের নেতা ছিলেন এম এ গফুর। তাঁরা আড্ডা জমাতেন তৃপ্তিনিলয় নামের একটি রেস্টুরেন্টে। সেখানেই ২১ ফেব্রুয়ারি রাতের বৈঠকে ঠিক হয় পরদিন শহরের সকল স্কুল-কলেজে ঢাকার কথা বলে ক্যাম্পেইন করা হবে এবং শিক্ষার্থীদের ক্লাস বর্জনের আহ্বান জানানো হবে। যথারীতি পরদিন খুলনার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্লাস ক্যাম্পেইন হয় এবং শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে শহরের রাস্তায় বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে। শিক্ষার্থীদের এই ক্লাস বর্জনের কর্মসূচি একটানা চার-পাঁচ দিন চলেছিল। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে খুলনাবাসীর একাত্মতার বিষয়টি মুসলিম লীগ নেতারা ভালোভাবে মেনে নিতে পারেনি। তারা আন্দোলনের নেতাদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু করে। আবু মহম্মদ ফেরদাউস এই রোষানল থেকে রেহাই পাননি। মুসলিম লীগ নেতা সবুর সমর্থক গুণ্ডাদের হাতে তিনি প্রহৃত হন। কিন্তু তাই বলে আন্দোলন থেকে পিছু হঠেননি।

পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালে তিনি ন্যাপের রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। মওলানা ভাসানী ও অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমেদ পৃথক অবস্থান নিলে তিনি অধ্যাপক মোজাফ্‌ফরের পক্ষ নেন। একটানা প্রায় চল্লিশ বছর মোজাফ্‌ফর ন্যাপ খুলনা জেলা শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সমাজের বেশির ভাগ মানুষের শুভকামনাই তিনি করেছেন। তাঁর বিশ্বাস রাজনীতিকরাই দেশ গড়ে তোলেন, দেশের নীতি-আদর্শ তুলে ধরেন। এ কারণে রাজনীতির মাধ্যমে দেশের মানুষের সেবা করতে চেয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধেও তিনি যথাসম্ভব তাঁর ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরেন। যুদ্ধের একেবারে শুরুর দিকে একজন ইপিআর সদস্যকে সহায়তা করার অপরাধে (!) আবু মহম্মদ ফেরদাউসের বাসভবনে পাক সেনারা হামলে পড়ে। তারা বাড়িটির ক্ষতিসাধন করে। এরপর তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান। বাগেরহাটের সুগন্ধী, চিতলমারী এলাকায় কিছু কাল অবস্থান করে তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় ঠাঁই নেন। সেখানে কমরেড রতন সেনের সঙ্গে লেনিন স্কুলে অবস্থান করতেন। পরে যান টাকিতে। সেখানে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপিত হয়। সেখানে যুবকদের যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। কলকাতা ও সোদপুর ক্যাম্পের দায়িত্ব ছিল এই নিষ্ঠাবান রাজনীতিকের ওপর। স্বাধীন হওয়ার পর দেশে ফিরে তিনি খুলনা উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেন।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমাদের দেশটি সকল কুসংস্কারমুক্ত ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন-স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা করেছিলেন। কিন্তু ৮২ বছরের জীবনকালের শেষ দিকে তিনি কেমন যেন মিয়ে পড়েন। দেশ ও জাতি সম্পর্কে যা চেয়েছিলেন, তা ঠিক পাননি বলে তিনি মনে করতে শুরু করেন। রাজনীতিকদের সততা, আন্তরিকতা, মানুষের প্রতি অঙ্গীকারেও সমস্যা আছে বলে তিনি মনে করতেন। রাজনীতিকদের মধ্যে ন্যূনতম কোনো সমঝোতা না দেখে তিনি খুব পীড়িত বোধ করতেন। খুলনার আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও স্থানীয় রাজনীতিকরা যথাযথ ভূমিকা পালন করেনি বলে তিনি মনে করতেন।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন–কেসিসির বর্ধিত ট্যাক্স বাতিলের দাবিতে আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রেক্ষাপটে ১৯৮৯ সালে এ কারণে তিনিই গড়ে তোলেন 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। তখন থেকে আমৃত্যু তিনি এই কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে উন্নয়নের দাবি আদায়ের সংগ্রামে তিনি সকল দল-মত-পথের মানুষকে শামিল করেছিলেন। এই কমিটি এখন খুলনার সিভিল সমাজের বৃহত্তম সংগঠন। শেষ দিকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি রাজপথের কর্মসূচিতে থাকতে পারতেন না। তবে সকল বিষয়ে সবসময় খোঁজখবর রাখতেন। শুধুমাত্র খুলনা নয়, গোটা দেশের হাল-হকিকত সম্পর্কে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত খোঁজখবর রেখেছেন। সকল ক্ষেত্রে আদর্শহীনতা মনের অজান্তেই তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর এই বেদনাটি ছিল। সংগ্রামী এই মানুষটি ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬-এর ভোর পৌনে পাঁচটার দিকে খুলনা শহরের আমতলা মোড়ের নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে অশেষ শ্রদ্ধা।

গৌরাঙ্গ নন্দী : সাংবাদিক

নিবেদিত পঙ্‌ক্তিমালা

ফজল মোবারক

গাছ নেই ছায়া আছে

(রাজনীতিক সমাজসেবী আবু মহম্মদ ফেরদাউস স্মরণে)

যে ছিল মাটির কাছাকাছি
স্মৃতির শহর জুড়ে
প্রচণ্ড মানুষ
ফানুস উড়িয়েছিল দক্ষিণ আকাশে–

ভৈরবের কূল ছুঁয়ে রূপসার কূলে
দুলে উঠেছিল তার
অগ্নি শপথ,
দুখীর দুয়ার ঘুরে
বুক ভরে নিয়েছিল
প্রান্তিক জীবনের বারুদ নিঃশ্বাস–

কুঁড়েঘর ছিল তার প্রতীকী ঠিকানা
তাকে আজো আমাদের
হয়নিতো জানা
দিগন্ত বিস্তৃত সেই বটবৃক্ষ নেই,
পড়ে আছে আদিগন্ত মায়াবী ছায়া

ফজল মোবারক : কবি ও চিকিৎসক

বিষ্ণুপদ সিংহ

একজন স্পার্টাকাস

(আবু মহম্মদ ফেরদাউস স্মরণে)

ফাগুন আকাশে আগুন বাতাসে মুকুল বারুদ গন্ধ
পাখিরা উদভ্রান্ত নয় বরং গভীর আত্মমননে উড়ে যায়
শস্যকণা ঠোঁটে এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে,
এক মোহনা থেকে অন্য মোহনায়
নদী চলে জাগিয়ে কত চর বুকে।
নতুন জনপদ সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক পত্তনে
পরচা পূর্বপুরুষের রক্ত ক্ষরণের ঐকান্তিক
একলব্য ওই বিশাল আকাশ বুকে কার ছায়া এক প্রতিবাদী প্রতিরোধ বিপ্লবী
কালপুরুষ বৃশ্চিক রাশি আক্রান্ত
সময়ের জলে ছুটে যায় বিদ্রোহী কমরেড
শত, তারা সব নিজের সমিধ কাঠে
অনির্বাণ, সমৃদ্ধ জীবনযাপন প্রাত্যহিক নগর যন্ত্রণায়
সমাহিত চেতনার মুক্তির মিছিল নিয়ে চলে
যে সৈনিক, রক্তাক্ত বুকে দাবি মানুষের, গণতন্ত্রের,
স্পার্টাকাস হারে না কখনো, কৃপণের মতো একে একে
মাটি খুঁড়ে দেখে, পুরাতন মুখ-রেখা, প্রতিরোধের মতো
সুন্দর আগুন, বল্লমের ফলায় গেঁথে রাখে মানুষের অনাদিকালের গর্ব,
তুমি পৃথিবীর গর্বিত সন্তান, আকাশ-ছোঁয়া অবয়ব তুলে ধর,
আর এই মাটি, শস্য, ধান, কৃষক, শ্রমিক সংগ্রামী জনতাকে
নিয়ে গেছো স্বাধীন সূর্যের কাছে, নত হওনি তুমি কোনো রক্তচক্ষু
স্বৈরাচারের ভ্রুকুটির কাছে, ভেঙেছো নিরেট দেয়াল
সাম্প্রদায়িকতার, মৌলবাদ, শোষণ, নির্যাতন,
ঘাত সংঘাতের বিরুদ্ধে আমরণ এক পদাতিক যোদ্ধা,
এক আপোসহীন মুক্ত স্বাধীন স্পার্টাকাস।
বল আর কী দিয়ে ভূষিত করবে, আর কী থাকবে আত্মার তিমিরে?
আমি সংশপ্তক, আমি আর্তনাদ করেছি
আমি প্রতিবাদ করেছি, আমি বিদ্রোহ করেছি
আর আমার প্রতিবাদ বিদ্রোহ আর্তনাদ

সেই মৃত্যুর মধ্যে, পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তের দাগ
গায়ে মেখে নাও, জীবন আর মৃত্যুর চূড়ান্ত সঙ্গীত
গ্রেনেডের মতো মুখে করে বুকে হেঁটে যাও
নতুন সাহসী এক পৃথিবী নির্মাণে।
জীবন চ্যালেঞ্জ, জীবন স্পর্ধা, জীবন প্রতিবাদ,
জীবন প্রতিরোধ, মিছিল, স্লোগান, বিক্ষোভ, জিরো পয়েন্ট
জীবন যুদ্ধ, জীবন সংগ্রাম
জীবন মুক্তি, জীবন স্বাধীনতা
জীবন প্রেম, জীবন ভালোবাসা
তোমাদের ভালোবেসেছিলাম চাঁপার গন্ধের মতো
সূর্যের আলোর মতো, লেলিহান শিখার মতো
রক্তের মতো, নিঃশ্বাসের মতো
শস্যের মতো, ফলের স্তব্ধতার মতো
বন্দীর চোখে মুক্তির স্বপ্নের মতো
আমি আমৃত্যু তোমাদের ভালো দিন দেব বলে লড়েছি,
দিন বদলের পালায় আমি ছিলাম এই শহরে এক স্পার্টাকাস।

বিষ্ণুপদ সিংহ : কবি

এস এম রফিকুল আলম

অমরাত্মা

(আবু মহম্মদ ফেরদাউস স্মরণে)

জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে
জনারণ্যে অব্যক্ত-ক্রন্দনে
বেদনার দীর্ঘশ্বাসে
তোমার অমর আত্মা,
আশীর্বাদ-উষ্ণীষ-শোভায়
চিরস্থায়ী শান্তির দিশায়
জনপ্রিয়-অন্তরের
মায়াজাল-ছিন্নতায়
সুদূরে মিলায়।

পত্রিকার সচিত্র-পাতায়
তোমার সুদৃঢ় চিত্রে
চাউনির প্রগাঢ় দৃঢ়তায়
সবার অন্তর-পটে
এঁকে রেখে যায়,–
সকল সৃষ্টির সেরা
মানবের মঙ্গলে
অনির্বাণ শিখা নিয়ে
জীবন-প্রদীপ যেন
জ্বলে বসুধায়।

এস এম রফিকুল আলম : কবি ও শিক্ষক

স্বজন কথা

ড. নাজমুল আহসান

আবু মহম্মদ ফেরদাউস : একজন সাংস্কৃতিক সংগঠক

যে কোনো সৃষ্ট আন্দোলন বা কাজের মূলে থাকে কতিপয় অবস্থা ও ব্যক্তির অবদান। ১৮৮৪ সালে খুলনা পৃথক জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। আর জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর ১৯০০ সালে খুলনা জেলা শহরে শুরু হয় নাট্য আন্দোলন। শিল্প-সংস্কৃতি যেকোনো একটি অবস্থার আবর্তনে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে। শিক্ষার প্রভাব, সভ্যতার প্রভাব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক ও তার প্রভাবে এই শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নব্য চেতনার সূচনা ঘটে থাকে। ১৯০০ সালে নির্মিত বর্তমান নাট্য নিকেতন খুলনা শহরের নাট্য আন্দোলনে ও সংস্কৃতিচর্চায় একটি অসম্ভব রকম ভূমিকা রেখে এসেছে। খুলনা শহরের নাট্য আন্দোলন ও তার পটভূমির ঐতিহাসিক প্রমাণপত্রের সবকিছুর মধ্যে এই সংগঠন এক মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। মানুষ তার প্রয়োজনে সকল কার্যক্রমের সূচনা করে। সকল কাজের ধারাবাহিক স্থিতির জন্য বিনোদনের প্রয়োজন। আর এই বিনোদনের বিভিন্ন মাধ্যমের একটি হলো নাটক এবং থিয়েটার। যে সময়কালের পটভূমিতে খুলনা শহরের নাট্য আন্দোলনের সূচনা, যার উপর কলকাতাকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ বাবু থিয়েটার থেকে জাতীয় নাট্যশালা প্রবর্তনের সূচনা এবং সমস্ত আন্দোলন ও শিক্ষিত সমাজের জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার বাস্তবমুখী উপকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হয় এই শিল্প মাধ্যমটি। আর তাই মহকুমা থেকে জেলা শহর প্রবর্তনের যাত্রাপথে আগত বসতি এবং শিক্ষিত বাবু ও জমিদারসহ শিক্ষিত নব্য চেতনার তরুণ, মধ্যবয়সী সকলের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে খুলনা শহরের নাট্য আন্দোলনের পটভূমি। এই পটভূমির অধিকতর প্রয়াসে লক্ষণীয় ছিল নিজেদেরকে ইংরেজদের ভাব, ভাষা, শিল্পসহ সকল শিক্ষা-সংস্কৃতিচর্চার সাথে পাল্লা দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিমণ্ডলে উজ্জীবিত হওয়ার প্রত্যয় ও সংগ্রাম। আবু মহম্মদ ফেরদাউস এই নাট্য নিকেতনে দীর্ঘ সময় ধরে একজন সক্রিয় সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা, যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের একটি ধারাবাহিকতা তৈরিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। যে সময় তিনি ও অন্যান্যরা এই প্রতিষ্ঠানে সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন–তাঁরা শুধু সংস্কৃতি অঙ্গনেরই লোক ছিলেন না, খুলনা শহরের মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন বিশেষ ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। আবু মহম্মদ ফেরদাউস দীর্ঘ সময়কাল ধরে নাট্য নিকেতনের সক্রিয় সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন।

পারিবারিক সূত্রে আবু মহম্মদ ফেরদাউসকে যখন থেকে দেখার ও জানার সুযোগ হয়েছে, তখন আমার কিছুই ভালোভাবে মনে পড়ে না। শুধু মনে আছে, কলকাতা থেকে বড় বড় শিল্পীরা আসতেন, বিশাল আয়োজন হতো এবং তখনকার অধিকাংশ রাজনীতির

সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট থাকতেন এবং আয়োজনে সহযোগিতা করতেন। পরিবারের বহুজন সেসব অনুষ্ঠান উপভোগ করতে যেতেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর উদার মনোভাব এবং অনুষ্ঠান উপভোগে উদ্বুদ্ধকরণে যথেষ্ট ভূমিকা থাকত। প্রসঙ্গটা এ কারণেই যে, তাঁর প্রগতিশীল মানসিকতা এমনভাবে তাঁকে প্ররোচিত করত যে, রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মেয়েদের বা ঘরের বউদের যখন বাইরে বেরিয়ে নাটক-থিয়েটার উপভোগ করা বা সিনেমা দেখা ছিল যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতাশ্রয়ী, তখন তাঁর এই ধরনের সংশ্লিষ্টতা, ভূমিকা তাঁর উদার মনের পরিচয় বহন করে যা অবশ্যই প্রশংসনীয়। আমি দেখেছি খুলনা শহরের অনেক মহিলা ও পুরুষ নাট্যশিল্পী ও কর্মী আবু মহম্মদ ফেরদাউসের সঙ্গে ওঠা-বসা করেছেন এবং তাঁর বাসায় আসতেন। আমার আরও মনে আছে, পরিবার থেকে অনেক নাট্যশিল্পীদের সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংকের পাশে অবস্থিত লেডিস পার্কের উঁচু চত্বরে ঘুরতে গিয়েছি বহুবার। আবু মহম্মদ ফেরদাউস ছিলেন অত্যন্ত যুগোপযোগী মানসিকতার মানুষ। কলকাতায় যখন ঘূর্ণায়মান নাট্যমঞ্চের সূচনা হয়, তিনিও খুলনা নাট্য নিকেতনের অভ্যন্তর মঞ্চে ঘূর্ণায়মান নাট্যমঞ্চ তৈরির জন্য একজন প্রথম সারির উদ্যোক্তা ছিলেন। আমার ব্যক্তিগতভাবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হওয়ার সময়কালে একটি সেমিনারে তাঁর বক্তব্য শোনার সুযোগ হয়েছিল। অনুষ্ঠানটি ছিল বিভাগীয় নাট্য ওয়ার্কশপ। খুলনা নাট্য আন্দোলনের প্রাথমিক ধারায় যেসব পরিস্থিতি ও পরিবেশ তাঁদেরকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল এবং পরবর্তীতে নাট্য আন্দোলনের নব্য ধারায় যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে, সেই নব্য জোয়ারকে তিনি অতি স্বাভাবিকভাবে স্বাগত জানাতে পেরেছিলেন–যে বিষয়টি অনেকের মধ্যে খুব কম দেখা যায় অর্থাৎ গতানুগতিক ধারায় চলমান শ্লথ কর্মধারার বিপক্ষে যা তিনি সহজে মেনে নিতেন না। সংস্কৃতিচর্চা করতে গিয়ে তিনি ধর্মান্ধ মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিতে চাননি। চাননি মৌলবাদী আগ্রাসন, তবে ধর্মকে তিনি উপেক্ষা করেননি। তাঁর নাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভূমিকাটি নিঃসন্দেহে অনেক বড় মাপের ছিল। আমার ছোটবেলায় তাঁর নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহের মধ্যে মাও সেতুংয়ের কালচারাল রেভ্যুলিউশন এবং বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট এবং ভি আই লেনিন ও তাঁর উপর রচিত পুস্তকাবলী সবকিছু সংগ্রহে আমার মনে হতো–এগুলো দিয়ে কি হয়! এখন মনে হয়, প্রগতিশীল মানসিকতা অর্জনে, প্রেক্ষাপট পরিবর্তনে, সামাজিক-রাজনৈতিক ও ব্যক্তি মানসিক পরিবর্তন সাধনে এ সমস্ত পুস্তক তথা তার লব্ধ জ্ঞান তাঁকে অনেক বড় করে ভাবতে শিখিয়েছিল। তাই শিল্প-সংস্কৃতি ও নাট্য আন্দোলনে একটি সময়কালে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ, বলিষ্ঠ ভূমিকা, সহযোগিতা, মতামত খুলনা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে একটি সময়কাল পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস ব্যক্তিগতভাবে শিল্পী ছিলেন না, তবে শিল্পের প্রতি অনুরাগপুষ্ট একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ ছিলেন। তিনি শিল্পচর্চা, সঙ্গীত, নাটক এবং শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত গুণী ও আগ্রহীজনদেরকে ভালোবাসতেন। তাঁর কর্মজীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে যারা তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মরহুম আফসার উদ্দিন আহমেদ, মরহুম হাবিবুর রহমান

মেজভাই ও মরহুম আহসান আহমেদ রতন একদিকে ছিলেন তাঁর সহযোগী সংগঠক এবং তাঁদের অনেকেই ছিলেন ভালো অভিনেতা। তিনি এমনই মানুষ ছিলেন, নবীন-প্রবীণ উভয়ই তাঁর কাছে ছিল বন্ধুর মতো। তাঁরই সান্নিধ্যে পরবর্তীতে নাট্য নিকেতন ও খুলনার নাট্য অঙ্গনে যারা ভালো কাজ করেছেন–মরহুম মোঃ এনামুল হক মিলু, শেখ সিরাজুল ইসলাম, সুকুমার সমাদ্দারের নাম উল্লেখ না করলেই হয় না। খুলনা শহরের নাট্য আন্দোলন পর্যালোচনা করতে গেলে এককভাবে খুলনা নাট্য নিকেতনের ইতিহাস কার্যক্রম পর্যালোচনা না করলেই যেমন হয় না, তেমনি আবু মহম্মদ ফেরদাউসসহ আরো অনেক ব্যক্তিত্ব যাদের ভূমিকার কথা অস্বীকার করা যায় না।

চমৎকার ছিল তাঁর সমালোচনা, চমৎকার ছিল তাঁর উপলব্ধি। আহরিত উপলব্ধিবোধ থেকে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মূল্যায়নগুলো ছিল একটি শিক্ষণীয় অনুশীলন। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে সংস্কৃতির ভূমিকা যে অনেক বড় অবদান রাখে, সেই উপলব্ধিবোধ থেকে সংস্কৃতিচর্চার আন্দোলন, সংস্কৃতিকে বেগবান, নাটককে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান–সকল কাজে আবু মহম্মদ ফেরদাউস-এর ভূমিকা সংস্কৃতিসেবী, তরুণ ছাত্র সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও অসাম্প্রদায়িক মানুষের কাছে একটি গঠনমূলক ধারাবাহিক পরিবেশ হয়ে বেঁচে থাকবে অনেক অনেক কাল।

ড. নাজমুল আহসান : পরিচালক, লোসাউক ও আবু মহম্মদ ফেরদাউসের ভাইপো

আশরাফুন্নেছা দুলু

আমাদের দাদা

আজ ৫ই জানুয়ারি '০৭ সাল, শুক্রবার। আমাদের দাদা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন ১৩ই ডিসেম্বর '০৬ মাত্র ২৩ দিন আগে। আজ তাঁর চেহলাম। আমাকে বলা হলো দাদার সম্বন্ধে কিছু লিখে দিতে। সময় এক মাস। স্মারকগ্রন্থের জন্য।

দাদার সম্পর্কে আমি কী বলব। আমি কতটুকুই বা জানি। তবে ততটুকু জেনেছি, যতটুকু তাঁর সান্নিধ্যে যেতে পেরেছি, তাতে মনে হয়েছে সব সময় আবু মহম্মদ ফেরদাউস মানে একটি বিশাল জ্ঞানের সাগর। সেই জ্ঞানের সাগরের তীরে হেঁটেছি অনেকবার। দূর থেকে দেখেছি আর অবাক হয়েছি। বিভিন্ন চরিত্রের সমাহার। কখনও অত্যন্ত কঠোর। কখনও মাখনের মতো নরম। কখনও শিশুর মতো সরল। যাহোক বলছিলাম তাঁর সেই জ্ঞানের অপার সীমার কথা। আমি সেই সাগর তীরে হেঁটেছি অনেকটা সময়, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে তার থেকে দু'চারটি নুড়িও কুড়িয়ে আনতে পারিনি। হয়তো এটা আমারই দুর্ভাগ্য।

যতটুকু জানি দাদা বহির্জগতে খুবই খোলামেলা ছিলেন। তাঁর ভালোবাসাও ছিল সার্বজনীন, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ তাঁর কাছে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। সব মানুষের জন্য তাঁর হৃদয় ছিল অবারিত–উদার–উন্মুক্ত। কিন্তু আমাদের বৃহত্তর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে কেন জানি ভয়ই করে চলত বলেই আমার মনে হয় যে কারণে তাঁর ভাই-বোনদের কোনোদিন দেখিনি কোনো ব্যাপার নিয়ে সরাসরি দাদাকে কোনো প্রশ্ন করতে। দাদা তাদের কাছে একটা বিরাট কিছু। আর আমরা ঘরের বউরা তাঁকে সেই সনাতনী বাঙালি পরিবারের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মাথায় কাপড় দিয়ে ঘোমটার আড়াল থেকেই দু'চারটি কথা ছাড়া খুব একটা খোলামেলা আলোচনা করেছি বলে মনে পড়ে না। আমার মন মাঝেমধ্যে এই প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। সেটা একান্তই আমার অনুভূতি। আমি ভাবতাম দাদা তো দাদাই। দাদা মানে বড় ভাই। বড় ভাই তো বাবারই মতো। তবে কেন এত শঙ্কা। কেন এত বাধা। কেন দাদা তাঁর সেই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আমাদের কিছু কিছু জ্ঞান দান করেন না। আমার সেই জ্ঞানপিপাসু মন প্রায়ই অনেক কিছু জানতে চাইত দাদার কাছে। কিন্তু না, সেই সনাতনী প্রথার বেড়াজাল ভেঙে আমি কোনো দিনই সেই মহাজ্ঞানীর দরজায় পৌঁছাতে পারিনি। এটা আমার অক্ষমতা। তবুও দাদার সঙ্গে আমার এই দীর্ঘ ৪৪ বছরের টুকরো টুকরো যে স্মৃতি আছে তাইবা কম কী। সেটুকু থেকেই দু'চারটা তুলে ধরবার চেষ্টা করব।

দাদার মধ্যে ছিল আকাশের মতো এক বিশাল হৃদয়। কিন্তু কোথায় যেন আরো একটি প্রচণ্ড অভিমানী মনও কাজ করত অত্যন্ত গোপনে। যাঁরা তাঁর একান্ত কাছে যাবার

সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাই এই হৃদয়টির সন্ধান পেয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের মা'র (শাশুড়ির) কাছে শুনেছি–ছোটবেলায় দাদা সব সময় অংকে ১০০-তে ১০০ই পেতেন। যদি কোনো টার্মে ৯৯ বা ৯৮ পেতেন তবে সারাদিন তিনি কান্নাকাটি করতেন। নিজের পরে অভিমানে খেতেন না দু'বেলা। অত্যন্ত মেধাবী এবং জেদি থাকার জন্য পরের টার্মে ঠিকই প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে ১০০ মার্কস নিয়ে আসতেন। শুধু অংকেই নয় অন্যান্য সব সাবজেক্টেই দাদা সর্বোচ্চ মার্কস পেতেন। হাতের লেখাও ছিল অপূর্ব। ছোটবেলা থেকেই দাদা ভালো গান গাইতেন। গান ভালোবাসতেন। সংস্কৃতিবান একটি মন তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছিল সেই ছোটবেলা থেকেই। যেকোনো সুন্দর জিনিসের প্রতি তাঁর মন আকৃষ্ট হতো। তিনি সুন্দরের পূজারি ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই দাদা খুব মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন। ঢাকায় তাঁদের নারিন্দার ভাড়া বাসার সামনে দাদার জন্য একটি মাসকাবারী মিষ্টির দোকান ছিল। ওখান থেকে মিষ্টি, বাখরখানি, কাবাব যত খুশি খাবেন দাদা, মাস শেষে টাকা পরিশোধ করা হতো।

এখানে আমি আর একটি মূল্যবান তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি। আমরা জানি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেছিলেন, 'আমাকে তোমরা ভালো মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি ভালো জাতি দেব।' আমাদের দাদা মেহেরুন্নিছা নামে সেই মায়ের প্রথম সন্তান যে মা সেই পর্দা প্রথার যুগে ইডেন গার্লস স্কুলে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া মুসলিম নারী। সেই সময়ের পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থী। এক অপূর্ব হাতের লেখার অধিকারিণী ছিলেন। সেকালে সব সাবজেক্ট ইংরেজিতে পড়তে হতো বলে মায়ের আর পড়া হয়নি। মার কাছে শুনেছি তিনি যখন রান্না করতেন এক হাতে চুলোর লাকড়ি ঠেলতেন, আর পাশে বসিয়ে তাঁর আদরের খোকাকে পাঠদান করতেন। আমাদের আব্বা (শ্বশুর) যেহেতু স্কুল পরিদর্শক ছিলেন, সরকারি কর্মচারি, বদলির চাকুরি, আজ এখানে তো কাল ওখানে। কাজেই বাচ্চাদের সব দায়দায়িত্ব ভাড়া বাসায় মাকে একাই বহন করতে হতো। একজন শিক্ষিত মা হওয়ার জন্যই তিনি এমন একজন ফেরদাউসের জন্ম দিতে পেরেছিলেন। আজ আমরা দাদার স্মৃতি রোমন্থনের সঙ্গে সঙ্গে সশ্রদ্ধ চিত্তে সেই গর্বিত মা ও আব্বাকে স্মরণ করছি।

আমাদের আব্বার একান্ত ইচ্ছে ছিল তাঁর খোকাকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন। দাদার যে মেধা ছিল তাতে ইঞ্জিনিয়ার কেন আরো অনেক-অনেক বড় কিছু হয়তো হতে পারতেন, যদি না ১৯৪১ সালে আইএস-সি পড়াকালীন সময়ে বি এল কলেজে মুসলিম ছাত্রলীগে যোগদানের মাধ্যমে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতেন। এ সময় থেকেই তাঁর সমস্ত মেধা তিনি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়ে উৎসর্গ করেন। তাই বলে পরিবারের প্রতি তিনি অবহেলা করেননি। ছোট ছোট ভাই-বোনদের তিনি উচ্চশিক্ষিত করেছেন। আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী বলে মনে করি। কারণ আমি একমাত্র সেই বধূ এই পরিবারের, যাকে শুধু দাদা পছন্দ করেছেন ভ্রাতৃবধূ হিসেবে। দাদার আগ্রহেই আমি এমন একটি সুন্দর পরিবারের বধূ হয়ে এ পরিবারের সদস্য হতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করি।

১৯৬২ সালে আমি তখন সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। দাদা আর মা গিয়েছেন কনে

পছন্দ করতে। দাদা শুধু পছন্দ করেই ক্ষান্ত হননি, সরাসরি আমার স্কুলে (গভঃ করোনেশন স্কুল) গিয়েছেন আমার হেডমিস্ট্রেস হাসিনা আপার কাছে, খবর নিতে আমার সম্বন্ধে। পরবর্তীতে আমি খেয়াল করেছি দাদার অনেক ক্ষেত্রে আমার ওপর কেমন যেন একটা নির্ভরতা ছিল পরোক্ষভাবে। যেমন ১৯৬৯ সালে–দাদা তখন মোজাফ্ফর ন্যাপের জেলা কমিটির সভাপতি। সময়টা জানুয়ারি মাস। একদিন সকাল ৭টার সময় পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে দাদা এলেন, আমাদের শ্রীশনগরের বাসায়। পুলিশ নিচের তলায় বাড়ি ঘিরে রেখেছে। দাদা উপরে এসে কেঁদে ফেললেন। আমাকে ডেকে বললেন, দুলু আমাকে এরা (পুলিশ) নিয়ে যাচ্ছে। বাসায় তোমার ভাবি-বাচ্চারা একা আছে তুমি ওদের দেখো। বলেই দাদা কাঁদতে কাঁদতেই চলে গেলেন। পরে আমরা গিয়ে বসুপাড়ার বাসা থেকে ভাবি ও বাচ্চাদের নিয়ে আসি শ্রীশনগরের বাড়িতে। ৬৯-এর ১৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীশনগরের বাসায় লালনের জন্ম হয়।

দাদাকে নিয়ে একটি স্মৃতি আমাকে আজো কাঁদায়। ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাস। আমাদের বড় ছেলে বাপী। বুয়েট থেকে ইউএসএ স্কলারশিপ নিয়ে যাচ্ছে এমএস করতে। খুলনা থেকে যেদিন সকালবেলা বাপী ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করল সেদিন সবাই এসেছেন বাপীকে বিদায় জানাতে। দাদার সে কী উত্তেজনা। হঠাৎ দেখি দাদা নিজেই বাপীর স্যুটকেসটা টেনে নিয়ে সিঁড়িতে চলে যাচ্ছেন আর বলছেন চল চল দেরি হয়ে যাবে তো–শেষে কোচ ফেল করবে।

আমাদের ছোট ছেলে সুমন সেন্ট জোসেফ স্কুলের ফার্স্টবয়। ৮৭-তে এসএসসি দেয়। যেহেতু স্কুল জীবনে বরাবরই ফার্স্ট হয়ে উপরের ক্লাসে উঠেছে তাই স্কুল এবং আমরা পরিবারের সদস্যরা সবাই ভেবেছিলাম সুমন তো অবশ্যই ৩-এর মধ্যে থাকবে। কিন্তু না। রেজাল্টে দেখা গেল সে ২০-এর মধ্যেই নেই। দাদা এটা মানতেই রাজি নন। ওনার বক্তব্য নিশ্চয়ই কোথাও কোনো মার্কস তুলতে ভুল হয়েছে। তিনি সোজা যশোর বোর্ডে চলে গেলেন। সেখানে গিয়েও হম্বিতম্বি। সব পেপারে ৯৭/৯৮ পেলেও সুমন বাংলায় একেবারে ৩৪/৫২ পেয়েছে। অগত্যা তার স্থান হয়েছে ২১ তম। পরে অবশ্য এইচএস-সি'তে বি এল কলেজ থেকে ফিজিক্সে ৯৮ মার্কস পেয়ে যশোর বোর্ডের কয়েক বছরের রেকর্ড ব্রেক করেছিল।

৬২ সাল থেকে ২০০৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর এই দীর্ঘ ৪৪ বছর...অনেকগুলো দিন...ঘণ্টা অনেকগুলো মিনিট সেকেন্ড। ঘিরে আছে অনেক স্মৃতি–সুখ-দুঃখ-কষ্ট-আনন্দ-বেদনার পুঞ্জিভূত একরাশ সময়। কোনটা রেখে কোনটা বলি। একবার ভাবি গেলেন ভারতে বেড়াতে। বাসায় থাকল কিশোরী বুলি আর দাদা। হঠাৎ দাদা জ্বর হয়ে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রায় ১০ দিন দাদা খুব ভুগলেন। সেই সময় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ঐ ছোট মেয়েটির সঙ্গে দাদার সেবা করার। আমার প্রতি দাদার আরো নির্ভরতা আমি দেখেছি–এখানে দাদার সঙ্গে ভাবির নামটা উচ্চারণ না করলে ভুল হবে। তিনিও তাঁর যেকোনো সমস্যায় আমার প্রতি অনেক নির্ভরতা প্রকাশ করেছেন, যেমন লাভলির বিয়ে, অন্তরার জন্মের পর ১৯ দিন, বুলির বিয়ে, লিপির বিয়ে, ভাবির ডাঃ সিরাজের কাছে

অপারেশন। বিভিন্ন সময়ে যখনই আমাকে ডেকেছেন আমি চেষ্টা করেছি আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তাদের সঙ্গে থাকার। বুলি তো প্রায়ই বলে, মেজ কাকিমা আমাদের চার ভাই-বোন আর বাপী দাদারা তিন ভাইকে এক থালায় ভাত মাখিয়ে খাইয়েছেন গালে তুলে। এই স্মৃতি বুলিকেও কাঁদায় বলে আমি জানি। একবার ভাবির অপারেশন হবে। আমি তখন ঢাকায়। দাদা রোজই এসে আমার খবর নেন। দুলু কবে আসবে, তবে খুকুর অপারেশন হবে। ত্বরা করে আমি ঢাকা থেকে এলাম তবে ভাবির অপারেশন হলো।

এরকম টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো জোড়া দিলে তো অনেক বড় স্মৃতির সাগর হয়ে যাবে। জমাট বাঁধা টুকরো বরফের মতো সেই স্মৃতিগুলো ভাসতেই থাকবে স্মৃতির সাগরে। দাদা, আমাদের দাদা–সুখ-দুঃখের সব স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে যতদিন আমরা বেঁচে থাকব।

আশরাফুন্নেছা দুলু : শিশু সাহিত্যিক ও আবু মহম্মদ ফেরদাউসের ভাইবউ

সওয়া উন নাহার

দাদার কথা

শ্রদ্ধেয় আবু মহম্মদ ফেরদাউস আজ আমাদের মাঝে নেই। এর ভিতর দুটো বছর পার হয়ে গেছে।

সমাজজীবনে তিনি ছিলেন বিশাল ব্যক্তিত্বের মানুষ, রাজনীতি অঙ্গনে তাঁর পরিধি ছিল বিশাল। অত বড় মাপের মানুষ সম্পর্কে লেখার ধৃষ্টতা বা যোগ্যতা আমার নেই।

সংসারে তিনি ছিলেন সবার বড়ভাই। তাই তিনি সবার দাদা। সেই দাদার স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা কতটুকু পেয়েছি শুধু সেটুকু বলতে পারি।

তেঁতুলিয়া থেকে দৌলতপুর বি এল কলেজে পড়তে এলেন আমার মেজদা কামাল বকত। তাঁর সাথে পরিচয় হয় ফেরদাউসের। এরপর পরিচয় থেকে বাড়িতে যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা মা আর ছেলের সাথে। মেজদা ছুটিতে বাড়ি এসে নতুন পরিচয় হওয়ার কথা, মা-ছেলের অমায়িক ব্যবহার সব কথা বলতেন। ওরা একান্নবর্তী পরিবার। বাবা, মা, দাদি আছেন সংসারে। পাঁচ ভাই, তিন বোন। বাবা, মা, দাদি আদর করে ডাকেন খোকা। একটা সুখী-সুন্দর বাড়ির গল্প বলতেন মেজদা। সালটা পঞ্চাশ হবে। একবার মেজদা গল্প করতে করতে বললেন, ফেরদাউস বলেছিল ভালো মেয়ে থাকলে বলিস ভাই বিয়ে দেব। মেয়ের বয়স ষোল-সতের হলে ভালো হয়।

ওই বাড়িতে বিয়ে দেবার উপযুক্ত মেয়ে তেঁতুলিয়া গ্রামে চার বছরে যখন পেলেন না তখন আমার বাবাকে ধরলেন। আর মেজদার মধ্যস্থতায় চুয়ান্ন সালে এগারই অক্টোবর মেজদার গল্পের বাড়ির ফেরদাউসের ছোট ভাই আমজাদ হোসেনের বউ হয়ে সে বাড়িতে এলাম। সবাইকে দেখলাম। মেজদার বলা মার খোকাকে দেখলাম না। কেউ বলেও না দাদার কথা। ভাবিকে দেখলাম গ্রামের শ্বশুর বাড়িতে মাস দুই থেকে এলেন। একদিন শুনলাম ক্রিকেট খেলা দেখার সময় দাদা ধরা পড়েছেন। ছ'মাস পর দাদা বাড়ি ফিরে এলেন। আমার শাশুড়ি আমাকে সঙ্গে করে দাদার ঘরে এলেন। মা বললেন, খোকা আমজাদের বউ। দাদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার সামনে তোমার ঘোমটা দেয়া লাগবে না। শিরী, রসু যেমন থাকে তুমিও তেমনি থাকবে। আমি তো তোমার দাদা। কামাল বকতের বোন আমারও বোন। দাদার ছাড়পত্র পেয়ে এমন অবস্থা হলো মাথায় কাপড় দেওয়া ভুলে গেলাম। বাইরের লোক এলেও কাপড় দিতে ভুলে যেতাম। দাদি মাঝে মাঝে বলতেন মাথায় কাপড় দিতে। ভাবি বলতেন বাইরের লোকে যা-তা বলবে আর দাদার ভাই একদম পছন্দ করলেন না। কিন্তু কখনও মুখে বলেননি মাথায় কাপড় দাও।

দাদাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল দুটো। দাদা বাড়ি আসার পর রোজ সাতটা সাড়ে

সাতটার ভিতর চাবি নিয়ে চলে যেতেন। যে দুভাই প্রতিষ্ঠান দেখতেন, তারা ধীরে-সুস্থে কেউ ন'টার আগে বের হতো, কেউ এগারটার আগে যেত। দাদা ঘণ্টা দুই বসে চলে যেতেন। ভাই-বোনদের বিশ্বাস ছিল দাদা ছাড়া সংসার চলতে পারে না। দাদা ছাড়া প্রতিষ্ঠানের কথা বলা যায় ওই দুভাই তা ভাবতেও পারত না। শুধু দাদা যেটায় মতামত দেবেন সেটাই ঠিক। ওরা মতামত রাখতে পারে তাও কখনও ভাবত না।

ওরা দুভাই সমাজ আছে, সংসার আছে সেখানে চলতে হয়, কথা বলতে হয়, মনে হয় ভুলে গিয়েছিল দাদা বাদে ওদের অন্য জীবন আছে। আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। কারণ আমাদের কোনো বড় ভাই ছিল না। দাদা আর তার ভাই-বোনদের নিয়ে যদি লিখতে বসি তার শেষ কখনও করতে পারব কিনা জানি না। তাই আমার চাওয়া-পাওয়াটুকু যা পেয়েছি দাদার কাছে তাই শুধু বলে যেতে চাই।

দাদার মতন অত বড় মন, অত ত্যাগ, অত স্নেহ-ভালোবাসা দেবার ক্ষমতা সবার থাকে না। প্রথম দিনের মুখের কথাটা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পালন করে গেছেন। তুমি কামালের বোন আমারও বোন। তাই দাদাকে কখনও ভাসুর ভাবতে পারিনি। আমার ছোট বোন সেই একান্নবর্তী সংসারে এসে লেখাপড়া করেছিল মা-দাদার ইচ্ছায়। কারণ দাদার কথার পরে কথা বলা যায় তার ভাই-বোনেরা জানত না। সংসার ছিল দাদার আর মার। সংসারের হালখানা শক্ত করে ধরা ছিল মার হাতে।

মানুষের জীবন একই ভাবে যায় না, কারণ মানুষের জীবনে ঘাত-প্রতিঘাতে গল্পবলা সুন্দর বাড়িগুলো একদিন অসুন্দর হয়ে যায়। সংসারও তখন তার নিজস্ব গতিতে চলতে পারে না। মা-দাদার সেই সুন্দর সুখের সংসার থেকে দাদাকে একদিন বউ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বের হয়ে আসতে হলো। সেদিন দাদার ভাই-বোনের দাদাকে হারাবার যে ব্যথা বেজেছিল, সেই সময়ের সে যন্ত্রণার কোনো সান্ত্বনা হয় না।

কত বিচিত্র এই মানুষের জীবন। তার চেয়ে বিচিত্র এই সংসার নামক খেলাঘরটা। ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে কত না চাওয়া-পাওয়া, ভোগের সময়সীমা যদি জানা থাকত, তাহলে আমরা একে অন্যের থেকে দূরে যেতাম কি-না জানি না। বছর দুই পর আমরাও চলে এলাম বাবা-মা-দাদি আর ভাই-বোনদের ছেড়ে। সংসার থেকে দূরে চলে এলেও দাদার স্নেহ-মমতা ভালোবাসা থেকে কেউ দূরে সরে যায়নি। মায়ের কঠিন বাঁধনে কোনো ফাটল তখনও কেউ ধরাতে পারেনি। দাদার হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহ-ভালোবাসা থেকে আমার ভাই-বোনেরাও বঞ্চিত হলো না। যে বোন এখানে থেকে পড়াশুনা করল তার বিয়ে ঠিক হলে দাদাকে বললাম। দাদা বললেন, ছেলেটাকে চিনি, ভালো ছেলে বিয়ে দিতে পার। দাদাকে বললাম দাদা এ বিয়ে বাবা দিতে পারবেন না। কারণ এরা গলার হাতের গয়না চায়। বরযাত্রী ত্রিশের উপরে আসবে। দাদা বললেন সোন মিয়া না পারেন আমরা দেখব। তুমি চিন্তা করো না; আমি মজিদ আর আমজাদের সাথে কথা বলে মাকে জানাব।

দাদা কার সাথে কী বলেছিলেন জানি না। মজিদ আমার ভগ্নিপতি–দাদার চাচাতো বোনের দেওর, সে গলার হার বানাবার জন্য মাকে টাকা দিয়েছিল। মা ছ'গাছা চুড়ি করে দিয়েছিলেন। বিয়ের খরচ কে করেছিল জানি না। বিয়ের দিন রান্নার সময় বর এলে দাদা

উপস্থিত ছিলেন। দাদার উদারতা, স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা আমি ভুলতে পারি না। দাদার ত্যাগের কাছে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে আসে। তিনি আমার বোনদের বাড়ি যেতেন। তাদের ভালোমন্দ খোঁজখবর নিতেন। আমার বাবাকে খুব সম্মান করতেন। বড় ভাবি মারা গেলেন। পরে যিনি এলেন তিনি আমার ভাই-বোনদের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক করে নিয়েছিলেন। বোনেরা দাদার বাড়িতে যেত। দাদার জীবনের শেষের দিকে গেলে পুরোনো দিনের গল্প শুনাতেন। কামাল বকত মারা গেলে খুব মন খারাপ হয়ে গেল। তার সাথে কেমন ভাবে কোথায় পরিচয় হয়েছিল বললেন। আমার ছোট ভাই ইসা মারা গেলে বললেন, বড় জেদি ছিল, নিজে যা বুঝত তা থেকে সরতে চাইত না। আমাকে বললেন, ইসাকে হারাবার ব্যথা তোমার আব্বা সহ্য করতে পারবেন না। তোমরা বোনেরা খেয়াল রেখ। যখন যেতাম দুচারটা পুরোনো গল্প বলতেন, ভগ্নিপতি মজিদ-জামান-তৈয়েবের কথাও বলতেন। এই ভাবি মাঝে মাঝে ফোন করে বলতেন তুমি দুপুরে খাবে। তোমার পছন্দ হবে। এস কিন্তু ভুলে যেও না। কখনও একা যেতাম, কখনও বোনদের নিয়ে যেতাম। দাদা ওদের দেখলে খুব খুশি হতেন।

ভাবি কেন এমনি করে ডেকে খাওয়ান। চিন্তা করতাম। মনে হতো স্বামীর প্রতি ভালোবাসা তাই স্বামীর পছন্দের মানুষদের কাছে ডাকা। দাদার স্নেহ-ভালোবাসার তুলনা করতে গেলে আমার চাওয়া-পাওয়ার মাঝে মিলেমিশে একখণ্ড হীরা হয়ে আমার অন্তর জুড়ে জ্বলতে থাকে। এর ভাষা নেই যা বলা যায়। এ দেখাবার নয় যা সকলকে দেখাব। একে ওজন করে বলতে পারি না দাদার স্নেহ-ভালোবাসা কত আমি পেয়েছি।

তাই আজ আমার অন্তরের সকল আকুতি নিয়ে দয়াময়ের দরগায় তাঁর আত্মার মাগফেরাত কামনায় হাত তুলি–তাঁর আত্মাকে ক্ষমা কর, সুখে রাখ, শান্তিতে রাখ। তাঁর সুন্দর বাড়ির মতন তেমন সুন্দর জায়গায় তাঁকে রাখ।

সওয়া উন নাহার : আবু মহম্মদ ফেরদাউসের ভাইবউ

মুজিবর রহমান

আবু মহম্মদ ফেরদাউস : জীবন ও কর্ম

আবু মহম্মদ ফেরদাউস ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার গজারিয়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকনাম খোকা। মা মেহেরুননেসা খাতুনের নিজ হাতে সন্তানদের জন্মতারিখ লেখা কাগজে আছে–

'খোকা : ১৩৩০ সনের ১১ ফাল্গুন ১৯২৪ সনের ১০ ফেব্রুয়ারি শনিবার সকাল ৬টা' আমরা জানি ১১ ফাল্গুন কখনই ১০ ফেব্রুয়ারি হতে পারে না। ১৩৩০ সনের ১১ ফাল্গুন শনিবার সঠিক ধরলে জন্মতারিখ হবে ১৯২৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার। আবু মহম্মদ ফেরদাউসের কথামতো আমরা জানি তাঁর জন্মতারিখ ১৯২৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। মেহেরুন্নেসার লেখা তালিকায় আর কোনো সন্তানের জন্মতারিখে এ রকম গরমিল নেই। সম্ভবত প্রথম সন্তানের জন্মতারিখ জন্মের কিছুকাল পরে লেখা হয়েছে এবং সেজন্যই এই বিভ্রান্তি।

দুই

আবু মহম্মদ ফেরদাউসের বাবা একরামউদ্দীন আহমদ মহকুমা স্কুল পরিদর্শক পদে সরকারি চাকরি করতেন। চাকরিকালের অধিকাংশ সময় ঢাকায় কেটেছে। এরপর দু'বছর বরিশালে, তিন বছর দিনাজপুরে ও শেষ তিন বছর খুলনায় নিজ জেলায়। তাঁর পৈতৃক নিবাস খুলনা জেলার ফুলতলা থানার আটরা গ্রামের শেখপাড়ায়। একরামউদ্দীনের পাঁচ ছেলে, দুই মেয়ে। ছোট ছেলে মনু বাতজ্বরে আক্রান্ত হয়ে একরকম বিনা চিকিৎসায় ১৯৪৯ সালের ৩০ জুন মারা যায়। দেশবিভাগের পর এ দেশে ডাক্তারের অভাব ছিল। তাছাড়া সে সময় বাতজ্বরের চিকিৎসাও ছিল না।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান। বাবার কর্মস্থল ঢাকায়, পুরনো ঢাকার নারিন্দার ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। ছেলেবেলায় মায়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছেন, মায়ের চমৎকার হাতের লেখার প্রভাবে তাঁর হাতের লেখাও ছিল দেখার মতো। ঢাকা শহরের ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ১৯৩৮ সালে বাবা বরিশালে বদলি হলে তিনি বাবা-মা-ভাইবোনের সঙ্গে বরিশালে আসেন এবং বরিশাল জিলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। বাবা ১৯৪০ সালের প্রথম দিকে দিনাজপুরে বদলি হয়ে গেলে তিনি বরিশালে থেকে যান এবং জিলা স্কুলের ছাত্রাবাস হয় তাঁর ঠিকানা। ১৯৪১ সালে ওই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে খুলনার দৌলতপুর বি এল কলেজে আইএস-সি ক্লাসে ভর্তি হন এবং মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত ছাত্রাবাস হয় তাঁর ঠিকানা। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে তাঁর বাবা শেষ কর্মস্থল খুলনায় বদলি হলে খুলনা শহরে বাসাবাড়ি খোঁজার দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর। তিনি তাঁর বন্ধু সৈয়দ ওয়াসেফ আলীকে সঙ্গে নিয়ে সারা শহরের খালি বাড়ির মালিকদের অনুরোধ করেও ভাড়া নিতে পারেননি। অবশেষে শ্রীশনগরের মালিক জমিদার 'শ্রীশ ভট্টাচার্যের বড় ছেলে ধীরেন ভট্টাচার্য তাঁদের খালি-পড়ে-থাকা

দোতলা বাড়ি ভাড়া দিতে রাজি হন। এ প্রসঙ্গে ফেরদাউস বলেন, ধর্মের দিক থেকে ধীরেন ভট্টাচার্য তুলনামূলকভাবে উদার ছিলেন। বাবা-মা-ভাইবোন খুলনায় চলে এলে তিনি কলেজের ছাত্রাবাস ছেড়ে শ্রীশনগরের দোতলা বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন। শ্রীশনগরে ১৪/১৫টি বাড়ি ছিল, জমিদারের বাড়িসহ তিনটি দোতলা বাড়ি। ফেরদাউস সাহেবদের দক্ষিণমুখী বাড়িটির দক্ষিণে ছোট একটি মাঠ, পুবে জমিদারের দুই ঘাটওয়ালা পুকুর, পশ্চিমে জমিদারের সুপারি-নারকেলের বাগান, উত্তরে ছোট একতলা বাড়ি। ১৯৪৩ সালের প্রথম থেকে ফেরদাউসের ঠিকানা হয় এই বাড়িটির দোতলার পুব দিকের ঘরটি। জমিদারের বাড়ি ছাড়া অন্য সব বাড়িতে সরকারি কর্মচারীরা বসবাস করতেন। ফেরদাউস সাহেবদের বাড়ির পাশের দুটি বাড়িতে মুসলমান পরিবার এবং অন্য সব বাড়িতে হিন্দু পরিবার ছিল। প্রত্যেক পরিবারে ৫-১০ জন সদস্য ছিল। ফলে পাড়াটা সবসময় জমজমাট থাকত। তবে ফেরদাউস সাহেব পাড়ার মধ্যে কারো সাথে তেমন মিশতেন না, কিন্তু তাঁদের বাড়িতে পাড়ার ছেলেদের আড্ডা-খেলাধুলা লেগেই থাকত। জমিদারের ভাগ্নে স্কুল পালিয়ে ফেরদাউসের অনুপস্থিতিতে তাঁর ঘরে এসে আশ্রয় নিতেন। তাঁদের পাশের বাড়িতে শ্যামল গাঙ্গুলিরা থাকতেন, শ্যামল গাঙ্গুলি তখন স্কুলের ছাত্র, পরবর্তী জীবনে তিনি পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন, তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে শ্রীশনগর ও ফেরদাউসদের পরিবারের কথা আছে।

তিন

বি এল কলেজে অধ্যয়নকালে ফেরদাউস মুসলিম ছাত্রলীগে যোগদান করেন। একই সঙ্গে মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে এতটাই জড়িয়ে পড়েছিলেন যে কলেজের লেখাপড়া আর শেষ করা হয়নি। খান এ সবুর কলকাতা ছেড়ে খুলনায় চলে আসলে তিনিই হন ফেরদাউসের নেতা। ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে খুলনার মুসলিম আসনে সবুর সাহেবকে এমএলএ নির্বাচিত করার জন্য ফেরদাউস দলীয় কর্মীদের নিয়ে প্রাণপণ পরিশ্রম করে সফল হন। সে সময় তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন পাইকগাছা নিবাসী আফিল উদ্দীন আহমদ। মুসলিম লীগের জঙ্গি কর্মী ফেরদাউস ও তাঁর সহযাত্রীরা ভারতের স্বাধীনতা ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান পাওয়ার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম-সংঘাত-সংঘর্ষ করে চলেছেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে খুলনা পাকিস্তানভুক্তির পরপর, কী কারণে জানি না, ফেরদাউস ও আফিল সাহেব তাঁদের নেতা সবুর সাহেবকে ত্যাগ করে সবুরবিরোধী গ্রুপে যোগ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবুর সাহেবের গুণ্ডাবাহিনী আফিল সাহেবকে নির্মমভাবে মারধর করলে তিনি সবুর গ্রুপে ফিরে যান। আরো একজন প্রখ্যাত রাজনীতিক সামান্য মার খেয়ে সবুর সাহেবের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু ফেরদাউস সাহেব একাধিকবার গুণ্ডাদের হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হলেও সবুর সাহেবের পক্ষপুটে ফিরে যাননি। চোখের উপরের ভ্রুতে ও পেটে আঘাতের চিহ্ন আজীবন বহন করেছেন। এভাবে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ফেরদাউস মুসলিম লীগের সবুরবিরোধী গ্রুপে মাঠকর্মী ও নেতা হিসেবে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পরপর ভারতের পশ্চিম বাংলা থেকে খুলনায় আগত দুঃস্থ মুসলিম পরিবারের কিছু কিছু ছাত্রের লজিংয়ের ব্যবস্থা করে দেন ফেরদাউস সাহেব। কেউ কেউ তাঁদের বাড়িতেও খাওয়াদাওয়া করতেন।

১৯৪৯ সালে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্মের পর খুলনায় কিছু কিছু সরকারবিরোধী সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এতে যারা অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ফেরদাউস সাহেব। সম্ভবত এ কারণে ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে তাঁদের শ্রীশনগরের বাড়িতে দু'বার পুলিশ সার্চ করে এবং প্রগতিশীল বই-পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়। এ সময় তাঁর আলমারিতে লাহোরের আশরাফ পাবলিকেশন্সের ইসলামের উপর লেখা গবেষণামূলক অনেক বই ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকা-বই থাকত। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির বাংলা ভাষা সংগ্রাম কমিটির সদস্য ছিলেন ফেরদাউস, যদিও তখনও মুসলিম লীগ সংগঠন পরিত্যাগ করেননি। এই কমিটির নেতৃত্বে খুলনায় ভাষা আন্দোলনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। একুশে ফেব্রুয়ারি ও পরপর কয়েকদিন খুলনায় এই আন্দোলন একভাবে চলতে থাকে। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হতে থাকে এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই দিন খুলনায় ধর্মঘট হয়। কিন্তু প্রতি বছর এই দিন সবুর সাহেবের পক্ষ থেকে মাইকে ঘোষণা করা হতো–ওই দিন স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালত-দোকানপাট খোলা থাকবে। তবুও প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি সফল ধর্মঘট পালিত হতো। খুলনার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি এক অবিস্মরণীয় দিন। এদিন সকালে সাউথ সেন্ট্রাল রোডে ছাত্রযুবকদের মিছিলের ওপর সবুর সাহেবের গুণ্ডাবাহিনী আক্রমণ করলে ফেরদাউস সাহেবের নেতৃত্বে ছাত্রযুবকেরা প্রথমেই রাস্তার পাশের দোকানের ঝাঁপের লাঠি নিয়ে হামলাকারীদের প্রতিহত করেন এবং রাস্তার পাশের গরান কাঠের দোকান থেকে সরবরাহ করা কাঠ দিয়ে গুণ্ডাদের মেরে তাড়িয়ে দেন।

১৯৫৩ সালের প্রথম ভাগে পূর্ববাংলার প্রথম অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন–গণতন্ত্রী দলের জেলা কমিটি গঠিত হয়। সাবেক জাতীয় কংগ্রেস কর্মী অ্যাডভোকেট আব্দুল জব্বার সভাপতি, গোপন কমিউনিস্ট কর্মী ভাষাসৈনিক এম এ গফুর সাধারণ সম্পাদক, আবু মহম্মদ ফেরদাউস ও সাবেক ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মী দেবেন দাশ সহসভাপতি নির্বাচিত হন। সাবেক মুসলিম লীগ কর্মী এম নূরুল ইসলাম ও এস এম এ জলিল, ছাত্রনেতা মিজানুর রহিম, নুরুল ইসলাম নান্নু, মালিক আতাহার উদ্দিন, গাজী শহীদুল্লাহ, এ কে সামসুদ্দিন সুনু, এম এ রব প্রমুখ এ দলে যোগদান করেন। এ দলে প্রধানত কমিউনিস্ট ও উদার গণতন্ত্রীরা যোগদান করেন। ফলে প্রথম থেকেই এ দলটি সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী ভূমিকা পালন করতে থাকে। এ সময় থেকে ফেরদাউস সাহেবকে অনেকেই কমিউনিস্ট বলতে থাকে এবং পুলিশের বিশেষ শাখায় তাঁর নাম কমিউনিস্ট/প্রোকমিউনিস্ট হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে গণতন্ত্রী দল যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করে। নির্বাচনে তাঁর ভূমিকার জন্য নির্বাচনের আগেই ফেরদাউস সাহেবের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। তিনি আত্মগোপনে থেকে বটিয়াঘাটা-তেরখাদা-ফকিরহাট-মোল্লাহাট-খুলনা সদর কেন্দ্রে তফশিলি হিন্দু আসনে একজন প্রগতিশীল সাধারণ কৃষক কর্মী বিভূতি রায়ের পক্ষে একভাবে কাজ করতে থাকেন

এবং বিভূতি রায় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় ফেরদাউস সাহেবের সহযোগী ছিলেন এম নূরুল ইসলাম, শান্তি ঘোষ, কালীদাস ব্যানার্জী প্রমুখ। বর্ণ হিন্দু আসনে গণতন্ত্রী দলের নেতা দেবেন দাশ নির্বাচিত হন। নির্বাচনে সারা দেশে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুরও পরাজিত হন।

যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মুখ্যমন্ত্রিত্বে পূর্ববাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার পূর্ববাংলার এই সরকারকে মেনে নিতে পারেনি। তারা নানাপ্রকার চক্রান্ত করতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৪ সালের মে মাসে পূর্ববাংলার হক মন্ত্রিসভা বাতিল করে প্রদেশের ওপর গভর্নরের শাসন জারি করে। আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রী দল ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার এড়াতে ফেরদাউস সাহেব আত্মগোপন করেন, কিন্তু ঢাকায় পল্টন ময়দানে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট টেস্ট খেলা দেখতে গিয়ে ময়দানেই পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। ১৯৫৬ সালে পুলিশ ধর্মঘটের সময় তাঁর কোনো সংশ্লেষ না থাকা সত্ত্বেও তিনি গ্রেফতার হন।

১৯৫৪ সালে খুলনায় সারা পূর্ববাংলা রেলওয়ে শ্রমিক লীগের সম্মেলন হয়, খুলনার মিউনিসিপ্যাল পার্ক লাল পতাকায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। খুলনা জেলা কৃষক সমিতির সম্মেলন হয়, ঐতিহাসিক মে দিবস আড়ম্বরে খুলনায় পালিত হয়। এসবে ফেরদাউস সাহেবের ভূমিকা লক্ষণীয়। এ সময় রাজশাহীর নাচোলের সাঁওতাল কৃষকদের নেত্রী ইলা মিত্রের গ্রেফতার অবস্থায় বর্বর নির্যাতনের শিকার হওয়ার কাহিনী জানার পর ফেরদাউস সাহেব জনসভাগুলিতে তাঁর বক্তৃতায় সে কাহিনী বর্ণনা করে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করতেন।

১৯৫৪-৫৮ সালে কেন্দ্রে ও পূর্ববাংলা প্রদেশে সরকার গঠন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভাঙাগড়া ও মেরুকরণ চলতে থাকে। আওয়ামী লীগ কিছুকাল প্রদেশে ও কেন্দ্রে সরকার গঠন করে। এ সময় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা ভাসানীর মধ্যে পাকিস্তানের মার্কিনঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তির পক্ষে এবং মওলানা ভাসানী বিপক্ষে ছিলেন। এ বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে মওলানা ভাসানী সম্মেলনে পররাষ্ট্রনীতি বিষয় উত্থাপন না করে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন এবং জুলাই মাসে সারা পাকিস্তানের সকল প্রদেশের জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রীদের 'গণতান্ত্রিক কনভেনশন' আহ্বান করেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান, আর গণতন্ত্রী দলের সেক্রেটারি জেনারেল মাহমুদ আলী ছিলেন অন্যতম মন্ত্রী। কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত রূপমহল সিনেমা হলে। প্রথম দিন সকালে খুলনার প্রতিনিধিরা সদরঘাটে পৌঁছামাত্র ছাত্রলীগ ও কয়েকটি দক্ষিণপন্থি ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা পুলিশের সামনেই তাদের ওপর হামলা চালায়। ফলে অনেকেই আর কনভেনশন হলে প্রবেশ করতে পারেনি। দ্বিতীয় দিন সকালে কনভেনশন হলে প্রতিনিধিদের উদ্দেশে মওলানা ভাসানীর আবেগময় বক্তৃতার

পর নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়, নাম দেওয়া হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি–ন্যাপ। পাকিস্তান কমিটি ও পূর্ব পাকিস্তান কমিটির সভাপতি হন মওলানা ভাসানী। বিকালে জনসভা করার জন্য সদরঘাট থেকে প্রতিনিধিরা মিছিল করে পল্টন ময়দানে উপস্থিত হন। সভার কাজ শুরু হওয়ামাত্র একদল গুণ্ডা সভামঞ্চের ওপর হামলা চালায়, কিন্তু ন্যাপ কর্মীদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের মুখে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে মাইকে ১৪৪ ধারা জারির ঘোষণা শোনা যায়। কনভেনশনের সমাপ্তি ঘোষণা করতে হয়। কিন্তু সারা পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদবিরোধী একটি রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব হয়। পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের সদস্যরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সকল জাতীয়তাবাদী, উদার গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দলগুলির সদস্যরা এবং সারা দেশের আওয়ামী লীগের একদল সদস্য এই দলে যোগদান করেন। ফলে কার্যত গণতন্ত্রী দলের বিলুপ্তি ঘটে। খুলনায় ন্যাপের কমিটি ও অধুনালুপ্ত গণতন্ত্রী দলের কমিটির মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য থাকে না।

এ অবস্থায় ১৯৫৮ সালে খুলনা পৌরসভার নির্বাচন হলে, আওয়ামী লীগের ৩ জন এবং ন্যাপের ৫ জন ওয়ার্ড কমিশনার পদে নির্বাচিত হন। বাকি আসনগুলি সবুর সাহেবসহ মুসলিম লীগের নেতারা পেয়ে যান। ফেরদাউস সাহেবসহ ন্যাপ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় ওয়ার্ড কমিশনারদের ভোটে ন্যাপ সভাপতি অ্যাড আব্দুল জব্বার পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড মোমিনউদ্দিন আহমদ ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। কিন্তু ছয় মাস বাদে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করলে পৌরসভার নির্বাচিত স্থানীয় সরকার বাতিল হয়ে যায়।

আইয়ুব খানের আক্রমণে গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা নাজেহাল হয়ে পড়ে। ফেরদাউস সাহেবের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। তিনি আত্মগোপন করলে পুলিশ তাঁর বাবু খান রোডের বাসা থেকে মালপত্র সব ক্রোক করে।

১৯৬২ সালে আইয়ুব খান প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ হাজার মোট ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হয়। এরাই দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবে। আইয়ুববিরোধী সকল রাজনৈতিক দল সম্মিলিত বিরোধী দল–কপ নামে একটি জোট গঠন করে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রার্থী করে। আইয়ুববিরোধী আন্দোলন চলতে থাকে। এ সময় খুলনায় আইয়ুববিরোধী এক বিশাল মিছিল খুলনা থানার সামনে উপস্থিত হলে মিছিল আক্রান্ত হয়, ফলে থানাও আক্রান্ত হয়। অনেক সময় ধরে লড়াই চলে। পরদিন ভোরে ফেরদাউস সাহেবসহ ৪০-৫০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে এবং মামলা দেয়।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। এই কর্মসূচিকে তারা বাঙালির বাঁচার দাবি হিসেবে জনগণের মধ্যে তুলে ধরেন। ৬-দফা ইস্যু নিয়ে ন্যাপের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিভক্তি দেখা দেয়। বিভক্তির এক পর্যায়ে ১৯৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ন্যাপের সহসভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে ন্যাপ (মোজাফফর) নামে একটি পৃথক সংগঠনের আবির্ভাব হয়। ফলে মওলানা ভাসানীর

নেতৃত্বাধীন অংশটি ন্যাপ (ভাসানী) নামে পরিচিতি লাভ করে। খুলনায় ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সভাপতি হন ফেরদাউস সাহেব, সাধারণ সম্পাদক হন এম এ গফুর, অন্যান্য নেতারা হলেন এ কে সামসুদ্দিন সুনু, এম এ রব, দীন মহম্মদ, অ্যাড আব্দুল হালিম প্রমুখ। ন্যাপ (ভাসানী)-এর সভাপতি থাকেন অ্যাড আব্দুল জব্বার, অন্যান্য নেতারা হলেন অ্যাড রাজ্জাক আলী, এম নূরুল ইসলাম, এস এম এ জলিল, শান্তি ঘোষ, মালিক আতাহার, নজরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম নান্নু, গাজী শহীদুল্লাহ প্রমুখ। খুলনা ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সাধারণ সম্পাদক এম এ গফুর দল ত্যাগ করে আওয়ামী লীগে যোগ দেন।

১৯৬৮-৬৯ সালের আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থানের সময় উভয় ন্যাপই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে ফেরদাউস সাহেব গ্রেফতার হয়ে যান এবং কিছুদিন পর মুক্তি লাভ করেন। এ বছর ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুববিরোধী এক বিশাল মিছিল হাজী মহসিন রোডে অবস্থিত অবাঙালি পৌর-প্রশাসক কাহুতের বাসভবনের সামনে দিয়ে যাবার সময় কাহুতের নিরাপত্তারক্ষী পুলিশ ও মিছিলকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এখানে পুলিশের গুলিতে তরুণ লন্ড্রীকর্মী হাদিস ও কিশোর স্কুলছাত্র প্রদীপ নিহত হন। এ সময় ফেরদাউস সাহেব তাঁর অনুসারীদের কথা না শুনে কাহুতের বাসভবনের মধ্যে ঢুকে যান এবং লাশ নিয়ে মিছিলরত জনতার সাথে যোগ দেন। এই মিছিলের একটি অংশ বড়মাঠের নিকটস্থ সবুর সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করে। এখানে পুলিশের গুলিতে তরুণ কটন মিলকর্মী আলতাফ নিহত হন।

অচিরেই আইয়ুব খানের শাসনকালের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন লাভে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের শাসকরা নানা চক্রান্ত করে আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের সরকার গঠনে বাধা দেয়। এর প্রতিবাদে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকে। ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী ঢাকায় হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এ সময় কিছুকাল বাগেরহাটের সুগন্ধী ও চিতলমারীর গ্রামাঞ্চলে অবস্থান করার পর ফেরদাউস সাহেব ভারতে চলে যান। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পর তিনি খুলনায় ফিরে আসেন এবং বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকেন।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ (মোজাফফর)-এর সমন্বয়ে ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর ভিত্তিতে শেখ মুজিবুর রহমান একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ–বাকশাল গঠন করেন। ন্যাপ (মোজাফফর)-এর প্রায় সকল সদস্যই এই দলে যোগদান করেন। ফলে কার্যত ন্যাপ (মোজাফফর)-এর বিলুপ্তি ঘটে। ১৯৭৫ এর পটপরিবর্তনের পর উভয়

ন্যাপসহ সকল দল পুনরুজ্জীবিত হয়। ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর মওলানা ভাসানীর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি প্রতিষ্ঠা করেন। ন্যাপ (ভাসানী)-এর অধিকাংশ সদস্যই এই দলে যোগদান করেন। ফলে ন্যাপের বিলুপ্তি ঘটে এবং ন্যাপ (মোজাফফর) নামে ন্যাপের একটি সংকীর্ণ ধারা প্রবহমান থাকে। ফেরদাউস সাহেব আমৃত্যু এই দলের খুলনা জেলা সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ছিলেন। ১৯৮২–৯০ সময়কালে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ন্যাপ (মোজাফফর) আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রবর্তনের সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এ সময় ফেরদাউস সাহেব পাকিস্তান আমলের মতো সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

আবু মহম্মদ ফেরদাউস ন্যাপ (মোজাফফর)-এর প্রার্থী হিসেবে ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে এবং ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে নির্বাচন করে পরাজিত হন। মস্কোপন্থি হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি ফিদেল ক্যাস্ট্রো ও চে গুয়েভারার ভক্ত ছিলেন। এমনকি নেপাল ও ভারতের মাওবাদীদের সশস্ত্র সংগ্রামের সমর্থক ছিলেন।

চার

রাজনীতির পাশাপাশি পশ্চাৎপদ খুলনা অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ফেরদাউস সাহেব চিন্তাভাবনা করতেন। ১৯৮৯ সালে গঠন করলেন 'বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। তিনি আমৃত্যু এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন। দলমতনির্বিশেষে খুলনার উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষী সব নেতাকর্মী এই সংগঠনে যোগদান করেন এবং একবাক্যে ফেরদাউস সাহেবকে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নেন। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে বর্ধিত পৌরকর প্রত্যাহার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, রূপসা ব্রিজ নির্মাণ, বিমানবন্দর স্থাপন উন্নয়ন কমিটির অন্যতম সাফল্য।

পাঁচ

ছোটবেলা থেকেই ফেরদাউস খেলাধুলা করতেন এবং ক্রীড়াঙ্গনে ভূমিকা রাখতেন। তাঁদের শ্রীশনগরের বাড়িতে দেয়ালে টাঙানো বরিশাল জিলা স্কুলের ফুটবল টিমের ফটোতে তাঁকে গোলরক্ষকের পোশাকে দেখা গেছে। খুলনায় তিনি সম্ভবত মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাবের সমর্থক ছিলেন। ১৯৬০-এর দশকের প্রথম ভাগে 'খুলনা হিরোজ' নামের ফুটবল টিমের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ছয়

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও আবু মহম্মদ ফেরদাউসের প্রবল আগ্রহ ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর খুলনায় নতুন ধারায় সংস্কৃতিচর্চা শুরু হয়। মুসলিম লীগ কর্মী ফেরদাউস ও তাঁর বন্ধুরা নজরুল-জয়ন্তীর আয়োজন করতেন। সে সময় কলকাতা থেকে পুরুষ ও মহিলা শিল্পীরা আসতেন এবং নজরুলের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হতো।

খুলনা নাট্যমন্দিরের/নাট্যনিকেতনের সদস্য হিসেবে ফেরদাউস নাট্য-আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। খুলনা নাট্যমন্দির স্থাপিত হয় ১৯০০ সালে। ১৯৫০ সালের দিকে এর নতুন নামকরণ হয় খুলনা নাট্যনিকেতন। ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৮৫-৮৬ পর্যন্ত ফেরদাউস নাট্যনিকেতনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৯-৮০ সালে তাঁদের ৩ জনের তত্ত্বাবধানে ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয়।

সাত

১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত আবু মহম্মদ ফেরদাউস ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে কে ডি ঘোষ রোডে তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠিত 'মডার্ন বুক ডিপো' তাঁর ও তাঁর ভাইদের সম্মিলিত শ্রম ও ভালোবাসায় একটি অত্যন্ত উঁচু মানের বইয়ের প্রকাশনা ও বিক্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁরা ১৯৫২ সালে উল্লাসিনী সিনেমা হলের সীমানার মধ্যে বড় একটি ঘরে প্রথম শ্রেণীর ছাপাখানা 'ইস্টার্ন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রেস থেকে কিছুকাল তাঁরা 'জনতা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এটিকে ১৯৬০ সালে খুলনা থানার মোড়ে নিজস্ব জমিতে স্থানান্তর করা হয়। মডার্ন বুক ডিপো ও ইস্টার্ন প্রেস থেকে যথেষ্ট অর্থ ও সুনাম অর্জিত হয়। এরপর 'ইস্টার্ন ট্রান্সপোর্ট' নামে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত কয়েকটি অত্যন্ত আধুনিক ও আরামদায়ক বাস তৈরি করে খুলনা–যশোর রুটে চালু করেন। জেলা প্রশাসনের অনুরোধে খুলনা–সাতক্ষীরা রুটে প্রথম অলাভজনক বাস-সার্ভিসের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ফেরদাউস সাহেব সার্বক্ষণিক রাজনীতিক হওয়ায় যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে যানবাহন ব্যবসায় লোকসান হতে থাকে। এ সময় তিনি শিল্পকারখানা গড়ার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। শিল্প ব্যাংকের সহযোগিতায় আংশিক স্বয়ংক্রিয় 'সুন্দরবন রাইস মিল' ও অত্যাধুনিক 'হোটেল রূপসা ইন্টারন্যাশনাল' স্থাপনের উদ্যোগ নেন। কিন্তু নানা কারণে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত শিল্প ব্যাংকের মধ্যস্থতায় রাইস মিল বিক্রি করে দেন এবং হোটেলের জমি ও জাপান থেকে আমদানিকৃত মালপত্র হস্তান্তর করতে হয়। ১৯৮৮ সালে 'মডার্ন বুক ডিপো'র দখল ঘরের নতুন মালিকের হাতে ছেড়ে দেন। তারপর প্রেসের সামনের নিজস্ব জমিতে এককভাবে ফেরদাউস সাহেব মডার্ন বুক ডিপো স্থাপন করেন, কিন্তু চার বছর বাদে তাও তুলে দেন। ১৯৯৬ সালে ইস্টার্ন প্রেসের জমি ও মেশিনপত্র বিক্রি করে দেন। এভাবে বিশ শতকের চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সফল ব্যবসার অবসান হয়।

আট

আবু মহম্মদ ফেরদাউস মাটি-পৃথিবীর টান উপেক্ষা করে মানবজন্মের ঘর ছেড়ে যান ১৩ ডিসেম্বর ২০০৬ ভোরে।

তিনি ১৯৪১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬৫ বছর পর্যায়ক্রমে মুসলিম লীগ, গণতন্ত্রী দল ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কর্মী ও নেতা হিসেবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও বামপন্থি আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। দীর্ঘ ৫০ বছরের ডায়াবেটিসজনিত অসুস্থতা তাঁকে দেশ-মাটি-মানুষের প্রতি তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। অদম্য সাহস ও ভালোবাসা তাঁকে দেশ ও জাতির জন্য অসীম ত্যাগে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করেছে। পৃথিবী বা বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর নাম না থাকলেও তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য খুলনার ইতিহাসে তাঁর নাম অবশ্যই লেখা থাকবে।

মুজিবর রহমান : আবু মহম্মদ ফেরদাউসের অনুজ

the end